১৩০৮ বঙ্গাব্দে

স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

২২শ বর্ষ

১৩৩০ ভাদ্র হইতে ১৩৩১ শ্রাবণ পর্য্যন্ত।

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

জোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, জেলা—হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্রতিখণ্ড ৵০ তিন আনা।

২২শ বর্ষের সূচীপত্র

(১৩৩০ সাল ভাদ্র হইতে ১৩৩১ শ্রাবণ পর্য্যন্ত)

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা

"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥"

হে সর্ব্বশক্তিমন্! নিখিল বিশ্বচরাচরের জীব-হৃদয়ে তোমার শক্তি ওতঃ-প্রোত ভাবে বিরাজমান, জড় পুতুল যেমন আপন ইচ্ছায় বা আপন শক্তিতে কিছুই করিতে পারে না, নর্ত্তক যেমন ভাবে নাচায় তেমনি নাচিয়া থাকে সেইরূপ তুমিও সর্ব্বজীব-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যেমন যেমন ভাবে জীবগণকে চালাইতেছ জীবগণ সেই সেই ভাবেই কার্য্য করিতেছে। অজ্ঞ লোকে যেমন নর্ত্তককে না দেখিতে পাইয়া বলিয়া থাকে পুতুল নাচিতেছে আমরাও তেমনি মায়ার কুহকে পড়িয়া জ্ঞানহারা হইয়া তোমাকে দেখিতে না পাইয়া বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকি; এবং আমিই ইহা করিতেছি আমাদ্বারাই এই কর্ম্ম সাধিত হইল ইত্যাকার অভিমান করিয়া থাকি। তুমি যে জীবের জীবন, তুমি যে সর্ব্ব মূলাধার, তুমি যে অন্তরে বাহিরে নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিয়া তোমার ইচ্ছামত জীবরূপ পুতুলকে নাচাইতেছ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আর কবে যে পারিব, কবে যে আমার এ অজ্ঞানতা, এ বৃথা আমার আমার করা স্বভাব দূরে যাইবে

তাহাও বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে জীবন প্রদীপ যে নির্ব্বাণপ্রায় হইতে চলিল; বৃথা অভিমান করিয়া এমন অমূল্য জীবন বিফলে কাটাইতেছি। আজ কাতর প্রাণে তোমার নিকট প্রার্থনা—আমার এ মোহ দূর করিয়া দাও। যাঁহারা তোমার ভাবে হৃদয় নির্ম্মল করিতে পারিয়াছে, কায়মনোবাক্যে তোমাতে আত্ম নির্ভর করিয়া একেবারে তোমার হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গ দাও।

অসৎসঙ্গ আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে বুঝিয়াও কি মোহ যে ছাড়িতে পারিতেছি না। তুমি করুণাময়, নিজগুণে করুণা করিয়া আমাকে অসৎসঙ্গ হইতে রক্ষা না করিলে আর আমার উপায় নাই। আমার নিজের এমন কোন প্রকার সাধনা নাই যে, সেই সাধনার ফলে সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারি। তাই তোমার নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা—তুমি আমার অসৎসঙ্গ ঘুচাইয়া নিজ করুণাগুণে সৎসঙ্গ লাভের যোগ্য পাত্র করিয়া দাও, আমি সেই সৎসঙ্গে তোমার লীলা-গুণানুবাদ-রূপ অমৃত রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হই এবং তোমার ভুবন-মঙ্গল নামগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে দুস্তর ভবসিন্ধু পার হইয়া তোমার নিত্যানন্দময় ধামে গমন করি। বাঞ্ছাকল্পতরু দীনের বাসনা পূর্ণ কর।

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা।

প্রণমামি গুরুদেব বিভু অন্তর্যামী।
সর্ব্বদেবময় গুরো! তুমি বিশ্বস্বামী॥
হৃদয়ে ভাবনা করি শ্রীগুরুচরণ।
সর্ব্বসাক্ষী গুরু সাক্ষাৎ বিষ্ণু নারায়ণ॥
দেন ভক্তি দাও গুরো! তব শ্রীচরণে।
বিপদে সম্পদে যেন না ভুলি কখনে॥
তুমিই আরাধ্যদেব তুমি মোর ইষ্ট।
তুমি দুঃখহারী মোর প্রতি হও তুষ্ট॥
সহস্র সন্তাপপ্রদ এ ভব পাথারে।
সদা ডুবে আছি গুরো! নিজ কর্ম্মফেরে॥

অজ্ঞানেতে অন্ধসম জ্ঞাননেত্র হীন।
কৃপা দৃষ্টি দানে তার আমি অতি দীন॥
অজ্ঞান আঁধারে গুরো! আছি অন্ধসম।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছু জ্ঞান নাহি মম॥
বিবেক বৈরাগ্য ভাব প্রদ জ্ঞান দানে।
ওহে দয়াময়, রক্ষা কর দীনজনে॥
সাধন ভজন প্রভো! কিছু মোর নাই।
পাপে তাপে মগ্নরহে মতি সর্ব্বদাই॥
তব কৃপা বিনা গুরো! কাহার শকতি।
ফিরাতে কুপথ হ'তে কুমতির গতি॥
গুরুসম দুঃখহারী পাপী তাপি বন্ধু।
আর কেহ নাই ভবে গুরু কৃপাসিন্ধু॥
এই কর গুরো! করি কৃপা বিতরণ।
তোমাতেই ভক্তি যেন থাকে অনুক্ষণ॥

৺দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন।

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১১)

১৯।— গোবর্দ্ধনধারী বনকুঞ্জ বিহারী
ভজহুঁ মন গোপীজন নয়ন আনন্দ।
শ্যামল ঢল ঢল কান্তি মহোজ্জ্বল
গোকুল গোপকুল চন্দ॥
রাখাল দলপতি নবনী লোলুপ অতি
যশোমতি সুত শ্রীগোবিন্দ;—
মুরলী অধরপর রঞ্জিত মনোহর
সুন্দর শ্রীমুখার বিন্দ॥
রাসরস পণ্ডিত কেলি কৌতুক রত
নাট গীত সুললিত ছন্দ;—

নাগরীগণে কত নৃত্য শিখাওত
রতি সুখ সময় প্রবন্ধ ॥
চরণে চরণ ভঙ্গ ললিত সু-ত্রিভঙ্গ
গমন নটন গতি মন্দ ;—
প্রেম অঞ্জন পরি হের দু'নয়ন ভরি
হে বিশ্বরূপ চির অন্ধ ॥

২০।— নবদ্বীপ নাথ জগন্নাথ কুলচাঁদ
গৌর গুণমণি গুণ গাও ওরে ভাই।
গৌর মঙ্গল গান হৃদি কর্ণ রসায়ন
প্রেম পরম সুখ দায়ী ॥
গৌর পরশমণি পীরিতি রসের খনি
গোরা নামে এত সুখ তাই ;—
গৌর সুন্দররূপ রসময় রস ভূপ
গোরা সম ত্রিভুবনে নাই ॥
গৌর গরব হৃদে বাড়াইয়া মনোসাধে
গোরা গুণে মজনা সদাই ;—
এবিশ্ব মোহন গোরা প্রেমরস যশে ভরা
রূপে গুণে বলিহারি যাই ॥

সম্পাদক।

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রসঙ্গ

"পদামৃত সমুদ্র" নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত হইয়াছে—

"বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেব কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তোরামানন্দশ্চ নন্দনঃ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিন্দ্রোশ্চ সিদ্ধ কৃষ্ণ কবীনকঃ।
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্
যেষাং সংস্মৃতিমাত্রেন সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥"

অর্থাৎ—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, রামানন্দ রায়, গোবিন্দ কবিরাজ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সাতজন কবিই সপ্তবারিধিতুল্য শ্রেষ্ঠ কবি। শ্রীচরিতামৃত আলোচনা কালে দেখিতে পাওয়া যায় নীলাচল ধামে গম্ভীরায় বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দকৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটক, জয়দেব কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত আস্বাদন করিয়া পরমানন্দ পাইতেন, যথা—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি   রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে   মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
পড়ে শুনে পরম আনন্দ ॥"

সকলেই আমাদের পূজ্য, সকলের কথাই বলা উচিত। তবে একে একে না বলিলে ঠিক ধারা বজায় রাখা সহজ নয় বলিয়া আমরা প্রথমে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বিষয়ই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভক্তগণের কৃপানুগ্রহ পাইলে আমরা ক্রমে ক্রমে অন্যান্য কবিগণের জীবনী সম্বন্ধেও যথাসাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জন্মস্থান সম্বন্ধে সাধারণতঃ কিম্বদন্তী অনেক শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের কৃষ্ণবেম্বা (বর্ত্তমান নাম "কৃষ্ণ বেনলা") নদীর পশ্চিমতীরে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাসস্থান ছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে এইটীই বহু মত গ্রাহ্য। বিশেষতঃ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নিজকৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে যাহা বলিয়া গিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহার সংস্কৃত টীকায় তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন, আবার যদুনন্দন ঠাকুর ঐ কর্ণামৃতের বঙ্গানুবাদ (পয়ারছন্দে) করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখি ;—

দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেম্বা নদী।
যাহার পশ্চিম পারে তাঁহার বসতি ॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
কবীন্দ্র অবধি সর্ব্ব লোকেতে বিদিত ॥

বিল্বমঙ্গল খুব পণ্ডিত ছিলেন, দেখিতেও অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। আবার যৌবনকালে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অতিশয় লম্পট ছিলেন এ কথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যদুনন্দন ঠাকুর কৃত কৃষ্ণ কর্ণামৃতের বঙ্গানুবাদে দেখিতে পাই,—

"পূর্ব্ব দুর্ব্বাসনা তারে কৈল আকর্ষণ।
কন্দর্প চেষ্টাতে মগ্ন হৈল তার মন॥
সেই নদীর পূর্ব্বদিকে বেশ্যার বসতি।
চিন্তামণি তার নাম সুন্দরী যুবতী॥
বড়ই আসক্তি তার সেই বেশ্যাসনে।
সদা সেই চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে॥"

চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গল এমনই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, যতই কেন বিঘ্ন আসুক না কোনমতেই তাহাকে চিন্তামণির নিকট যাওয়া বন্ধ করিতে পারিত না।

"একদিন বর্ষাকালে রাত্রি ঘোরতর।
মেঘ গর্জ্জন বৃষ্টি ধারা পড়ে নিরন্তর॥
তাতে কাম চেষ্টা অতি হইল অন্তরে।
সে চেষ্টাতে অন্ধ হৈল কিছুই না স্ফুরে॥
নদীপারে যাইতে বিঘ্ন শঙ্কা নাহি গণে।
নিজঘর হৈতে যান সেই বেশ্যা স্থানে॥
নৌকা নাহি নদীপার হইতে না পারে।
মৃতকে ধরিয়া গেল সেই নদী পারে॥
বেশ্যাদ্বারে কপাট খিল লাগে তায়।
প্রবেশিতে নারে তাতে মহা চেষ্টা পায়॥
প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ডাকিয়া বেড়ায়।
মেঘের গর্জ্জনে তারা শুনিতে না পায়॥
সেই কালে দেখে ভিত্তি-গর্ত্তের ভিতরে।
কালসর্প অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশে কুহরে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ আছে বাহে তার পুচ্ছ ধরি।
প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পড়ে প্রণালি উপরি॥

পড়িতে হইল মূর্চ্ছা নাহিক চেতন।
শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞা সখীগণ॥
হাহাকার করি বেশ্যা বহু চেষ্টা পাইল।
শুশ্রূষা করিয়া তারে সুস্থির করিল॥
তবে আগমন কথা বিবরি কহিল।
যেন যেন রূপে নদী পারাদি হইল॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিল কাঁদিতে।
অতিশয় দুঃখী হঞা লাগিল কহিতে॥"

চিন্তামণির নিকট এই মহা দুর্য্যোগে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কি ভাবে আসিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ব পয়ারের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। পারের নৌকা না পাইয়া মৃত দেহকে ভেলা মনে করিয়া তাহা ধরিয়া নদী পার হইয়াছিলেন। তারপর চিন্তামণির বাড়ীর দরজায় আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া কালসর্পকে রজ্জু মনে করিয়া ঐ কালসর্পকে ধরিয়াই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে পড়িয়াছিলেন। শব্দ শুনিয়া চিন্তামণি সখিগণ লইয়া আসিয়া দেখিলেন পুতিগন্ধময় কর্দ্দমাদি লিপ্ত গাত্রে বিল্বমঙ্গল নর্দ্দমার মধ্যে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। অনেক শুশ্রূষার ফলে বিল্বমঙ্গলের চেতন হইলে তাহার নিকট হইতে পারের বৃত্তান্ত ও প্রাচীর লঙ্ঘনের কথা শুনিয়া চিন্তামণি খুব দুঃখিত হইয়া বিল্বমঙ্গলকে বলিতে লাগিল—

"শাস্ত্র জানি মূর্খ কেহ নাহি তোমা বিনে।
বিরস রসের লাগি বধহ আপনে॥
এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ণ লাগি।
তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ অনুরাগী॥"

শাস্ত্র জানিয়া তোমার মত মূর্খ আর কে আছে, সামান্য রমণী-সঙ্গ লালসায় তোমার যেরূপ ব্যগ্রতা যদি ভগবানের জন্য এই ব্যগ্রতার শত ভাগেরও এক ভাগ হইত তাহাহইলেও জীবন ধন্য হইত।

সময় একটা আসে যখন সামান্য সামান্য কথায়ও জীবের সারা জীবনের নেশা কাটিয়া যায়। লালাবাবুও একদিন এইভাবে এক ধোপার নিকট "দিন গেল সন্ধ্যা হ'ল বাসনায় আগুন দে" শুনিয়া পাগলের মত নিজ বাসনার মুখে

যথার্থই আগুন জ্বালিয়া দিয়া পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া যায় যে, সে হয়ত এক উদ্দেশ্যে এক কথা বলে কিন্তু যার সময় হয় সে উহা শুনিয়া তাহার নিজের দশা ফিরাইয়া লয়। বিল্বমঙ্গলও আজ নিজ ভাল-বাসার পাত্রী চিন্তামণির নিকট কি জানি কি শুভক্ষণে এই কথা শুনিল, তাহার মোহ ঘোর কাটিয়া গেল, আরও সুবিধা হইল এই যে চিন্তামণি নিজেও নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিল—

"হাহা ধিক্ ধিক্ রহু জীবন আমার।
মহা পাপীয়সী আমি জানিনু নির্দ্ধার ॥
নানান্ কপটভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া।
মন ধন হরিলাম তাকে প্রতারিয়া ॥
কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া।
ভজিব কৃষ্ণের পায় একান্ত করিয়া ॥"

চিন্তামণি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সখীগণকে লইয়া সারারাত্র বিল্বমঙ্গলের সেবা করিল এবং—

"শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সনে রাস কুঞ্জলীলা।
গান করে সখীসনে হৈয়া এক মেলা ॥

একে নির্ব্বেদ আসিয়াছে, তাহাতে আবার ভগবানের লীলাগুণ কীর্ত্তন, চিন্তামণি যেন একেবারে নির্ম্মল হইয়া গেল আর তাহার সঙ্গে বিল্বমঙ্গলও বিশুদ্ধ হইল।

বিল্বমঙ্গল সমস্ত রাত্রি নিজের কুৎ-কর্ম্মের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সকাল বেলা চিন্তামণিকে গুরুবৎ প্রণাম করিয়া নদীর তীর দিয়া চলিতে লাগিল। আর ভাবনা কি, যখন অনুশোচনা আসিয়াছে তখন আর পূর্ব্ব দুষ্কৃতি থাকিতে পারে কি? ভগবান অমনি তাহাকে দয়া করিবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিলেন ঐ নদীর তীরেই "সোমগিরি" নামক এক বৈষ্ণব মহাত্মার আশ্রম ছিল, বিল্বমঙ্গল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ বৃত্তান্ত অকপট ভাবে সমস্ত বলিল। মহাত্মা তাহার সরল ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া তাহাকে গোপাল মন্ত্র উপদেশ দিলেন। এইবার বিল্বমঙ্গলের সাধনার জীবন আরম্ভ।

বিল্বমঙ্গলেরও সময় হইয়াছে আর ভগবানের কৃপায় উপযুক্ত গুরুর নিকট উপযুক্ত মন্ত্র পাইয়া সাধনা করিয়া বিল্বমঙ্গল যেন একেবারে এক নূতন মানুষ হইয়া গেল। ভজন করিতে করিতে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব বিল্বমঙ্গলের শরীরে প্রকট হইতে লাগিল। প্রাণ সেই বৃন্দাবন বিহারীর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু যাঁহার দয়ায় আজ তার এমন হইল সেই গুরুদেবের সেবা ছাড়িয়া যাইতেও যেমন প্রাণ চাহিল না ; তাই কিছুদিন গুরুর নিকট থাকিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া বহু গ্রন্থ লিখিল এবং শ্রীগুরুদেবকে শুনাইতে লাগিল। গুরুদেব সোমগিরি বিল্বমঙ্গলের বর্ণিত লীলা শ্রবণ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়া তাহাকে "লীলা-শুক" এই নাম প্রদান করিলেন যথা—

"তাহা দেখি গুরু "লীলাশুক" নাম দিলা ॥"

বিল্বমঙ্গল সংসারী ছিলেন, কিন্তু চিন্তামণির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় সংসারে তত মন দিতে পারিতেন না। তাঁহার আত্মীয়গণও প্রায়ই চিন্তামণির সংসর্গ ছাড়াইবার জন্য নানাবিধ উপায় করিতেন, কিন্তু সময় না হইলে ত কিছুই হইবে না? তাই এতদিন বহু আয়াশ করিয়াও আত্মীয় কুটুম্বগণ যাহা পারেন নাই বিনা আড়ম্বরে যখন তাহা হইয়াছে, তখন যাহাতে বিল্বমঙ্গল পুনরায় আসিয়া ঘর-সংসার করে সেইজন্য তাহার আত্মীয় কুটুম্বগণ নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু সংসার করিবে কে? সে বিল্বমঙ্গল যে এখন আর নাই, সে যে সেই দুর্য্যোগের রাত্রে চিন্তামণির ভর্ৎসনারূপ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া নিজ কৃত-কর্ম্মের অনুতাপরূপ অনলে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়া আবার এক নূতন মানুষ—শুধু মানুষ নয় দেব-চরিত্র তুল্য খাঁটি মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। তারপর আবার উপযুক্ত গুরুর কৃপায় এখন বিল্বমঙ্গল এক মহাশক্তিশালী সাধু পুরুষ হইয়াছে। এখন আর তার বাহ্যিক জগৎ দৃষ্টি-পথে আসেই না। তাই সে আত্মীয় স্বজনগণের কথায় কর্ণপাতও করিল না। শেষে যখন তাহারা তাঁহার গুরুর উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিল তখন বিল্বমঙ্গল শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে গুরুর নিকট আজ্ঞা লইয়া তাহার অভিষ্ট দেবের লীলানিকেতন শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিল।

বিল্বমঙ্গল পথে চলিয়াছে কিন্তু বাহ্য-স্ফূর্ত্তি নাই সর্ব্বদাই যেন কৃষ্ণ-লীলা দর্শনে মুগ্ধ, তাহার যতই এই ভাব গাঢ় হইতে লাগিল ততই বৃন্দাবনে যাইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দ দর্শন লালসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ভাবাবেশে

যেরূপ যখন স্ফূর্ত্তি হইত তাহা তখন শ্লোকবন্ধে ব্যক্ত করিতেন, তাঁহার সঙ্গী বৈষ্ণবগণ উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই শ্লোকগুলিই "শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এ বিষয় কেহ কেহ বলেন যে, বিল্বমঙ্গলের কৃত এই শ্লোকগুলি শ্রীকৃষ্ণ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া ছিলেন বলিয়া ইহার নাম "শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত" হইয়াছে।

যাহাই হউক মোট কথা বিল্বমঙ্গলের এই "শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত" গ্রন্থ বড়ই অপূর্ব্ব। ইহা বঙ্গাক্ষরে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই, শুনিয়া ছিলাম শতাধিক শ্লোকবিশিষ্ট তিনটী অধ্যায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই, যদি বঙ্গভাষার উন্নতিকামী সাহিত্যিকগণ এ বিষয় যত্ন করেন তাহা হইলে এক অপূর্ব্ব রত্ন বাঙ্গালির ঘরে ঘরে রাখিবার সুযোগ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এ বিষয় যত্ন লইবেন কি?

কলিপাবনাবতার বাঙ্গালির ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর দক্ষিণ দেশ হইতে যে দুইখানি গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার একখানির নাম "শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত।" ইহার প্রথম শ্লোক—

"চিন্তামণির্জ্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপুচ্ছ মৌলিঃ।
যৎ পাদ কল্পতরু পল্লব শেখরেষু
লীলা স্বয়ম্বর রসং লভতে জয়শ্রীঃ॥"

এই শ্লোক পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে চিন্তামণি নামক বেশ্যা বিল্বমঙ্গলের শিক্ষাগুরু এবং সোমগিরি নামক সন্ন্যাসী তাঁহার দীক্ষাগুরু। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক এই গ্রন্থরাজ আনিত হইলে প্রথমে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ইহার একটী টীকা প্রণয়ন করেন এবং তাহার পর কবিকর্ণপুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচৈতন্য দাস ও তৎপরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়া ছিলেন।

কিন্তু অতি বিস্তৃত টীকা হইলেও সাধারণের বুঝিতে কষ্ট হইবে বলিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আদেশানুসারে যদুনন্দন ঠাকুর বাঙ্গলা পদ্যে ইহার অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবজগতের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধ মধ্যে যে সব বাঙ্গলা পয়ার উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইয়াছি উহা ঐ যদুনন্দন ঠাকুর কৃত পদ্যানুবাদ।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া কঠোর সাধনা করেন এবং শেষে

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলা দর্শন করিতে করিতে বৃন্দাবনেই তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

বৃন্দাবন গমনকালে পথিমধ্যে অনেক অলৌকীক ঘটনা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে আমরা তাহার দু'একটী পাঠকগণকে আভাস দিব।

বৃন্দাবন গমনকালে বিল্বমঙ্গল পথিমধ্যে কোনও অতিথি-সেবা-পরায়ন বণিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রার্থনা করেন বণিক কর্ত্তৃক পত্নী তাহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি নাকি তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ লৌহ-শলাকা দ্বারা নিজ নয়নদ্বয় নষ্ট করিয়া ফেলেন।

প্রবাদ যে, এই ভাবে নয়নদ্বয় নষ্ট করিয়া কোনও গ্রামে বসিয়া ভজন করিতে থাকেন সেই গ্রামে নাকি উনত্রিংশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহারা এক এক জন এক এক দিন বিল্বমঙ্গলের ভোজন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিতেন। লোক পরম্পরা এই উনত্রিংশ ঘর ব্রাহ্মণদ্বারা কি ভাবে তিনি সেবিত হন তাহা জানিতে পারিয়া বাকী এক দিবস কে তাঁহাকে অন্ন যোগায় ইহা ভাবিয়া ত্রিংশৎ দিবসে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্ন দিতে আসিল তাহাকে তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। ধরিয়াই বুঝিতে পারিলেন এ আর কেউ নয় তাহার অভিষ্ট দেব শ্রীকৃষ্ণ। অনেকক্ষণ ধরিয়া টানাটানি করিয়াও যখন তাহাকে রাখিতে পারিলেন না, যখন কৃষ্ণ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন তখন বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ, তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া গেলে ইহা তেমন আশ্চর্য্য নয় যেহেতু তুমি বলবান আমি দুর্ব্বল, যদি তুমি আমার হৃদয় হইতে দূরে যাইতে পার তবেই তোমার পুরুষত্ব গণনা করি।

ভক্তমালে বর্ণিত আছে—যখন ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট গুজরার ঘাটে বসিয়া ভক্ত বিল্বমঙ্গল অনাহারে থাকিয়া ভজন করিতে ছিলেন তখন ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বিল্বমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন—

"রৌদ্রে কেন বসি ভাব ভোখে কেন রহ।
ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ॥"

উত্তরে বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন আমি অন্ধ—আমাকে তুমি হাত ধরিয়া

লইয়া যাও। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের বাক্য ফেলিতে পারিলেন না। তিনি যেমন বিল্বমঙ্গলকে হাত ধরিয়া গাছতলায় লইয়া আসিলেন অমনি—

"সাপটিয়া ধরে সাধু অতি দ্রুতকরি ॥"

এবার আর ভগবান ভক্তের হাত ছাড়াইতে পারিলেন না। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে কৃতার্থ হইয়া বলিলেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভো"

ভগবান বিল্বমঙ্গলের বর্ণনা শুনিয়া তৃপ্ত হইলেন কিন্তু আরও শুনিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু অনুভবের দ্বারা বর্ণনা আর প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনা দুয়ের মধ্যে মধুরতার তফাৎ আছে মনে করিয়া নিজশ্রীকর-পল্লব বিল্বমঙ্গলের নয়নের উপর দিতেই হঠাৎ দিব্যচক্ষু লাভ হইল এবং প্রথমই কৃষ্ণের বদন বিল্বমঙ্গলের নয়নপথে পতিত হইল, অমনি বলিয়া উঠিলেন—

"মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ॥"

ভগবান যেন এই কথা শুনিয়া ঈষদ্ধাস্য করিলেন, অমনি ব্যাকুলপ্রাণে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিলেন—

"মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥"

বিল্বমঙ্গল ধন্য হইলেন। শ্রীভগবানকে সম্মুখে বসাইয়া প্রাণের আবেগে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

এইবার আমরা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও তাঁহার রচিত "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিব।

কেহ কেহ বলেন "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" নাম বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নিজে দেন-নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার গ্রন্থপাঠে দেখিতে পাই ঐ "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের শেষে তিনি লিখিয়াছেন—

"লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব;

কর্ণামৃতং বহতু কল্পা শতান্তরেঽপি।"

অন্যত্র আছে—

ধন্যানাং সরসালাপসরণী সৌরভ্যমভ্যস্যতাং।

কর্ণানাং বিবরেষু কামপি সুধাবৃষ্টিং দুহানংমুহুঃ ॥

রম্যাণাং সুদৃশাং মনো নয়নয়োর্মগ্নস্য দেবস্য নঃ।
কর্ণানাং বচসাং বিজৃম্ভিতমহো কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতম্॥

এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয় গ্রন্থকার নিজেই গ্রন্থের নাম কৃষ্ণ-কর্ণামৃত রাখিয়াছিলেন।

তারপর বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কোনসময় বর্ত্তমান ছিলেন যদিও তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না তথাপি তাঁহার কৃত একটী শ্লোক আলোচনা করিলে বেশ বুঝাযায় যে, শঙ্করাচার্য্য দ্বারা অদ্বৈতমতের প্রবল-প্রচারের পর রামানুজাচার্য্য দ্বারা দাক্ষিণাত্যে শঙ্করমতের উপর দোষারোপ করিয়া যখন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচার হয় সেই সময়ই বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অদ্বৈতমত পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বৈতমতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন—

অদ্বৈতবীথি পথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসন লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

অর্থাৎ অদ্বৈত পথের পথিক জ্ঞানিগণের উপাস্য ব্রহ্মানন্দানুভব সিংহাসনে দীক্ষিত যে আমরা সেই আমাদিগকে কোন গোপ-বধূ-কামুক শঠ বলপূর্ব্বক নিজের দাস করিল।

আর এক কথা। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সোমগিরির শিষ্য একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি দশনামা সন্ন্যাসীদিগের উপাধি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়, সুতরাং এই হিসাবেও বুঝা যায় শঙ্করাচার্য্যের পর ও রামানুজাচার্য্যের সময় অর্থাৎ দ্বাদশ শত শকাব্দার মধ্যে কোন সময় বিল্বমঙ্গল বর্ত্তমান ছিলেন। *

শ্রীনটবর গোস্বামী।

---

* পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ কোন সমীচিন প্রমাণ দ্বারা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দেশ করিতে পারেন আমরা সাদরে গ্রহণ করিব এবং ভক্তিপত্রিকায় যথাসময় প্রকাশ করিব। (ভক্তি-সম্পাদক)

মানুষের অবস্থা

মানুষ সারা জীবন পাপ করিয়া হাজতের আসামীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবানের নিকট পাপের মার্জ্জনা চায়। যখন পাপের জন্য হৃদয়ে অনুতাপ আসে এবং কিসে পাপ দূর হইবে তাহার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে তখন আর তাহাকে সাধক না বলিয়া পারা যায় না, কিন্তু সাধক বলিলেও তখন তাহাকে এমন অবস্থার সাধক বলা যায় না, যে অবস্থাতে সে নিজের পালকরূপে ভগবানকে ভাবিতে পারে। আমি তোমার এবং তুমিও আমার এতটা জোর সে তখন দেখাইতে পারে না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারে—

"তুঁহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার।"

অর্থাৎ তুমি জগন্নাথ জগতপালক আর আমিও এই জগতেরই একজন। বস্ এই টুকুর বেশী ভরসা তখন হয় না। কিন্তু ক্রমে যখন সাধনায় উন্নত হইতে থাকে তখন সে আর কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করে না জোর করিয়া বলিতে পারে—

"তোমার মতন এমন আপন ভুবন মাঝারে নাই আমার।
জীবন বল্লভ—নাথ তুমি আমার আমিও তোমার॥"

এ কথা বলিয়াও যে সে নিশ্চিন্ত হইয়া আবার পূর্ব্বের মত পাপ লিপ্ত হয় তাহা নয়, এ কথা বলে আর সেই ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনাও করে, সে যে কেমন তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। এইরূপ প্রার্থনার ঘন ঘন আঘাতে তাঁহার রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যায় তখন সে দেখিতে পায় তাহার বাঞ্ছিত ধন সম্মুখে, এবং সাধককে অভয় দিয়া বলিতেছেন, "বৎস তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি তুমি বর গ্রহণ কর। যদিও সাধন পথে প্রবৃত্ত হইবার সময় সাধকের মনে মনে কোনও বাসনা ছিল কিন্তু কি জানি কেন আজ বাঞ্ছাকল্পতরুকে পাইয়া সে কামনা আর করিতে ইচ্ছা হইল না, কেমন এক ভাবে বিভোর হইয়া ধ্রুব যেমন বলিয়াছিল সেই ভাবে বলে "স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।" আমি কৃতার্থ হইয়াছি আর বর চাই না।

কিন্তু ভগবান বাঞ্ছাকল্পতরু, কল্পতরুর নিকট আসিয়া তো কেউ বিমুখ হয়

না, তাই ভগবানের পুনঃ পুনঃ দিবার ইচ্ছার উত্তরে সাধক বলেন—"প্রভু আমি তো কিছু চাই-ই না, যদি নিতান্তই তুমি না দিয়া ছাড়িবে না তবে এই কর আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার সেবার অধিকার পাই।

কল্পতরুর কৃপায় ভক্ত সাধকের প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না—পূর্ণ হয়। ভক্ত তখন সাধমিটাইয়া সেবা করিবার অধিকার পায়।

এই বার ভক্ত আরও ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইল। কেন না সেবা'তো আর তফাতে থাকিয়া হয় না?

ভক্ত সেবা করিতে থাকে আর প্রাণের আগ্রহও তার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ক্রমে শ্রীবিগ্রহ সেবা, মন্দির মার্জ্জন, তুলসী সেবন, সাধু বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা প্রভৃতি করিয়া নিজ ভাব আরও পুষ্ট করিতে থাকে। এই ভাবে সাধনা করিয়া সে নিজ জীবনও ধন্য করে এবং জগৎ সমক্ষে একটা খুব উচ্চ আদর্শ রাখিয়া দেয়। তাহার পরের সাধকগণ পূর্ব্ব মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই সেই ভাবে নিজ নিজ জীবন উন্নত করিতে থাকে।

দীন—শ্রীকৃষ্ণবন্ধু দাস

ভক্তের প্রার্থনা

সাধারণ জীবের সহিত কোন বিষয়েতেই ভক্তের মিল খাটেনা। সাধারণ জীব খায় দায় সংসারের দু'একটা সুখ দুঃখের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করে। বড় জোড় ২।৪ জন একসঙ্গে বসিলে পরস্পরের নিকট নিজ নিজ দুঃখ দৈন্যের কথা বলিয়া নিজ নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়। খুব বেশী হইলে ভগবানের উপরও নিজ দুর্দ্দৈবের বোঝা চাপাইতে ছাড়ে না। তার পর যখন যাহা অভাব দেখে তখনই "ভগবান আমাকে এইদাও ওইদাও" ইত্যাদি ভাবে নিজের জন্যই প্রার্থনা করে কিন্তু ভক্ত—যথার্থ যাহার প্রাণ সেই প্রাণকান্তের পদে বিকাইয়াছে সে এসব কিছু চায়না। তাহার চাওয়ার মধ্যেও একটী এমন জিনিস আছে যাহা শুনিলে অতিবড় পাষণ্ডও না গলিয়া পারে না, আমরা আজ ২।১টী ভক্তের প্রার্থনার কথা বলিব। পাঠকগণ দেখিবেন যে, তাহাদের এই প্রার্থনায় নিজের জন্য কিছুমাত্র নাই সমস্তই

পরার্থে। যেখানে পরার্থে নাই সেখানেও নিজের ঐহিক সুখের কোন প্রার্থনা নাই। সাধারণ জীবের মত ধন, জন, বিদ্যা প্রভৃতি প্রার্থনা তাঁহারা করেন নাই।

জীব উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে প্রকাশ হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই দয়ালপ্রভুর শুভ আবির্ভাবের আভাস কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছিলেন। আবির্ভাবের সময় তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য ও প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহ দর্শনে কেহ কেহ বুঝিলেন ইনি ভগবান না হউন সাধারণ জীব অপেক্ষা যে বহু উচ্চস্তরের তাহাতে সন্দেহ নাই। তার পর বাল-লীলার নানাবিধ নর্ত্তন কুর্দ্দন ভাবভঙ্গি দর্শনে বাহিরের অনেকের প্রাণে একটা নূতন ভাব সৃষ্টি করিতেছিল। ক্রমে যখন আরও একটু লীলার বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল তখন নবদ্বীপবাসী ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, যুবক যুবতী, নর নারী সকলেই বুঝিয়াছিল ইহার ভাব ইহার খেলাধূলা "ন ভূত ন ভবিষ্যতি।"

ভক্তগণ যে তাহাকে ভগবান বলিয়া মানিয়াছিলেন তাহাত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইবার অন্য সাধারণকে নিজ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ লীলা আস্বাদনের অবসর দিয়া এক অভিনব লীলার সূচনা করিলেন।

পরম ভাগ্যবন্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রভু আপন ভক্তগণ সহ কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে একদিন মহাভাবের আবেশে প্রভু ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন তোমাদের দুঃখ দেখিয়া আমি তোমাদের কাছে আসিয়াছি। তোমরা আমার কাছে যাহা চাহিবে আমি তোমাদিগকে তাহাই দিব। এমন প্রাণ জুড়ান অভয় বাণী শুনিয়া ভক্তগণ প্রভুকে যাহার যেমন অভিলাষ তাহা জানাইলেন, প্রভুও ঈষৎ হাসিয়া একে একে সকলের প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন। হঠাৎ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের প্রতি চাহিয়া হুঙ্কার করিয়া বলিলেন এই অদ্বৈতের হুঙ্কারেই আমার আবির্ভাব।

"শুতিয়া আছিনু মুই ক্ষীরোদসাগরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাড়ার * হুঙ্কারে॥"

---

* শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে প্রভু 'নাড়া' বলিয়া ডাকিতেন, কেন ডাকিতেন তাহা তিনিই জানেন। আজকাল অনেকে 'নাড়' সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত হইতে অদ্বৈত প্রভুর নাড়া নাম হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ দিয়া থাকেন। আমরা আজ সে বিষয় আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিব না। আরও কিছুদিন আমরা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগের বক্তব্য

সুতরাং আমার এই অবতারের মূল কারণই এই নাড়া। প্রভুর এই বাক্য শুনিয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া সকলে অদ্বৈতের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। তখন প্রভু অদ্বৈতের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কৈ তুমি ত কিছু বর চাহিলে না?" প্রভুর কথা শুনিয়া অদ্বৈত আচার্য্য যাহা বলিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভাষাতেই তাহা বলি।

"অদ্বৈত বলেন প্রভু মোরে এই বর।
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর॥"
"অদ্বৈত বোলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ লইয়া॥"

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন ত্রিজগতের নাথ তুমি সম্মুখে, প্রাণ ভরিয়া তোমার সহিত কথা বলিতে পারিতেছি, নয়ন ভরিয়া তোমার ত্রিভুবন উজোর কারী রূপ-সুধা পান করিতেছি, ইহা ব্যতীত চাহিবার বা পাইবার আর কি আছে। তবে যদি একান্তই বর দিবে তো এই বর দাও, শাস্ত্রানুসারে যাহারা তোমার পূজার অনধিকারী সেই স্ত্রী শূদ্র চণ্ডাল মূর্খ দরিদ্র প্রভৃতিকে তোমার ভক্তি দাও। তোমার প্রেমে, তোমার গুণগানে, আচণ্ডালে আনন্দে নৃত্য করুক, অধম, পাপী, মূর্খ বলিয়া কেহই যেন বঞ্চিত না হয়।

এই ত অদ্বৈত প্রভুর প্রার্থনা। এইবার আবার পরমভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীবাসের প্রার্থনাটা শুনুন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় যখন পুরাদমে কীর্ত্তন চলিতেছে সেই সময় শ্রীবাসের পুত্র অন্দরমহলে মৃত্যুশয্যায় শায়ী। শ্রীবাস-গৃহিণী শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্টা। দেখিতে দেখিতে কীর্ত্তনের রোলের সহিত পুত্রের প্রাণবায়ু অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল, সকলে কাঁদিয়া উঠিলেন। অমনি শ্রীবাস ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, "কাঁদিবার সময় অনেক পাইবে কিন্তু আজ তোমার গৃহে যে দেবদুর্লভ প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের ছলে ভক্তগণ

বলিব। সহৃদয় পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ প্রভুর এই নাড়া বলিয়া সম্বোধনের কারণ অবগত থাকেন আমাদিগকে জানাইলে আমরা যথাসময় ভক্তি পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিব। (ভঃ সঃ)

পরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন, এ শুভ-দর্শন, এ শুভ-সুযোগ, এ মহা সংযোগ জীবনে আর হইবে কি না সন্দেহ। চল একবার নয়ন ভরিয়া ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া এবং সেই সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া দর্শন ও শ্রবণের পিপাসা মিটাইয়া লই।" এই বলিয়া মৃত পুত্রকে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়া উভয়ে কীর্ত্তনস্থলীতে গমন করিলেন।

এদিকে প্রভুর অন্য দিনের মত কীর্ত্তনে স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, অন্তর্য্যামী প্রভু সবই বুঝিলেন কিন্তু ভক্তের মহিমা বাড়াইবার জন্য ছল করিয়া বলিলেন "ভক্ত-গণ! আজ আমার কীর্ত্তনে আনন্দ হইতেছে না কেন?" প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন ভক্ত শ্রীবাসের পুত্রের বৃত্তান্ত বলিলেন এবং পাছে কীর্ত্তনানন্দ ভঙ্গ হয় সেই জন্য যে শ্রীবাস এতক্ষণ এ বিষয় প্রভুকে জানান নাই তাহাও বলিলেন।

শুনিয়া প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন, তারপর বাড়ীর মধ্যে গিয়া যে ভাবে মৃত পুত্রকে কথা বলাইয়া ছিলেন মূল গ্রন্থাদিতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে আমরা সে সব কথা এখানে না বলিয়া শ্রীবাসের প্রার্থনার কথাই বলিব, কারণ গৌর-ভক্তের প্রার্থনার বিষয়ই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

প্রভু ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভক্তগণ! শ্রীবাসের হৃদয় ধন্য, আর ইহার ভক্তির পরাকাষ্ঠায় আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।" তারপর শ্রীবাসকে বলিলেন "শ্রীবাস! তোমার ভক্তিতে আমি বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি, তুমি কিছু প্রার্থনা কর! সংসারের দুঃখতো তোমার নাই, কিন্তু আমি এই বর দিলাম যে তোমাকে দেখিবে বা তোমার নাম করিবে, তোমাকে ভক্তি করিবে তাহারও কোন দুঃখ থাকিবে না। তারপর তোমার এক পুত্র গিয়াছে সেজন্য কোন দুঃখ করিও না আমি এবং নিত্যানন্দ দুইজনে তোমার দুই পুত্র হইলাম।" শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন—

"জন্মে জন্মে তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু॥
যেখানে সেখানে প্রভু কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেম-ভক্তি রহে॥"

প্রভু, তুমি পুত্র, তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমি আর কিছু চাই না। আর চাহিবই বা কি, যাহাকে পাইবার জন্য কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কত সাধনা করেন সেই তুমি আজ আমার সম্মুখে। তবে এক প্রার্থনা যে, এবার তো জন্ম পাইয়া তোমাকে পাইয়াছি অতঃপর আমাকে যেখানে অন্য যে কোন

যোনীতে জন্ম দাও না কেন তোমার ঐ চরণে যেন আমার প্রেম-ভক্তি থাকে।" শ্রীবাসের প্রার্থনা শুনিয়া ভক্তগণ প্রেমানন্দে হরিবোল হরিবোল বলিয়া উঠিলেন। এইবার শ্রীধরের পালা।

আজ নবদ্বীপে ভক্ত-সমাজে মহা হুলুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রত্যহই নৃত্য কীর্ত্তনে সকলে যোগদান করেন প্রভুও সকলকে লইয়া আনন্দ করিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া যান।

আজ শ্রীবাসের মন্দিরে প্রভুর মহাপ্রকাশ হইয়াছে অসংখ্য নরনারী আসিয়া দেখিয়া ধন্য হইতেছেন কত ভক্ত প্রাণ ভরিয়া প্রভুর নিকট নিজ প্রার্থনা জানাইয়া তাহার যথাযথ সদুত্তর পাইয়া আনন্দ মনে গৃহে ফিরিতেছে।

শ্রীধর বড় দরিদ্র, নবদ্বীপেই তাহার বাস। থোড়, কলা, খোলা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে কোন রকমে সে দিনপাত করে, কোন দিন আহার যোটে কোন দিন যোটেও না। সাধারণে তাহাকে খোলা বেচা শ্রীধর বলিয়াই ডাকে। শ্রীধর প্রভুর বড়ই প্রিয়পাত্র। থোড়, কলা লইয়া মধ্যে মধ্যে প্রভুর সহিত তাহার বিশেষ কন্দল হয়। অবশ্য সে কন্দল প্রেম কন্দল, যেরূপ কন্দল ভক্ত ও ভগবানে নিত্য হয় সেইরূপ।

আজ প্রভুর মহাপ্রকাশ দেখিতে সকলেই আসিয়াছে শ্রীধরও আসিয়া এক পাশে বসিয়া প্রভুর লীলা খেলা দেখিতেছে, প্রভুর আদেশে শ্রীধর তাঁহার সম্মুখে আসিলেন এবং তাঁহার কৃপা পাইয়া নানাবিধ স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রভু এইবার শ্রীধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"শ্রীধর তুমি বর নাও, আজ যাহা চাহিবে তাহাই দিব।" শ্রীধর তাহা শুনিয়া বলিলেন—

প্রভু আর না ভাড়াইবা।
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি আর না পারিবা।"

শ্রীধরের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিলেন এবং পুনরায় তাহাকে বলিলেন, শ্রীধর আমার এই দর্শন ব্যর্থ হইবার নয়। তোমার সাংসারিক কষ্ট দূর হইবে আমি তোমাকে এক মহারাজ্যের ঈশ্বর করিয়া দিব, তুমি অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কিছু প্রার্থনা কর। যথা—

"হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করো তোমারে ঈশ্বর॥

কিন্তু শ্রীধর তো তাহা চান্ না, তিনি বলিলেন প্রভু আর কেন ছলনা, তোমাকে

যখন পাইয়াছি আর আমার কষ্ট কি? তবে যদি নিতান্তই বর দিবে তবে এই বর দাও—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল॥

প্রভো! কত রাজরাজেশ্বরের প্রদত্ত উপাদেয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণ জোর করিয়া আমার নিকট হইতে খোলাপাত কাড়িয়া লইত আমার প্রদত্ত এক টুকরা থোড়কলা সে ব্রাহ্মণ মিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিত সেই ব্রাহ্মণ যেন জন্মে জন্মে আমার আশ্রয় হয় এই প্রার্থনা।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য

দায়ী কে?

সংসার-সাগর-নিমগ্ন জীবের উত্তরণের তরণী সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ। একথা সাধু গুরুর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রও পুনঃ পুনঃ এই কথাই নানাভাবে নানাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিজের দুর্দ্দৈব বশতঃ বা অন্য যে কোন কারণেই হউক প্রকৃত সাধুসঙ্গ আজকাল বড়ই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

সাধুর পোষাক পরিয়া, বাহিরে সাধুর ভান দেখাইয়া সংসার-মোহ-পঙ্ক-নিমজ্জিত জীবকে আরও ভ্রমে ফেলিয়া অনেকে আজকাল সাধুর নামে কলঙ্ক করিতেছেন। ইঁহারা বেদবিধি বা আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া নিজেদের সুবিধা মত মনগড়া মত লইয়া খুব আড়ম্বরের সহিত জন সমাজে আবির্ভূত হইতেছেন, আমরা বলিতে পারি না এরূপ সাজা সাধুর সঙ্গ করিলে যথার্থ জীবের কল্যাণ হয় কি না। বিশ্বাসের দ্বারা যদিও দু'একজনের কথঞ্চিৎ কল্যাণ হইতে পারে কিন্তু মোটামুটি অকল্যাণই যে বেশী হয় এইরূপই আমাদের ধারণা।

তারপর, সৎপ্রসঙ্গ কচিৎ কখন কখনও কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইলেও

আমাদের নিজের দোষেই হউক বা উপদেষ্টা নিজে আচরণশীল নয় বলিয়াই হউক ঐ শোনা পর্য্যন্তই হয় উপদেশ মত কার্য্য করা হয় না।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—

"আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

যিনি নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করেন তাঁহার কথাতেই ঠিক কার্য্য হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" সেই জন্যই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এত অত্যাচারেও লোকের নিকট অতি আদরের সহিত আজ-পর্য্যন্ত গৃহিত হইতেছে।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এর জন্য দায়ী কে? সাধুর পোষাকধারী উপদেষ্টা, না আমরা। যদি আমার প্রাণের কথা বলিতে হয়, সরল ভাবে যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তবে আমি বলিব এর জন্য সম্পূর্ণ ষোল আনা না হইলেও পনের আনা তিন পাই দায়ী আমরা। কেন, তাই বলিবার জন্যই আজ উপস্থিত হইয়াছি। যদিও প্রাণের কথা বলিলে এক শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ তিরস্কৃত হইব, তথাপি না বলিয়া পারিলাম না, তাই দু'টো প্রাণের বেদনা পাঠকগণকে জানাইয়া কথঞ্চিৎ শান্তি পাইব মনে করিয়া বলিতেছি। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

প্রথম আমাদের স্বভাবের কথা বলি। তিলকে তাল করিয়া সাধারণের চক্ষে ধুলি দিতে আমরা এত পটু যে, সময় সময় বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াও নিজেদের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারি না। তারপর ধর্ম্মের নাম করিয়া জুয়াচুরীতে আমরা এমন সিদ্ধহস্ত যে, বোধহয় কোনও সময় এমন কেহ জন্মায় নাই যে, আমাদের সমকক্ষ হইতে পারে। আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, অন্য কোনও উপায়ে আমরা জন সমাজে দশজনের একজন হইতে না পারিলেও ধর্ম্মের নাম করিয়া যে কোন প্রকারেই হউক একবার দু'এক জনের মধ্যে নিজের ভণ্ডামি ঢাকিয়া একটু বুজ্‌রুকী দেখাইতে পারিলেই কাজ হাসিল হইয়া গেল, আর তখন আমাকে পায় কে? তারপর আর এক উৎপাৎ অবতার লইয়া।

কাহারও ভিতরে সামান্য কিছু অসাধারণত্ব দেখিলেই আমরা তাহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করি। ভাবের জল-গণ্ডুষ আমাদের মাহাত্ম্যে মহাসমুদ্রে পরিণত হইতে বড় বেশী দেরী লাগে না। কিন্তু ইহাতে যাহাকে অবতার করি তাহারও যে ক্ষতি করি না তাহা নহে। প্রথম প্রথম

হয় ত তাহার বেশ ধর্ম্মভাব ছিল কিন্তু পাঁচজ-নর পাল্লায় পড়িয়া তাহাকে সে ভাব বেশী করিয়া লোককে দেখাইতে হইল, ক্রমে ভণ্ডামী জাঁকিয়া বসায় খাটীভাব একেবারেই লোপ পাইল তখন যে কোন উপায়ে পূর্ব্ব ঠাট্ বজায় রাখিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। অমনি চারিদিকে নানাভাবের প্রচারক জুটিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত সরল বিশ্বাসী ২।৫ জন যদিও আসিয়া দল পুষ্ট করিতে থাকে কিন্তু সেটা বড় স্থায়ী হয় না, এই ভাবে নিজেরাও মজি, আর নিজেদের দোষে অন্য সম্প্রদায়ের চক্ষেও হেয় হই। এখন বলুন দেখি এই অবনতির জন্য দায়ী কে? একজন হয় ত সৎপথে চালিত হইয়া নিজ জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু আমরা পাঁচজনে তাহার উন্নতির পথ রোধ করিয়া দিলাম এ জন্য কি দায়ী আমরা নয়?

আজকাল বাজারে অবতারের অভাব নাই, একটু খুঁজিলে বোধহয় নানা-ভাবের নানা অবতার নয়ন গোচর হইবে। জানি না এতে সমাজের মঙ্গল হইতেছে কিম্বা ভীষণ অমঙ্গলের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌর ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীকৃষ্ণদাস দাস

আলোচনা

(১) শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকে রাসলীলা)

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মুখপত্র শ্রী গৌরাঙ্গ-সেবকে ১৩২৯ সাল ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা লইয়া যে ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন আমরা মনে করিয়া-ছিলাম উহা পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উক্ত গণপতি বাবুর প্রবন্ধের ঘোর প্রতিবাদ করিবেন। কিন্তু আজ এগার মাস গত হইল কেহই কোন প্রতিবাদ করিলেন না প্রতিমাসের গৌরাঙ্গসেবক পাইয়াই আমরা কিছু বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য ব্যগ্র হই। কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য নাই দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। গৌরাঙ্গসেবক পত্রিকার যিনি সম্পাদক তিনি বহু ভাষাবিদ্ একজন ভক্ত, অথচ সাহিত্যিক তিনিও কেন যে এতদিন নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না বুঝিতে পারিলাম না।

এখনও ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজের আচার্য্যগণের অভাব হয় নাই? বিশেষতঃ অনেক প্রভুপাদগণ ঐ রাসলীলা লইয়াই ত সভা সমিতিতে পাঠ বা ব্যাখ্যা করিয়া বেড়ান। তাঁহারাও কি ইহার কোন উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই? এ বিষয় যদি আলোচনা করা অনাবশ্যক বোধ করেন তবে তাহাও স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে জানান কর্ত্তব্য, অতঃপর আমরা না হয় গণপতি বাবুর মতেই রাসলীলা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দি।

ঐ প্রবন্ধ বাহির হইবার পর ঐ বিষয় লইয়া আমাদের সহিত প্রায়ই ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আলোচনা হয়, আমরা কিছু বলিলে তাঁহারা তত গ্রাহ্য করেন না তারপর তাঁহারা বলেন আপনাদের সম্প্রদায়ের যাঁহারা আচার্য্য তাঁহারা এ বিষয় লিখিত উত্তর দেন না কেন? এমন কি গৌরাঙ্গ-সেবকের গ্রাহকগণের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয় অধম লেখককে জানাইয়াছেন। তারপর ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায়ও এবিষয় অনেক অনুযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন আচার্য্য সন্তানকে আমরা এ বিষয়ের আলোচনার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধও করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা "কোন আবশ্যক নাই" "কি হইবে" "প্রতিবাদ করা উচিত নয়" প্রভৃতি কথা বলিয়া আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না এরূপ উত্তরের কারণ কি, বিপক্ষবাদী যদি কোন কথা না বুঝিতে পারিয়াই লিখিয়া থাকেন, আমাদের সে কথা তাহাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত নয় কি?

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাঁহার প্রত্যেক লীলাই আমরা সত্য এবং নির্দ্দোষ বলিয়া মানিয়া লই। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে যাহা বর্ণনা হইয়াছে তাহার একটী বর্ণও আমরা রূপক বলিতে পারি না। শুধু আমি নয় বোধহয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজের কেহই তাহা পারেন না। এমতাবস্থায় এখন পর্য্যন্তও গণপতি বাবুর প্রবন্ধের কোনরূপ আলোচনা কেন হইল না বুঝিলাম না। তারপর প্রতিবাদকারী কাগজওয়ালাদিগকেও বলি, তাঁহারা কেবল "এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত নয়, ইহা সম্পূর্ণ গোস্বামী সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ" প্রভৃতি দু'একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন কেন? তাঁহারা কি সমগ্র প্রবন্ধটী প্রতিবাদ করিতে পারেন না? আশাকরি শীঘ্রই আমরা গৌরাঙ্গ সেবকে অথবা প্রতিবাদকারী কাগজে ইহার বিশেষ রূপ আলোচনা দেখিতে পাইব। যদি নিতান্তই কোন আচার্য্য সন্তান বা ধর্ম্ম প্রচারক প্রভুপাদ গণ এ বিষয় লক্ষ্য না করেন তবে সম্পাদক মহাশয়ও যাহাতে নিজ মন্তব্য প্রকাশে বিলম্ব না করেন তজ্জন্য আমরা বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি। অনেক দিন হইয়াছে, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

(২) ধর্ম্ম পত্রিকা।

বেশী দিনের কথা নয় তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার শ্রীধাম নবদ্বীপে জনৈক প্রভু সন্তান দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন "বাজারে মাসিক ও সপ্তাহিক অনেক হইতেছে কিন্তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কাগজ যা দু'এক খানা আছে তাহাই কোন রকমে বাঁচিয়া আছে মাত্র। এবার গত বৈশাখ মাসে শ্রীধামের সেই প্রভুপাদের সহিত দেখা হওয়ায় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "প্রভু! এবার মাসিকের অভাবতো আর নাই-ই! দেখিতে দেখিতে সাপ্তাহিকও অনেকগুলি হইয়াছে। "প্রভুপাদ দুঃখ করিয়া বলিলেন "ভাই হইয়াছে বটে কিন্তু পড়িয়া শান্তি পাই কৈ! কোন খানিতে হয় ত ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের উপর জোর কষাঘাত, কোন খানিতে হয় তো ভুঁইফোঁড় মত প্রচার, আবার কোনখানি বৈষ্ণব সাপ্তাহিক নাম দিয়াও সেই পরনিন্দা পরচর্চ্চা প্রভৃতি প্রচার করিতেছে এসব তো দরকার নাই, যথার্থ প্রাচীন আচার্য্যগণ যে ভাবে সম্প্রদায়ের বিষয় উপদেশ করিয়া নিজেরা আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন সেই সকল সাধারণের মধ্যে প্রচার করাই আবশ্যক। কিন্তু ভাই, যে সব মাসিক বা সাপ্তাহিক বাহির হইয়াছে তাহাতে তাহা হয় কি?"

প্রভুপাদের কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না তাহা বোধহয় আর খুলিয়া বলিতে হইবে না। কাগজ বাহির হইতেছে ছাপাখানার কল্যাণে অঙ্গ সৌষ্ঠবেরও কোন ত্রুটী নাই কিন্তু খুলিয়া পড়িতে গেলেই যত গণ্ডগোল। প্রাচীন মত কেউ বড় আর মানিতে চান্ না। আচার্য্যগণের উপদেশ যার যেমন খুসি তিনি সেইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন। যিনিই কাগজ বাহির করেন তারই মূলে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় নিজ নিজ মত (সে মত মহাজন গ্রাহ্য হউক বা না হউক) প্রচার করাই উদ্দেশ্য।

এরূপ করিলে সম্প্রদায়ের উন্নতি হয় কি করিয়া। বিশেষতঃ এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার আরম্ভ হইলে অন্য সম্প্রদায়ের লোক উপহাস না করিয়া পারে না। তাহারা স্পষ্টই বলে "যাদের নিজেদেরই মতের মিল নাই তাহারা আবার পরকে উপদেশ দেয় কি করিয়া।" আমাদের মনে হয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যতগুলি কাগজ আছে (কি মাসিক কি সাপ্তাহিক) সকলগুলিকে লইয়া একটা সঙ্ঘ গঠন করিয়া এক একজন এক একটা বিষয় প্রচারের ভার লইলে যেন ভাল হয়। কিন্তু যেরূপ ভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব লইয়া প্রচার আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে কতদূর ফল হইবে বলিতে পারি না। এসব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ধর্ম্মের গ্লানি যেন আরম্ভ হইয়াছে। জানি না এমন কোন শক্তিশালী মহাপুরুষ সম্প্রদায়ের উন্নতি কল্পে আসিয়া আবার সব ছাঁটিয়া কাঁটিয়া খাঁটি জিনিস সাধারণের মধ্যে দিতে কতদিনে আরম্ভ করিবেন। আমরা শুধু এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের ঘোরঘনঘটা দেখিয়া সেই আশায় বসিয়া আছি। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর কতদিনে আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন জানি না।

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

(২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা

"তোমা হেন প্রিয়জন কে আছে হরি।
সম্পদে বিপদে, নিশিদিন কে সহায়
কে আর এমন হিতকারী ॥"

দীনবন্ধু! দীনের তুমিই একমাত্র ভরসা, আমার সুখে দুঃখে চিরসহচর পরম-বন্ধু তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। মোহ মদিরাপানে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া এতদিন তোমাকে জানিতে পারি নাই, বলিতে কি জানিতে ইচ্ছাও হয় নাই। এখন তোমার কৃপায়, তোমার ভক্ত-সঙ্গ পাইয়া আমার সে মোহের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করিতে একমাত্র তুমিই আছ। তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

আমার প্রতি যে তোমার অসীম দয়া, আমার নিকট হইতে ভালবাসার প্রতিদান কিছু না পাইলেও যে, অবিরত নানাভাবে তুমি আমাকে ভালবাসিতেছ, কিসে আমার সুখ হয়, কিসে আমি আনন্দে থাকিতে পারি অহরহঃ তুমি যে তাহা করিতেছ এতদিনে আমি তাহা বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছি।

দয়াময়! এই জানার জন্য এখন কাহার জয় দিব তাহাই ভাবিতেছি। তুমিত অনাদি কাল হইতেই জীবের প্রতি করুণ. কিন্তু এতদিন তো আমি তাহা

জানিতে বা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারি নাই, আজ না জানি কোন জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি বলে তোমার ভক্ত কৃপা করিয়া তাঁহার অমৃতময় সঙ্গ দিয়া আমার ভ্রম দূর করিয়া দিয়া তোমার অপরিসীম দয়ার কথা আমাকে জানাইয়া দিল। তাই বলিতেছিলাম এখন জয়টা তোমার দিব, কি তোমার ভক্তের দিব। সর্ব্বপ্রথমে তো আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার ভক্তের জয় দি, তারপর যাহা হয় হবে। জয় ভক্তের জয় !!

এইবার তোমার কাছে একটা নিবেদন—তোমার লীলা তো মানুষ ইচ্ছা করিলেই বুঝিতে পারে না ? যখন তোমার দয়া হইবে তখন তোমারই ইচ্ছায় তোমার ভক্ত আসিয়া নানাভাবে জীবকে লীলার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবে। কিন্তু প্রভু, সর্ব্বদা ত সে সঙ্গ পাই না ; সংসার দিয়াছ সে সংসার যাহাতে করিতে পারি সেরূপ শক্তিও ত তোমাকেই দিতে হইবে ? নচেৎ আমরা আর কোথা হইতে শক্তি আনিব। তাই তোমার নিকট প্রার্থনা, যাহাতে সংসার করিতে যাইয়া তোমাকে ভুলিয়া না যাই তাহা করিও। সংসার করিতে যাইয়া নানা প্রকার রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য আসিয়া খুব জোর কষাঘাত করিবে, কিন্তু দেখিও প্রভু,সেই কষাঘাতে যেন জ্ঞান শূন্য হইয়া তোমাকে আবার ভুলিয়া না যাই। যে ভাবে যেখানে রাখিয়া যে খেলা খেলিবার ইচ্ছা হয় খেল, কিন্তু খেলার ছলে তোমাকে যেন ভুলিয়া না যাই এই করিও। তোমাকে ভুলিয়া আমার যত কেন সুখ, যত কেন ঐশ্বর্য্য আসুক না, কিছুই আমি চাই না। তোমার ভক্ত সত্য সত্যই বলিয়াছেন—

"কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে।
(যদি) চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চির মগন না রয় হে ॥"
অগণন ধনরাশী তাহে কিবা ফলোদয় হে।
(যদি) লভিয়ে সে ধনে পরম রতনে যতন না করয় হে ॥
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে।
(যদি) সে চাঁদ বয়ানে তব প্রেম-মুখ দেখিতে না পাই হে।
কি ছার শশাঙ্ক জ্যোতি দেখি আঁধার ময় হে।
(যদি) সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম-চাঁদ নাহি হয় উদয় হে ॥
সতীর পবিত্র প্রেমও মলিনতা ময় হে।
(যদি) সে প্রেম-কণকে তব প্রেমমণি জড়িত না রয় হে ॥"

* * * *

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১২)

২১।— গৌরাঙ্গ হে দয়ালা দীন্‌কে তরাণে ওয়ালে।
নাম কে রটানে ওয়ালে, প্রেমকো লুটানে ওয়ালে
নদীয়া নগর্‌মে কীর্ত্তন ধূম্‌কে মচানে ওয়ালে ॥
পাপি উঁকে ত্রাণ কিহো, পতিতোঁকে গতি দিহো
জগাই মাধাইয়া দোনো ভাইয়াকে তরাণে ওয়ালে ॥
দণ্ডকমণ্ডলুধর্‌কে, সাধুকে স্বরূপ বনাকে
যাই নীলাচল্‌মে আপনা ধরম্‌কে শিখানে ওয়ালে ॥
সার্ব্বভৌম দর্প হর, প্রতাপরুদ্রকে নিস্তার
ষড়ভুজা ধর্‌কে মহা সংশয়কো মিটানে ওয়ালে ॥
(হে) মহাপ্রভু মহারাজ, রাজনকে রাজাধিরাজ
দাস বিশ্বরূপকে ভব বন্ধন সে ছোড়ানে ওয়ালে ॥
(যমদণ্ড সে বাচানে ওয়ালে)

২২। শ্যাম সুন্দর ব্রজবিহারী।
কিয়ে সুঠাম, বিনোদ বঙ্কিম, তমাল তরুতলে পেখিনু হরি
নিরখি রূপ ব্রজ-ভূপ নন্দনে চকিতে চিত উনমত হামারি ॥
না ধরে ধৈরজ, দহিছে মনসিজ, মরম বেদনা শুন সহচরি
কি ছলে যাব জলে পুনঃ সে তরুতলে হেরিব মোহন মুরলীধারী ॥
কিয়ে সে নাগর, নবীন নটবর, নধর অধরে ধরে বাঁশরী
কি ছা'র নারী মন মুগ্ধ মুনিগণ 'বিশ্ব' বিমোহিত হেরি মাধুরী ॥

সম্পাদক।

"ব্রজভাব"

জীবমাত্রেরই শক্তির একটা সীমা আছে, যার যতটা করিবার ক্ষমতা তাহার বেশী কিছু করিতে গেলেই তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে অথবা কপটতার আশ্রয় করিয়া দশজনকে ফাঁকি দিতে যাইয়া নিজেকেও ফাঁকে পড়িতে হইবে। এ নিয়ম লৌকীক জগতে সাধারণ কার্য্যাদিতেও যেমন ভজন রাজ্যেও ততোধিক। জাগতীক কোন কার্য্যের কথা এখানে তুলিব না ভজন রাজ্যের কথাই বলি।

সাধারণতঃ দেখা যায় এক একজন এক এক ভাব লইয়া উপাসনা করে। যেমন কেহ শান্ত ভাবের উপাসক, কেহ দাস্য ভাবের উপাসক, কেহবা বাৎসল্য ভাবের উপাসক ইত্যাদি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই রস পঞ্চকের যে কোনও একটী আশ্রয় করিয়া সাধক সাধনা করে। কিন্তু জীবতো জীবই বটে, সে তো আর মুখের জোরে বা অন্য কোন ভাবে জীব ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না?

স্বনামধন্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার "শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিতের" এক স্থানে "ব্রজের নিগূঢ় রস" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া এ বিষয়টী অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার স্থল বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিশির বাবু বলিয়াছেন—"ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে অতি দুর্লভ। আমি ব্রজ-গোপী, কি আমি ব্রজের লোক, মুখে বলিলে হয় না। বাক্যের নূপুর পায়ে দিয়া, কি উপমার শাটী পরিয়া, গোপী সাজিলে গোপী হওয়া যায় না। অনেকে দেহ-তত্ত্ব, কি ভাগবত-তত্ত্ব কি রস-শাস্ত্র পড়িয়া কতকগুলি কার্য্যমাত্র শিখেন, শিখিয়া আপনার মনকে এই বলিয়া বঞ্চনা করেন যে, তিনি ব্রজের লোক হইয়াছেন। অনেকে বেশ উপমা দিতে পারেন। কিন্তু উপমা যোজনা করিতে পারিলেই মন কেন নির্ম্মল হইবে, কৃষ্ণ-প্রেম কেন হইবে? একটী উপমা শ্রবণ করুন। যথা, জীবন কিরূপ? না, পত্র পত্রের জলের ন্যায়। কিন্তু এই উপমার শুধু অর্থ বুঝিয়া কি ফল হইল? যিনি হৃদয়ে বুঝিতে পারেন যে, জীবন অতি চঞ্চল, এই আছে এই নাই, আর ইহা বুঝিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন তিনিই প্রকৃতরূপে এই উপমার ফল ভোগী।

তবে ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে দুর্লভ বলিয়া কি জীবে ব্রজের ভজন করিবে না? তাহারও উপায় শ্রীমন্মহাপ্রভু করিয়া গিয়াছেন। ব্রজের ভজন করিতে হইলে গোপীগণের অনুগত হইয়া করিতে হয়। তুমি রাধা হইতে পার না সুতরাং তুমি রাধার দাসী হও। তুমি যশোদা হইতে পার না তুমি তাঁহার গণ হও, হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিগণের যে লীলা তাহা উপভোগ কর। তুমি রাধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন কর এ সাধ্য তোমার নাই। তুমি এমন স্থলে শ্রীরাধা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করাইয়া দর্শন কর। তুমি যশোদা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে নবনীত দিতে পার না, তুমি যশোদার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখে ননী দাও। তাহাতেই ব্রজবাসিগণ যে রস আস্বাদ করেন তাহার অংশ পাইবে। আর যে অংশ পাইবে, তোমার পক্ষে সে প্রচুর হইতেও প্রচুরতর হইবে তুমি প্রেমের পাথারে ডুবিয়া যাইবে।" * * *

"ব্রজের নিগূঢ় রস হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে মনে একটী অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন। সে অবস্থা বিশেষ ভাল করিতে সাধন, ভজন ও সময় লাগে।" (১)

* * * * "শ্রীভগবানকে জীবন্ত প্রীতি দ্বারা ভজনা করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি ভজিয়া শিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া মুখে সম্বোধন-করা অতিসহজ কথা কিন্তু তাহাতে রসের উদয় হইবে না। যে পরিমাণে একটী চিত্র প্রস্ফুটিত হয় সেই পরিমাণে উহা চিত্তমুগ্ধকরে। কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন দেখিলে প্রকৃত প্রস্তাবে একটী জীবন্তছবি দেখা হয়। সেই স্ত্রীলোক যদি একটী কুকুরকে কি বিরাটাকার দৈত্যকে বল্লভ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া তাহার

---

(১) আজ কাল এক শ্রেণীর লোক কিন্তু সাধন ভজন করিয়া কিছু বুঝিতে বড়ই নারাজ। তাঁহারা চান আগে ফল তারপর কাজ। এমন দুর্দৈব যে, ইঁহারাই আবার ভগবানের লীলার সমালোচক। এইরূপ সমালোচকের হাতে একবার লেখনী চলিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা একেবারে সব ভুলিয়া যান। তখন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের আজন্ম সাধন-লব্ধ মহা অমূল্য বাক্যাবলিকেও একেবারে রূপক বলিয়া উড়াইয়া দেন। এই যে আজ কাল কোন কোন লেখক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি আলোচনা করিতে যাইয়া অনেকের প্রাণে ব্যাথা দিয়া থাকেন ইঁহারাও এই শ্রেণীর লোক। আমরা বলি, যদি লীলায় বিশ্বাস করিতেই না পার, তবে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করাইবা কেন? যে সকল মহাজনগণ লীলা বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের চরণে মাথা বিকাও, তাঁহাদের কৃপায় সমস্ত অবিশ্বাস দূর হইয়া যাইবে তোমার হৃদয়ে লীলা মূর্ত্তিমন্ত হইয়া দাঁড়াইবে তুমি ধন্য হইবে। (ভক্তিঃ সঃ)

প্রতি ঘৃণায় কি দয়ার উদয় হয়। সেইরূপে যদি কোন জীব নিরাকার ভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে সেটি কি হয়? না, একটি নির্জীব কবিতা বই আর কিছুই নয়। অতএব যদি তুমি স্ত্রীলোক হও, শ্রীভগবান পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি ধরিয়া তোমার সম্মুখে আগমন করেন, আর তুমি তাহাকে পতিত্বে বরণ কর তবেই তুমি তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণনাথ বলিতে পার, তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিবার তোমার অধিকার জন্মে। কিন্তু তুমি যেখানে তাহা পার না, সেখানে শ্রীশ্যামের বামে কিশোরীকে দাঁড় করাও করাইয়া তুমি তাঁহাদের যুগল বিলাসের সহায়তা কর। এই নিমিত্ত ভগবানের মানবলীলা ব্যতীত তাঁহার প্রেমভক্তির ভজন হইতে পারে না। বৌদ্ধ, মুসলমান কি খৃষ্টান ইহাঁরা কিঞ্চিৎ মাত্র লীলা পাইয়াছেন বলিয়া ভক্তির ভজন করিতে পারেন, কিন্তু ব্রজের নিগূঢ়-রস আস্বাদন করিবার মত ভগবৎ লীলা ইহাঁদের কিছু মাত্র নাই।"

বড় সুন্দর—বড় মধুর কথা। শ্রীভগবানের ভজনা জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য কিন্তু সাধারণ জীব না বুঝিয়া ভজন করিতে যাইয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বড়ই বিভ্রাট করিয়া ফেলে। তাই বলি ভাই সাধক! ব্রজবিহারীর দর্শন যদি চাও, তাঁহার পরিকরগণের মধ্যে যিনি যেভাবে তাঁহাকে ভজনা করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশমত বুঝিয়া তাঁহাদের আশ্রয় লইয়া কৃষ্ণভজন কর। নিজে খোঁড়াইয়া বড় হইতে যাইওনা। আচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট পথে তাঁহাদের আচরিত মতে ভজন কর নিজ নিজ মনগড়া মত লইয়া ভজন বিভ্রাট ঘটাইওনা।

শ্রীনটবর গোস্বামী।

পীঠ-দেবতা

নিজে ভেবে ভগবান্ আপনাকে অপমান
কতনা করিছে লোকে জগতে।
আপন স্বরূপ ভুলি কতরঙ্গে ধরি তুলি
ব'সেছে মুরতি নিজ আঁকিতে॥

যাহাতে মানব-ধর্ম্ম,　　যে কুলে মোদের জন্ম
　　এবে, দেবতার আদি—'পীঠ-দেবতা'।
অসীমে সসীমকরে　　রেখেছে হৃদয় জুড়ে
　　বিলাইয়ে স্নেহ প্রীতি মমতা॥
ছোট নহে, বড় এবে—নহে দু'য়ে সমতা॥

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

ঝুলন--রাতে

বাঁশী বেজেছে।—বৃন্দাবনের যমুনা-সৈকতে পরিপূর্ণ আয়োজনের ভিতরে ভক্ত হৃদয় পুলকিত—আলোকিত ক'রে বাঁশী বেজেছে। চারিদিকে যত সুগন্ধ ঝঙ্কার নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে,—বরষার নব অভিসারে পূর্ণ যৌবন সম্পন্না যমুনা রাণীর ভিতরকার স্পন্দন আরম্ভ হ'য়েছে। চাঁদের পরিপূর্ণ আলোকের নীচে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘের নৃত্য চলেছে। এই বিশ্বমনোমুগ্ধকর মহা আয়োজনের ভিতরে ক্ষ্যাপার প্রাণ আজ হটাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল কেন?

ক্রমে তাঁর সুকোমল হৃদয়শতদল অপূর্ব্ব পুলকে প্রভাতারুণ সংস্পর্শে কমল কোরকের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠ্‌ল। যমুনার ওপারে প্রান্তর-প্রান্তস্থিত গাছগুলোর উপর দিয়ে এক খণ্ড কালো মেঘ প্রকাণ্ড দৈত্য সৈন্যের মতো জেগে উঠ্‌ল—এইবার মুহুর্মুহু ভৈরব গর্জ্জনে সেই পল্লী প্রকৃতিকে প্রলয়ের আভাষ জ্ঞাপন ক'রতে লাগল।—পথ নির্জ্জন, জন মানবের সাড়া শব্দ নাই, কুঞ্জবনের লতাগুল্মের উপর দিয়ে শ্রাবণের বারিধারা ঝম্ ঝম্ ক'রে কেবলই পড়ছে। পথ কর্দ্দম, বন্ধুর উপরস্থিত জল কল কল ক'রে কেবলই নাব্‌চে—এই ভরা বাদ্‌লার দিনে ক্ষ্যাপা চলেছে,—ভয় নাই, চেতনা নাই, উদ্বেগ নাই,—আপন মনে ক্ষ্যাপা তার সেই এক সুরে বাঁধা পুরানো গান গেয়েই চলেছে,—গান গাওয়াই যে তার ব্যবসা।

এই মহা প্রলয়ের মাঝখানে ক্ষ্যাপার গান বিশ্ব-সঙ্গীতের সঙ্গে আজ আলিঙ্গন দিচ্ছে,—আজ সে মরণকে বরণ করেই বাঁচবে।

এমনি ভাবে মনুষ্য সমাজের,—অবজ্ঞাত রাস্তার হন্ত কুকুরের মত প্রতারিত

ক্ষ্যাপা আপন মনে চ'লেছে,—কেবল চ'লেছে। আজ তার কেবলি আনন্দ কেবলি পরিপূর্ণতা ;—আজ—

"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ পাথর"

আজ মনের তলায় তার কেবলি জাগ্‌ছে

"ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।" (বিদ্যাপতি)

মানুষের প্রাণের ভিতরে এই যে গভীর শূন্যতা ;—এ শূন্যতা যেদিন প্রাণের সত্যিকার উদ্বোধনের সঙ্গে অনুভূত হবে সেই দিন না মানুষ ক্ষ্যাপার মত ছুট্‌বে—কেবল ছুট্‌বে! সেই দিন না সোণা রূপা ধন সম্পদ ফেলে কেবল রশ পাথরের সাধনা জেগে উঠে সিদ্ধির পথে টেনে নেবে !!

মানুষ সংসারের লালসায় বিলাসে ডুবে ডুবে মনে কচ্ছে এই দৈনন্দিন জীবনে বেশতো পাচ্ছি ;—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, কেবলইতো আমাদের সম্মুখে ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে।—কিন্তু এমন একটা পাওনা আছে যা পাওয়া না গেলে মনে হবে এ জীবনে অনেক পাওনা পাওয়া আর হ'য়ে ওঠে নি।

যে ক্ষ্যাপাকে তোমরা পাগল ব'লে হেলা ক'রেছো, কাঙ্গাল ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছো,—সে আজ এই গভীর নিশীথে'পরশ পাথরের'সন্ধান পেয়েছে। সে আজ তমালের ডাল ধরে ঝুলন খেলায় মেতে গেছে. আজকের রাত তার সম্মুখে আলোময় হ'য়ে হেসে দেখা দিয়েছে—সে আলোর প্রত্যেক ছটায় সে দেখ্‌ছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণময় মোহন ছবিখানি। ব্রজের ধেনুতে বেণুতে, পাখীতে শাখীতে, ময়ুরে ময়ূরীতে, জলে স্থলে সে আজ দেখ্‌ছে তার পরশ পাথর। ক্ষ্যাপা যে শ্রীবৃন্দাবনের পরম সুকণ্ঠ কোকিল আজকে এতদিন পরে, এত যুগ পরে এই ঝুলনের দোল্‌না দোলানোর ছলে তা ধরা পড়েছে।

বাঁশী, সেতো ক্ষ্যাপার কাণে বেজেছে,—অনাদি কাল থেকে সেই বাঁশীর একটানা সুরকে অনুসরণ করাই না ক্ষ্যাপার জীবনের পর জীবন দীর্ঘ ক্ষ্যাপামী ?

জীবনের অনেক পাওনা ছেড়ে সে আজ এই শেষ পাওয়া পেতে হাত পেতেছে,—এই হাত পাতাকেই জীবনের পর জীবন শ্রেষ্ঠ সাধনা ব'লে মেনে নিয়েছে।

আজ তাই তার কেবলি আনন্দ—কেবলি সুখ। একবারের পাওনাতেই তার সমস্ত পাওনা সুদ সমেত আদায় করতে ছুটেচে। এ বড় সুন্দর পাওনা ;

এই শেষ পাওয়া হ'লে পিছনে চেয়ে আর দুঃখ করতে হয় না, সম্মুখে চেয়েও আবার নূতন ক'রে চলতে হয় না।

গোপন ঝুলনের রাতে বাদ্‌লার বিরাট আয়োজনের ভিতর এই যে ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামী এতো শেষ হবে না;—দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, জীবনের পর জীবন এমনি ভাবে ক্ষ্যাপা খুঁজবে। লাভ লোক্‌সান তাকে স্পর্শ করবে না। সে হৃত সর্ব্বস্ব হ'য়ে কেবল খুঁজবে। পরশ পাথর খোঁজাই যাঁর স্বভাব, সে খুঁজবে; লোকের কাছে অবজ্ঞাত হ'য়ে খুঁজবে, পদাহত হ'য়ে খুঁজবে, লাঞ্ছিত হ'য়ে খুঁজবে, অবনত লয়ে খুঁজবে,--খুঁজবেই, এ খোঁজা তার শেষ হবে না।

তমাল-তাল-লতা-বিতানে হৃদয়খানিকে চাষ করতে পারলেই সেই কিশোর কিশোরীর মধুর ঝুলন দোলা দেখা যায়। আবাদ ভাল চাই। কৃষ্ণ সার, কৃষ্ণ বীজ, কৃষ্ণ উপাদান হওয়া চাই,—ক্ষ্যাপার যে আজ তাই হ'য়েছে রে। ওরে হোরা জাগ্‌,—একবার দেখ, ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামী আজ বিশ্ব জগতে অভিনব ব্যাপারের সৃষ্টি ক'রেছে।

ক্ষ্যাপার মতো তন্ময় হও, বিহ্বল হও,—বুঝবে এমন একনিষ্ঠা প্রেমারাধনা সংসার সমুদ্রে আদি অন্ত শূন্য আনন্দের বিরাট অভিযান আর নাই।

হে হতবুদ্ধি সম্পন্ন মানব! যদি একটা বিরাট স্বেচ্ছাকৃত জীবন নিয়ে জীবনে সুখের স্পন্দন না পেয়ে থাকো,—যদি সর্ব্বোতমুখী আত্মাহুতির সেই সুখ-সঙ্গীত না শুনে থাকো তা হ'লে মনে করিও ধন, জন, যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বীয়ান হ'য়েও তুমি কাঙ্গাল, তুমি-অমৃত তত্ত্বের বাইরে দাঁড়িয়ে।

তাই বলছিলেম ক্ষ্যাপা আজ কোন সুরে পাগল হ'য়ে আকাশের পানে নিশি দিন তাকিয়ে থাকে, যে উদাস উন্মাদ দৃষ্টি দেখে মানুষ হাসে।

একবার কি ভেবে দেখেছো, যাচিয়া এ ব্যাথা বুকে নেওয়ার সুখ কি? অর্থ কি? সার্থকতা কি?—অনুভূতির সাম্রাজ্যে যে এ এক অপূর্ব্ব সত্য।

জীবনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষার ভিতরে ও সকল আকাঙ্ক্ষার ভিতরে চরম প্রাপ্তির কল্পনাটি একবার স্পষ্ট হ'য়ে আবার মিশিয়ে যে যায়—সেইটা থেকেই ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামীর সুরু হ'তে থাকে, এই আকাঙ্ক্ষার যে অভিনব সপ্ন তাই তো ক্ষ্যাপার পরশ পাথরের স্পর্শ।

জীবনে একবার ক'রে সবার একটা শুভ মুহূর্ত্ত আসে, যে মুহূর্ত্তে এই হারাণো পরশ পাথর লাভের জন্য মনের তলায় আন্দোলন চলে; সে চরম মুহূর্ত্তকে ধ'রে রাখতে পারলে সমস্ত দেনা পাওনা, লাভ লোক্‌সানের

নিমেষে মীমাংসা হ'য়ে যায়। সেটিকে ছেড়ে জীবনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে সেই সপ্নময় শুভ কামনাটি একেবারে ভরিয়ে দি। তারপর সকল খোঁজা শেষ করে বসে থাকি। কিন্তু ক্ষ্যাপার তো তা নয় সে খুঁজবে, রথচক্রের পরতে পরতে, ঝুলন দোলার আশে পাশে, রাসের রাতে তমাল তলে, ফাগের দিনে আম্রবনে সে জীবনের পর জীবন খুঁজবে; মানুষের স্তুতি নিন্দা তাকে স্পর্শ করবে না। ক্ষ্যাপার এই বিরাট ক্ষ্যাপামী ভাবের রং দিয়ে ভাষার সৌন্দর্য্য দিয়ে প্রকাশ করি এমন শক্তি আমাতে নেই। তবে ক্ষ্যাপার যদি গান গেয়ে সুখ থাকে, বাঁশী বাজিয়ে আনন্দ হয়, ধেনুচড়ায়ে ভাব জাগে,—আমারও তা হ'লে বিশ্বের সম্মুখে তার এই বিরাট ক্ষ্যাপামীকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াসে আনন্দ আছে।—তাই বলছিলাম ঝুলন দোলায় বাতাস লেগেছে, বাঁশী বেজেছে, ক্ষ্যাপার গোপন অভিসার সফল হ'য়ে ঝুলন-রাত আনন্দময় হ'য়ে উঠেছে।'

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য *

যেমন "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" তেমনই জগতে যাহা কিছু আছে সকলই বৈষ্ণব। বিষ্ণুই কর্ত্তা, আবার বিষ্ণুই কর্ম্ম—তিনি নিজেই নিজের লীলার জন্য অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত সম্বন্ধেতে নিত্যই নিজেতে বর্ত্তমান। এই তত্ত্বদৃষ্টিতে সকলই বিষ্ণু, আর সকলই বৈষ্ণব।

আবার মহাজন বাক্য আছে যে "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" যখন সকলই বৈষ্ণব তখন আবার বৈষ্ণব চিনিতে পারা এত দুরূহ কেন? তাহার উত্তর এই যে, যখন সকলই বিষ্ণু তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া এত কঠিন ব্যাপার কেন? এক প্রশ্নের উত্তরে আর একটি প্রশ্ন করা ন্যায় সঙ্গত

---

* এই প্রবন্ধটী বৈষ্ণব-সাপ্তাহিক "শ্রীকৃষ্ণ" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, এসম্বন্ধে আমাদের দু' একটী কথা বলিবার আছে, কিন্তু পাঠকগণ প্রবন্ধটী পড়িয়া নিজ নিজ মন্তব্য জানাইলে শেষে আমরা আমাদিগের বক্তব্য বলিব। [ভঃ সঃ]

নহে। কিন্তু এ স্থলে এই প্রকার উত্তরে বুঝাইতেছে যে, উভয় প্রশ্নের উত্তরই এক। একটি বুঝিলেই আর একটি বুঝা যাইবে।

শাস্ত্র বলেন, জীব বিষ্ণুমায়া জন্য অকাল বশতঃ দ্বৈত ভ্রমে পতিত হয়। এই ব্যাপারটি দিব্য-দৃষ্টিতে ভগবল্লীলা হইলেও জীব-দৃষ্টিতে বন্ধনের কারণ। অতএব জীব যতদিন দিব্য-দৃষ্টি না পায় ততদিন এই বন্ধনের মূল যে অজ্ঞানতা তাহার মূলোচ্ছেদের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা যে কি, তাহা ভগবান নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" অর্থাৎ জীব শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিলেই মায়া হইতে নিষ্কৃতি পায়।

ভগবানকে আশ্রয় কর' জিনিষটি মুখে যত সহজ বলা যায় কাজে কিন্তু বড়ই গুরুতর। "প্রভু আমি তোমার; প্রভু সকলই তোমার" এই তো হইল আশ্রিতের বাণী। কিন্তু এই আশ্রিতের ভাবটি বড়ই ভাবিবার বস্তু। মুখে প্রতি কথায় কথায় "যা কর প্রভু" "প্রভুর ইচ্ছা" ইত্যাদি বলা দুই চারিদিন অভ্যাস সাপেক্ষ্য। বৈষ্ণবের পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে শ্রীহরি বিদেহ রাজকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মাত্র দুই একটি কথা এইস্থানে উল্লেখ করিতেছি।

> ন যস্য স্বপর ইতি বিত্তেষাত্মনি বা ভিদা।
> সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ভাঃ ১১ ২।৫

যিনি ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার ভেদদৃষ্টি দূর হইয়াছে, তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি করেন এবং সদা শান্তভাবে অবস্থিত। এই যে তাঁহার হৃদয়ের ভাব তাহা তাঁহার বাহ্য ব্যবহারে জানিতে পারা যায়। তাঁহার নিজের কোনও ধন সম্পত্তি বলিয়া বস্তু থাকে না। যদিও বা তাঁহার নিকট কোনও ধনাদি আসে তাহা ব্যবহার করিতে সকলেরই অধিকার। তাঁহার অনুমতির প্রয়োজন হয় না—কারণ তাহাতে তাঁহার স্বামীত্বের অভাব। ইহা অপেক্ষা আরও কঠিন তাঁহার একটি ব্যবহার আছে—সেটি হইতেছে এই যে, তাঁহার নিজের দেহেতেও কোন স্বামীত্ব নাই; পরের দেহ আর নিজের দেহ উভয়ের প্রতিই তাঁহার সমান দৃষ্টি—আমাদের ন্যায় "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই মন্ত্রের উপাসনার কথা তাঁহার মনের কোণেও স্থান পায় না। বৈষ্ণবের বাহ্য লক্ষণ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। তবে তাঁহার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তর্লক্ষণ আছে তাহা কেবল গোবিন্দই জানেন, আর জানেন সেই গোবিন্দপ্রিয়। সেই কথাটি শ্রীহরি বলিতেছেন—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ-
হরিরবশাদভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়াধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ॥ ভাঃ ১১।২।৫৫

হাঁচিবার সময় বা হাই তুলিবার সময় অবশভাবে যে হরির নাম মাত্র মুখে উচ্চারিত হইলেই জীবের সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া যায়, সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরির পাদ-পদ্মকে প্রেমডোরে বাঁধিয়া বৈষ্ণব আপনার হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছেন, আবার সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি, ভক্তের প্রেমে বিভোর হইয়া নিজে কখনও বৈষ্ণবের হৃদয় ছাড়িয়া যান না। উভয়ে উভয়ের প্রেমে বাঁধা।

এখন এই বৈষ্ণবকে কে চিনিতে পারে, আর যিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার স্থান কোথায়? ব্রাহ্মণের সহিত এমন কি ব্রহ্মারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না—কারণ সেখানে প্রাকৃত ভাব আছে। বৈষ্ণব শ্রীহরির প্রাণধন।

ভাই সকল সাবধান। এই বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক রাজ্যের মধ্যে লইয়া আসিও না—তাহা হইলে মহা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। আমাদের সনাতন হিন্দু সমাজের মধ্যে বৈষ্ণব বলিয়া কোনও বিশেষ জাতির স্থান হইতে পারে না—বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি অশাস্ত্রীয়—একটি মহা অপরাধ। ইংরাজী ভাষায় বলিতে গেলে বৈষ্ণব Transcendental অর্থাৎ অপ্রাকৃত সর্ব্বপ্রকার জড় সম্বন্ধের পারস্থিত।

(শ্রীকৃষ্ণ)

পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা।

(শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী লিখিত)

বৈষ্ণব-নিন্দা বা সাধু-নিন্দা ত পরের কথা,—পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা যে কত বড় মহাপাপ, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী হইতেই সজ্জন বৈষ্ণবগণ বুঝিয়া লউন।

"বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌর ধাম।
অনিন্দুক হইয়া সবে লহ কৃষ্ণনাম॥
অনিন্দুক হইয়া যে সকৃৎ কৃষ্ণ বোলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার পুনরায় বলিতেছেন,—

"সবারে করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক দুরাচার॥"

পুনঃ — "নিন্দা নাই নিত্যানন্দ সেবকের মুখে।
অহর্নিশ নিত্যানন্দ যশ গায় সুখে॥"

পরচর্চ্চা বা পরনিন্দার মত পাপ আর নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই জন্য বিশেষ ভাবে এই পাপের বিষয় উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। জগাই মাধাই না করিয়াছিল এমন পাপ নাই,—কিন্তু তাহারা পরনিন্দা মহাপাপে লিপ্ত ছিল না, এই জন্য করুণাময় প্রভু আমার তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে,—

"সর্ব্ব পাপ এই দুয়ের শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার উপদেশ দিয়াছেন,—

"মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পর চর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥"

অতএব পর-চর্চ্চা মহাপাপ। সর্ব্ববিধ পাপ কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে, কিন্তু পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই মহাপাপের এমনি প্রভাব যে, ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সাধু নিন্দা, বৈষ্ণব নিন্দা এমন কি গুরু-নিন্দা এবং ঈশ্বর-নিন্দা পর্য্যন্ত পৌছিয়া থাকে। রামচন্দ্র পুরী গোসাঞি এই পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা পাপে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার পরম পূজ্য গুরুদেব শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞি কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দোষ দর্শন করিয়া তিনি নীলাচল ধামের তাৎকালিক বৈষ্ণব সমাজে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের পাঠকবর্গ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। রামচন্দ্র পুরী গোসাঞি তাঁহার গুরুদেবের দোষ দর্শন করিয়া

তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর মন্দিরে পিপীলিকা শ্রেণী দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই স্থানে মিষ্টান্ন প্রভৃতি রক্ষিত হয় সেই জন্য এত পিপীলিকা আসে, বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর এত ভোগ লালসা কেন?" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলেন—

"প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র নাহি বুলে কাহো ছিদ্র না পাইল॥"

কোন রূপ ছিদ্র না পাইয়া এইরূপ অনুমান করিয়া রামচন্দ্র পুরীগোসাঞি প্রভুর এই নিন্দা বাদ করিলেন। মনুষ্যের নিন্দুক স্বভাব হইলে, সর্ব্বলোকের দোষ দর্শনে আগ্রহ হইলে এই দোষ দর্শন প্রবৃত্তি এত বৃদ্ধি হয় যে, তাহা ঈশ্বরের দোষ দর্শনেও কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ ও আদেশ,—

"অনিন্দুক হইয়া যে সকৃত কৃষ্ণ বোলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥"

রামচন্দ্র পুরী গোসাঞির মত বিশ্বনিন্দুককেও প্রভু আমার সম্মান করিয়া জীব জগতকে দেখাইলেন বিশ্বনিন্দুকেরও নিন্দা করিতে নাই। প্রভুর নীলাচলের ভক্তগণ পরমানন্দ পুরী গোসাঞি প্রমুখ মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে রামচন্দ্র পুরী গোসাঞির কার্য্যের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রভুকে বুঝাইয়া বলিলেন এই বিশ্বনিন্দুকের কথা শুনিয়া তাহার আহার সঙ্কোচ করা যুক্তি সঙ্গত কাজ নহে। ইহার উত্তরে অদোষদরশী প্রভু আমার কি বলিলেন শুনুন,—

"প্রভু কহে সবে কেন, প্রভুকে কর রোষ।
সহজধর্ম্ম কহে তিঁহো তাঁর কিবা দোষ॥"

এক্ষণে প্রভুর আচরণ দেখিয়া ও শ্রীমুখের উপদেশ বাণী শুনিয়া পরনিন্দা বা দোষদর্শনের প্রবৃত্তি যদি নিবৃত্তি না হয় তবে আপনাকে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বলিয়া পরিচয় না দেওয়াই ভাল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

"করুণা সাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয়।"

সাধু বৈষ্ণবের নিন্দাবাদের নাম বৈষ্ণবাপরাধ। এই বৈষ্ণবাপরাধ বড় পাপ। শ্রীভগবানও এই মহাপাপ হইতে জীবগণকে মুক্ত করিতে পারেন না।

যাঁহার নিকট এই অপরাধ অর্জ্জিত হয়, তিনিই ইহা ভঞ্জন করিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন;—

"প্রভুবোলে" উপদেশ করিতে না পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥"

পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা হইতেই সাধুরনিন্দা বা বৈষ্ণবনিন্দা উদ্ভূত হয়। অতএব সকলেরই পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা মহাপাপ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
ভক্তি বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর॥
বৈষ্ণবের ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণ কৃপা হইলেও তার প্রেম বাধ॥"

এই যে মহাপাপ, বৈষ্ণবাপরাধ,—যাহার তুল্য পাপ জগতে আর নাই, ইহার মূলে পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্ব জীবকে সাবধান করিয়াছিলেন "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।"

পরনিন্দা হইতে উদ্ভূত যে সাধু-বৈষ্ণব-নিন্দা, অর্থাৎ বৈষ্ণবাপরাধ, শাস্ত্রে তাহার প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা,—

হন্তি নিন্দতি বিদ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে দর্শনে হর্ষং ন যাতি পতনানি ষট্॥

অর্থাৎ এই ছয় প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ;—(১) বৈষ্ণবকে প্রহার করা, (২) নিন্দা করা, (৩) বিদ্বেষ করা (৪) অভিনন্দন না করা (৫) ক্রোধ করা, (৬) বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দিত না হওয়া।

এই সকল অপরাধগুলি প্রথমতঃ সাধারণ জীবদিগের প্রতি অনুষ্ঠিত হয়, এবং ক্রমে অপরাধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাধু বৈষ্ণবের প্রতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ হইতেই জীব ভগবত বহির্ম্মুখ হয়, সাধু বৈষ্ণবের কৃপায়, গুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় যদি এই বিষম অপরাধ ভঞ্জন হয়, তখন শ্রীভগবান প্রকৃত অনুতপ্ত বৈষ্ণবাপরাধীর প্রতি কৃপা কটাক্ষ করেন। প্রকৃত ভজন নিষ্ঠ বৈষ্ণব কাহারও নিন্দা করেন না,—যদি নিন্দা করিতে হয়, তবে আত্ম-নিন্দা করেন, আত্মদোষ দর্শন করেন, কীর্ত্তন করেন, ইহাতে আত্মগ্লানি দূর হয়, মন নির্ম্মল হয়, হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়। বৈষ্ণবের আত্ম-নিবেদনে আত্ম-নিন্দা, ও আত্মগ্লানির বহু পরিচয় পাওয়া যায়। পরম দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"পাতকীর ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
মুঞি পাতকী হেন আইনু হেথায়॥" চৈঃ ভাঃ

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মুঞি পুরীষের কীট। নাম-ব্রহ্মাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন "মুঞি অস্পৃশ্য কুকুর।"

অতএব পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা করা বৈষ্ণবের কার্য্য নহে। ভজন-নিষ্ঠ বৈষ্ণব কখন ভুলিয়াও এই পাপে লিপ্ত হন না। স্বপ্নেও মনে এভাব আনেন না। যাঁহাদের ভজন সাধন নাই, তাঁহাদেরই এই কার্য্য। একবার যাঁহারা এই পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ইহা হইতে বিরত হওয়া বড় কঠিন।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস-প্রসঙ্গ (১২)

(শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের স্মৃতি)

নবদ্বীপ দাদা শ্রীবৃন্দাবনে চলে গেলে সকলেরই প্রাণে মহা দুঃখ হলো। সকলেই তাঁর সঙ্গ-সুখের অভাব বোধ করতে লাগলেন। পুলীন দাদাদের বাড়ীতে নবদ্বীপ দাদার স্থাপিত হরিসভায় এই সময়ে খুব কীর্ত্তন হতো, এবং সকলে মিলে দাদার বিষয় আলোচনা করতেন।

দাদার সঙ্গে যতবার দেখা হতো ততবারই বলতেন "আবার দেখা হবে। শ্রীবৃন্দাবন যাবার পূর্ব্বেও ব'লেছিলেন আবার দেখা হবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেখাতো হয় নাই, আর দাদার কথা মিথ্যা ব'লেও মনে কর'ত পারি না। শুধু যে আমাকে বলেছিলেন তা নয় অনেককে ঐকথা বলেছিলেন।

এর পরে বাবাজী মহাশয়কে তিন চার স্থানে দর্শন করে ছিলুম। সেই কথাগুলিই সংক্ষেপে এই স্থানে ব'লে পরে দাদার কথা বলবো। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপর 'ভারত সঙ্গীত সমাজের' উত্তর দিকের ঘর আমাদের একটী দোকান ছিল একদিন ঐ দোকানে বসে আছি এমন সময়ে একটী গাড়ীর ছাদ থেকে পুলীনদাদা চেঁচিয়ে আমাকে বল্লেন;—অমূল্য! বাবাজী মহাশয় যাচ্ছেন। আমি গাড়ীর ভিতরে চেয়ে দেখি বাবাজী মহাশয় বসে রয়েছেন। তাই দোকান হ'তে লাফিয়ে পড়ে ছুটে ছুটে গাড়ীর কাছে গেলাম। বাবাজী

মহাশয় আমাকে দেখে গাড়ী থামাতে বল্লেন। আমি কাছে যেতে বল্লেন,—"এমন ক'রে ছুট্‌তে হয়, যদি পড়ে যেতিস?" আমি তাঁর চরণধুলা গ্রহণ করাতে তিনি হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ জানালেন। রাস্তার মাঝে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিলো, অন্য গাড়ী সব যেতে পারবে না, তাই গাড়োয়ান গাড়ী ছেড়ে দিলে। পুলীন দাদা ছাদের উপর হ'তে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো। সে হাসির অর্থ অন্য একস্থানে বলবার চেষ্টা ক'রবো।

এর পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের উৎসবে (অর্থাৎ ১৯০৮ জানুয়ারী মাসে) বাবাজী মহাশয়কে একদিন কীর্ত্তন কর্ত্তে দেখেছিনু। নাটমন্দিরে লোক ভরে গেছে, তিনি মাঝখানে বসে শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন কচ্চেন,—আর আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই চোকের জলে বুক ভাসিয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে শুনচেন, বাবাজী মহাশয়ের চেহারা লাল হ'য়ে উঠেছে, চোক দু'টি যেন জবা ফুল।

এর পরে তিনি আমাদের গ্রামের নিকটে আগড়পাড়ার বড় রাস্তার ধারে দেওয়ানী দত্তের বা প্রিয় দত্তের বাগান বাড়ীতে (সাগর দত্তের হাঁসপাতালের ঠিক উত্তর দিকের বাগান বাটী) এবং কামারহাটীর গঙ্গার ধারে গোবিন্দ দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে (যে ঠাকুরবাড়ীতে রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের বর্ণিত পরম ভক্তিমতী "গোপালের মা" থাকতেন সেই ঠাকুরবাড়ীতে) কতদিন ছিলেন।

ঐ সময়ে তিনি কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে প্রায়ই রাস্তায় বেরুতেন। সে কীর্ত্তনের মধুর স্মৃতি এ অঞ্চলের অনেক লোকের প্রাণে এখনও জাগরুক আছে। ঐ সময়ে এ অঞ্চলের অনেককে তিনি আত্মসাৎ ক'রেছিলেন। একটী ব্রাহ্মণ বালক বাবাজী মহাশয়ের স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হ'য়েছিলো। কীর্ত্তনের দা পাঠের সময়ে ঐ বালকের প্রেমাশ্রু বর্ষণ দেখে আমরা আশ্চর্য্য হ'তাম। বালক এক্ষণে যুবক হ'য়েছে, আফিসে চাকুরী করে, নাম শ্রীভূপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়। বাড়ী আগড়পাড়ার দক্ষিণ অংশে। সংসারের আবর্ত্ত মধ্যে পড়লেও পরশমনির গুণ এখনও উহাতে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ত্তমান আছে।

ইহার পূজ্যপাদ পিতৃদেবও বাবাজী মহাশয়ের কৃপা লাভ ক'রেছিলেন। কয়েক বৎসর হলো তিনি স্বর্গীয় হ'য়েছেন। নাম ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। বাবাজী মহাশয় প্রিয় বাবু ও ভূপেনকে বড়ই স্নেহ ক'রতেন। একদিন

দোয়ারী দত্তের বাগানের উপরের ঘরে বাবাজী মহাশয় আসনে বসে আছেন আর বালক ভূপেন গ্রন্থপাঠ ক'রচে, ভূপেনও কাঁদচে, বাবাজী মহাশয়ও কাঁদচেন, এদৃশ্য বড়ই মধুর।

একদিন কামারহাটীর উক্ত গোবিন্দ দত্তের ঠাকুর বাড়ী হ'তে বাবাজী মহাশয় বিরাট সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় নিয়ে নগর ভ্রমণে বাহির হ'য়েছিলেন। কামারহাটী ও আগড়পাড়া হ'য়ে, বড় রাস্তা (গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড) দিয়ে পানিহাটীর মোল্লার হাটে কালীচরণ চন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে আগমন করেন। কীর্ত্তনকারী এবং দর্শকে বড রাস্তা ভরে গিয়েছিলো। বাবাজী মহাশয় যেন আনন্দ ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিলেন।

ঐ সময়ে একটী ভদ্র যুবক কীর্ত্তনের পিছু পিছু যাচ্ছিলেন, বাবাজী মহাশয় মধ্যস্থলে কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে হঠাৎ পেছনে এসে সেই যুবককে ধরে একবার নৃত্য করিয়ে দেন পরে সেই যুবকের কি যে হলো, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আনন্দ বেগে খানিকক্ষণ নৃত্য ক'রেছিলেন। একটী চাকাকে একবার ঘুরিয়ে দিলে চাকাটী যেমন আপনা আপনি কিছুক্ষণ ঘুরে এও সেই-রূপ। এই যুবকের তখন বৈষ্ণবদের উপর ভাল ভাব ছিল না, কীর্ত্তনকে তিনি "বুঝ্‌তাবুঝঃ" বলে উপহাস ক'রতেন। বহুপরে স্পর্শমণির গুণ এমন ভাবে ঐ যুবকের উপর বর্ত্তেছে যে, এখন যুবককে দেখলে মনে পবিত্র ভব আসে। নাম প্রকাশ ক'রতে নিষেধ করায় নাম দিলাম না।

কামারহাটীতে বাবাজী মহাশয়ের আর একটী ভক্ত আছেন, লোকে তাকে পাগল বলেই অভিহিত করে। নাম শ্রীশশিভূষণ খাঁ। (রেল আফিসে চাকুরী করেন) এই ভক্তটি কীর্ত্তন এবং "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" পেলে আর কিছু চান না। বিশেষ চরিত্রবান।

ঐ সময়ে পানিহাটীর ঘোষপাড়ার অৰ্দ্ধচন্দ্র দাস ঘোষ ব'লে একটী ছোক্‌রা বাবাজী মহাশয়ের কাছে যেতো। অৰ্দ্ধচন্দ্র যখন কলিকাতায় কলেজে পড়বার জন্য রেলে যাতায়াত ক'রতো তখন গাড়ীর মধ্যেতেই "তারা" "তারা" বলে চেঁচাতো, গ্রামেতেও ঐরূপ করতে দেখতুম। আমরা কীর্ত্তন করতুম দেখে আমাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে বুঝতে আসতো; "ওসব কিছু নয়।" পরে ঐ বাগানবাড়ীতে বাবাজী মহাশয়ের নিকট দু'চার দিন গিয়ে তার কি যে হলো সে "তারা" "তারা" বুলি ছেড়ে "গৌর গৌর"

ব'লে কাঁদতে লাগলো। সে বুলি এখনো তার থামেনি অধিকন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তেই দেখতে পাই। (১)

শ্রীপাট খড়দহের কতকগুলি ব্রাহ্মণকুমার ঐসময়ে বাবাজী মহাশয়ের কৃপালাভ করেন। তাঁহাদের জীবন ত্যাগে পরিপূর্ণ।

এইরূপে এতদঞ্চলে থাকা কালীন "পরম-রতন" বাবাজী মহাশয় কত লোককে যে "সোণা" ক'রে দিয়েছিলেন তার আর ইয়ত্তা নেই।

বাবাজী মহাশয়ের কৃপা দেবতার মেঘের মত সকল স্থানেই বর্ষণ হতো। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, মুসলমান এমন কি মেথর পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। পুলীনদাদার মুখে শুনেছিনু—

৺পুরীধাম হ'তে আস্‌বার সময়ে হাবড়ার ষ্টেশনে নেমে বাবাজী মহাশয় যখন ষ্টেশনের পায়খানায় শৌচে যান, সেই সময়ে ঐস্থানের মেথর, বাবাজী মহাশয়ের কাছে বক্‌শিসের জন্য হাত পাতিলে, বাবাজী মহাশয়ের একটি ভক্তকে (যিনি জলপাত্র নিয়ে সঙ্গে গিয়েছিলেন তাকে) কিছু দিবার জন্য আদেশ করেন। ভক্তটির নিকটে খুচরা কিছু ছিল না সবই টাকা ছিল, এজন্য কি দিবে বলিয়া ভাব্‌তে ছিলেন বাবাজী মহাশয় তাই দেখিয়া ভক্তটিকে ধমক দিয়া বল্লেন "দেরী ক'রচো কেন? টাকাই ওকে দাওনা। তাই তিনি মেথরকে একটি টাকা দিয়ে দিলেন।

এক পয়সার প্রার্থী মেথরটি একেবারে একটি টাকা পেয়ে এবং বাবাজী মহাশয়ের চেহারা ও বৈরাগীর বেশ দেখে তার প্রাণে যেন কি ভাব হ'লো তাই সে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ আর না ছেড়ে বরাবর গঙ্গার ঘাটে এলো বাবাজী মহাশয় স্নান ক'রতে ক'রতে মেথরটিকে দেখতে পেলেন ও অন্তর্যামী তার মনের ভাব বুঝে গঙ্গা হ'তে ছুটে এসে মেথরকে বুকে ক'রে জড়িয়ে ধরে, তার কর্ণে ভবব্যাধির মহৌষধি ঢেলে দিলেন, মেথরটি তখন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে গাইতে লাগলো।—

---

(১) এই অর্দ্ধ বাবুদের বাড়ীতেই পূজ্যপাদ অবধুত জ্ঞানানন্দ স্বামীর জন্ম হয়। জ্ঞানানন্দ স্বামী অর্দ্ধ বাবুদের বংশের দৌহিত্র সন্তান। স্বামীজীর জন্ম ভিটা এখনও পানিহাটীর ঘোষ পাড়ায় আছে। ঐ স্থানে একটী স্মৃতি চিহ্ন ক'রবার জন্য তাঁর ভক্তমণ্ডলী একবার উদ্যোগী হ'য়ে ছিলেন। কিন্তু কিছুই হয় নাই।

স্বামীজী এবং আমাদের বাবাজী মহাশয়ের নবদ্বীপে মিলন সংবাদ "চরিতসুধা" গ্রন্থে প্রকাশিত হ'য়েছে, সে গুলি বড়ই মধুর। লেখক।

"নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
হরেকৃষ্ণ হরে রাম ॥"

চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগলো। সকলে অবাক হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। কিন্তু হায়!—

"সো চরণাম্বুজে মতি নাহি হোয়ল।"

গোবিন্দ দত্তের গঙ্গারধারের ঠাকুর বাড়ীতে বাবাজীমহাশয়ের থাকবার সময় গঙ্গাতে একটী ঘটনার কথা শুনি।—

পানিহাটীর ধারে ধারে বিস্তর জেলে মালাদের বাস। এরা বর্ষাকালে দিনরাত্র গঙ্গাতে নৌকা ক'রে ইলিশমাছ ধরে। পানিহাটীর তুলসীচরণ মালা ও আরও ২।১ জন আমাদের বিশেষ পরিচিত মালা আমাদের বলে;—

"আমরা রাত্রে নৌকা ক'রে যখন মাছধরিতে যাব তখন কামারহাটীর কাছে ২।৩ দিন ধ'রে দেখেছিনু—"একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক গঙ্গার জলে আসন পিড়ি হ'য়ে বসে "হা নিতাই" "হা নিতাই" বলতে বলতে গভীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। আমরা ব্যাপার কি জানবার জন্যে নৌকা বেয়ে যতই কাছে যাবার চেষ্টা করি তিনিও দেখি ততই দূরে চলে যান। শেষে কাছে আর যেতে পারলুম না। উপদেবতা ব'লে আমাদের ভয় হ'লো, তাই আর কিছু জানবার চেষ্টা করলুম না।"

জেলেদের নিদ্রাহীন মস্তিষ্কপ্রসূত ভুলদৃশ্য বা গঞ্জিকাদি সেবন জনিত প্রলাপোক্তি কি না ইত্যাদি বুঝিবার জন্য আমরা উহাদের বিশেষ ভাবেই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়াছিলাম।

তারপরে একদিন ললিতাদিদির নিকট ঐ কথা উত্থাপন করায় তিনি বলিলেন, "জলেতে ঐরূপ থাকিতে বাবাজী মহাশয় খুব পারিতেন।"

এতেই মনে হয়—জেলেদের বর্ণিত যিনি; তিনি বাবাজী মহাশয় ভিন্ন আর কেহই নয়।

৬৯নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে পুলীনদাদা একটী বড়বাড়ী ভাড়া ক'রে আশ্রম করেন। ঐ বাড়ীতে বাবাজী মহাশয় কিছুদিন ছিলেন।

তারপরে তাঁকে রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর বিশেষ আগ্রহ ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ে যান ব'লে শুনি।

শ্রীবৃন্দাবনগমন ও তথায় অবস্থিতি কালীন যেসকল ঘটনা হ'য়েছিলো তা পুলীনদাদা ও মেঘনাথদাদা প্রভৃতির মুখে শুনেছিনু, সে সব কাহিনী বোধহয় "চরিত সুধা" পুস্তকে কোন ভক্ত প্রকাশ করবেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

আলোচনা

(৩) অস্পৃশ্যতা দোষ বর্জ্জন)

আজকাল অস্পৃশ্যতাদোষ দূরীকরণ-জন্ম অনেকেরই চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য নব্য শিক্ষিতাভিমানী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকস্থলে অন্তকোনরূপে হউক বা না হউক, একসঙ্গে গিয়া আহারটা বিশেষতঃ হোটেলে বা 'চা'খানায় খুবই চলিয়াছে, তাঁহারা বোধহয় ইহাকেই চরম মনে করেন। আমাদের কিন্তু তাহা মনেহয় না। সকলের মূলে ভগবৎ সম্বন্ধ থাকা দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় অনেক ব্যাপার পূর্ব্বে ঘটিয়াছে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ভগবৎ গুণানুবাদ কীর্ত্তনে জাতিবিচার ছিল না, এখনও যে অনেকস্থলে তাহা নাই মধ্যে মধ্যে তাহারও সংবাদ পাওয়া যায়। সম্প্রতি 'পল্লীবাসী' নামক বৈষ্ণব সাপ্তাহিক পত্রে হিন্দু-মুসলমানের একত্রে শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-শ্রবণাদির বিষয়ে একটী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণের অবগতিরজন্য আমরা পল্লীবাসী হইতে সেটী অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিলাম—

"বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার তারিখে স্থল গোয়াইলবাড়ী গ্রামে মুসলমানের হরি সংকীর্ত্তন-দর্শন ও শ্রবণ জন্ম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলাম। মুসলমান খোল করতাল সহ হরিসংকীর্ত্তন করে, কথাটা লোক মুখে শুনিয়া আশ্চর্য্যজনক বোধে তথায় যাই। বিকালে স্থল গ্রামের নিকটবর্ত্তী ঠুঁঠাপাচিল প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের ৩০।৪০ জন মুসলমান খোল করতাল সংযোগে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেরাম জয় হরেরাম জয় ... ... প্রভৃতি নাম গান করিতে করিতে স্থল গোয়াইলবাড়ী গ্রামে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ উঠিয়া সংকীর্ত্তনের সম্মুখে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মণ্ডপ সম্মুখ নাটমন্দিরে কিয়ৎকাল গান করিবার পর মুসলমানগণের অনেকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর পাবনা জেলার স্থল শাখার সাপ্তাহিক উৎসবের ভাগবত পাঠে যোগদান করিলেন।

তুলসী বৃক্ষ সম্মুখে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণ জন্য ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের এক নাটমন্দির তলে এবং একাসনে উপবেশন দেখা গেল।

ইহাতে অনেক বিশেষত্ব আছে বলিয়াই বোধ হয়; কারণ সচরাচর আমাদের দেশে পুরাণাদি পাঠ ও কথকতা উপলক্ষে দেখা যায়, ব্রাহ্মণাদির জন্য হিন্দুর জন্য অন্যান্য জাতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু এখানে মুসলমান ও ব্রাহ্মণ একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাগবত পাঠ শুনিতেছেন। তৎপর সংকীর্ত্তন, পদ—গান ও সর্ব্বশেষে হরিরলুট হইল; হিন্দুমুসলমান উভয়ে একসঙ্গে গ্রহণ করিলেন এবং বিদায় গ্রহণ কালে মুসলমানগণ ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত কোলাকুলি ও পরস্পর আলিঙ্গন করতঃ প্রস্থান করিলেন।

শুনা গেল, পাবনা জেলার সাহাজাদপুর থানার অন্তর্গত ঠুঠাপাচিল, মাকরা, হোড়দীঘলিয়া, দামুয়াপাড়া, যুসধোলা প্রভৃতি ৫।৭ খানি গ্রামের মুসলমান আনুমানিক ৬, ৭ শত ঘর সকলেই ঢাকা—মাণিকগঞ্জের অধীন ফুকরহাটির সা জালাল্‌উদ্দিন আহম্মদ নামক জনৈক মুসলমান গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তদফলে মুসলমানগণ অনেক দিন মাংস বর্জ্জন করতঃ নামাজাদি করে না, কিন্তু গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে এবং হিন্দুর ন্যায় সংকীর্ত্তন করে। প্রায় ৭।৮ বৎসর হইল এই জেলায়ও উক্ত মত প্রচার হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত গ্রামসমূহের মুসলমানগণ হরি সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় দুই বৎসর হইল স্থল গোয়াইল-বাড়ী গ্রামের পাকড়াশী বাবুদের সহিত হরিবাসরে যোগদান করিয়াছেন। ইহাঁরা ইদুজ্জোহা ও ইদলফেতর প্রভৃতি পর্ব্বদিনে অষ্ট প্রহর সংকীর্ত্তন করে এবং স্বগ্রামে স্থলের বাবুদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তাঁহারাও সানন্দে তাহাতে যোগদান করিতেছেন।

উল্লিখিত মুসলমানগণের সংকীর্ত্তন শুনিতে কোন অংশে হিন্দুর সংকীর্ত্তন অপেক্ষা হীন নহে, বরং ভাব ও আবেগপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইল, তবে গানের স্থলবিশেষে উচ্চারণের কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে। ইহার মধ্যে কয়েক-জন মোল্লাও আছেন, কাহারও লম্বা দাড়ী ও বাউলের ন্যায় সুদীর্ঘ কেশ দেখা গেল। শুনিলাম, ইহারা কোরবানী একেবারে বন্ধ করিয়াছেন, মাংসও অনেকে খায় না, তবে অনেকে মাছ খায়। অপর একটি বিশেষত্ব দেখা গেল যে, আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানগণের সহ একত্র বসিলে কথাবার্ত্তায় এক প্রকার ঘ্রাণ অনুভূত হয়, ইহাদের গান ও একত্রে উপ-বেশনে সেরূপ কোন বিশেষত্ব উপলব্ধি হইল না। বোধ হয় মাংসাদি বর্জ্জন ও খাদ্যাদির পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ।

শুনা গেল মুসলমানগণ সমাজের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ঈদৃশ হিন্দু আচারে যোগদান করতঃ ইতিপূর্ব্বে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং সাহাজাদপুরে এই উপলক্ষে কোন সময়ে নানাপ্রকারে মুসলমানদিগের মধ্যে মোকর্দ্দমাও উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি মুসলমানগণ হরিসঙ্কীর্ত্তন ছাড়ে নাই, বরং ঈদৃশ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। একজন মুসলমান নির্য্যাতন ভোগ করিয়া তাড়াস জমীদারের চালুহারা কাছারীতে নালিশ করিলে রায় বাহাদুরের ষ্টেট হইতে তাহার রক্ষাকল্পে সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। পক্ষান্তর পাবনা জেলা মধ্যে স্থল নওহাটা সমাজ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কুলীনের শীর্ষস্থানীয়। তথাকার ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার এখানকার পাকড়াশী বাবুগণ জেলার মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত জমিদার; তাঁহাদের পক্ষে সাধারণ মুসলমানগণ সহ মিলিয়া মিশিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন ও একাসনে বসিয়া ভাগবতাদি কৃষ্ণলীলা শ্রবণ অতি উচ্চ আদর্শ ও মহত্বের পরিচায়ক। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজে বাস করিয়া এবম্বিধ কার্য্যে যোগদান, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। কালে এতদঞ্চলে চৈতন্ত মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল, সাক্ষী গোয়ালবাড়ী গ্রামের কায়স্থ বংশীয় অধিকারীদিগের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দৈনিক সেবা ও অষ্টমদোলোৎসব। হরিসংকীর্ত্তনের শেষে হিন্দু-মুসলমানের এইরূপ কোলাকুলী ও পরস্পর আলিঙ্গন, মহাপ্রভু প্রচারিত বিশ্বপ্রেমের নিদর্শন ও এতদঞ্চলে প্রচারিত পূর্ব্বতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের প্রেমবন্যার পুনরাবৃত্তি ও বিকাশ মাত্র।"

একসঙ্গে বসিয়া যারতার সঙ্গে খাইলেই যে চরম হইল আমরা তাহা মনে করি না। সকলকে ভালবাস- পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখে সমান ভাগী হও, পরস্পরের মধ্যে যাহাতে বিদ্বেষভাব একেবারে না থাকে তাই কর। নচেৎ কেবল সকলকে লইয়া গোলে হরিবোল দিয়া একত্রে বসিয়া পান ভোজন করিলেই যে হইল একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

ভগবৎ প্রসাদে জাতি বিচার নাই। কিন্তু সে প্রসাদ বুদ্ধি কি আমাদের আসিয়াছে? একবার শুনিয়াছিলাম উক্ত মুসলমান সম্প্রদায় নাকি কোন কোন প্রভুপাদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তাহারা যদি নিজ হাতে প্রভুর ভোগ দেন তবে তাহা সকলে গ্রহণ করিবেন কি না? আশ্চর্য্যের বিষয় যে, স্পষ্টভাবে প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা দিলেন না। তবেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাহিরে লোক দেখান একাকারের পক্ষপাতী অনেকে হইতে পারেন কিন্তু প্রাণে প্রাণে এক হওয়া বড় সোজা নয়। তাই বলিতেছিলাম যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বুদ্ধি না আসে ততক্ষণ সেই বিশ্বাস আনিবার জন্য সাধনা করা দরকার। আমার শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্ব জাতিকে এক করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি শুধু আহারের সময় এক করেন নাই, আচণ্ডালকে কোল দিয়াছেন ভগবৎপ্রেম দানে ধন্য করিয়াছেন।

যতদিন তুমি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়া চলিবে, ততদিন তোমাকে আহার বিহারাদির যথেষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। যখন সকল ছাড়িয়া

উদাসীন হইবে তখন তোমার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের ভয় হয় এই ভাবে যথেচ্ছাচার হইয়া আবার একটা উদ্ভট সম্প্রদায় না সৃষ্টি হয়।

(৪) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ)

বিগত ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকাখানির আগাগোড়া গৌরকথায় পূর্ণ, বৈষ্ণবসংবাদ বা সমালোচনাপ্রসঙ্গে যদিও তিনি কাহারও কাহারও মনে আঘাত দিতেছেন কিন্তু সেটা অন্যায় নয়। সমাজ ও সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যেখানে অশাস্ত্রীয় কথা বা অন্যায় কিছু দেখিতেছেন তাহারই কথা বলিতেছেন। মোটকথা সময়ের উপযোগী কাগজখানি হইয়াছে, আমরা ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

গত ভাদ্রমাসের উক্ত কাগজে উথলী নিবাসী প্রভুপাদ মধুসূদন গোস্বামী কর্ত্তৃক সংগৃহীত "শ্রীশ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শত নামস্তোত্র" প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় আমাদিগের বড়ই সন্দেহ হইয়াছে। প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় উক্ত স্তোত্রটি "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র বিরচিত" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জানিনা এতদিন এটী কোথায় ছিল। কোন গ্রন্থে বা কোনও আচার্য্য মুখে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ঐ স্তোত্রটী এতদিন কি অমুদ্রিত অবস্থায়ই ছিল? কিম্বা কোনও গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা জানাইলে বিশেষ ভাল হয়। কেন না ইতিমধ্যেই কেহ কেহ ঐটি যে প্রাচীন নয় তাহা বলিতেছেন। আশা করি এ বিষয়ে গোস্বামী মহাশয় শীঘ্রই নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আশ্বিন মাসের "ভক্তি" প্রকাশিত হইল। কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই ৺দুর্গা পূজা। ছুটির সময় অনেকেই স্থানান্তরে গমনাগমন করেন সে কারণ পত্রিকা পাঠাইলে পাইতে অনেকেরই গোলমাল হয়। তাই আমরা কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকা একত্রে কার্ত্তিক মাসের শেষে গ্রাহকগণকে পাঠাইব। মাসের প্রথমে পত্রিকা না পাইয়া কেহ চিন্তিত হইবেন না। যাঁহাদিগের নিকট ভক্তির বর্ত্তমান বর্ষের মূল্য বাকী আছে দয়া করিয়া এই সংখ্যা পাইয়া ৺পূজার মধ্যে পাঠাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। সকল গ্রাহকগণই স্মরণ রাখিবেন ভক্তির উন্নতি অবনতি তাঁহাদেরই হাতে। আজ ২২ বৎসর তাঁহাদের অপার কৃপায় ভক্তি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছেন, এজন্য সম্প্রদায়ের সকলের নিকটই তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

("ভক্তি"-কার্য্যাধ্যক্ষ)

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২২শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা

"হ'য়ে ভ্রান্ত প্রাণকান্ত তোমার লীলাখেলা বুঝিতে নারি।
যখন যে ভাবে রাখিবে এ ভবে সে ভাবে কেমনে হেরি॥"

প্রভো! সময় সময় ভাবি এবং ব'লয়াও থাকি যে, তুমিই জীবের একমাত্র গতি; তোমার কৃপা ভিন্ন জীবের আর অন্য গতি নাই, কিন্তু কি দুর্দ্দৈব যে, সকল সময় এ ভাব ঠিক রাখিতে পারি না। বিশ্বাস করিব, তোমাতে নির্ভর রাখিব মনে করি কিন্তু কি যে এক দুর্দ্দমনীয় অন্তর্নিহিত কারণ আসিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া দেয় তাহা বুঝি না। আজ বেশ ভাবিয়া দেখিলাম, এ চঞ্চলতার কারণ আমারই নিজকৃত অপরাধ। কি করিলে এই অপরাধ ক্ষালন হইবে তাহা তো আমি বুঝিতে পারিতেছি না। দয়াময়! যতদিন আমার এ চাঞ্চল্য না যাইবে ততদিন কিছুতেই এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে না ইহা ঠিক, কিন্তু এখন উপায় করি কি? পতিত-পাবন! আমার এ চঞ্চলতা দুর করিয়া দিয়া আমাকে কি স্থির করিবে না? সংসারে নানা বিষয়ে টুকুটুকু করিয়া প্রাণ ছাড়াইয়া দিয়াছি এই ছড়ান প্রাণ কুড়াইয়া তোমাতে একান্ত নির্ভরতা আনিয়া আমার তাপিত প্রাণে শান্তি দাও।

তোমার নিকট অপরাধ করিয়া তোমার নিকটই আবার অপরাধ ক্ষালনের

জন্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার কৃপা না হইলে অপরাধ যাইবেও না। ভূমিতে পদস্খলিত হইয়া যেমন সেই ভূমিকে ধরিয়াই আবার ভূমির উপর উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়, ভূমি ভিন্ন যেমন তাহার আর দাঁড়াইবার কিছু থাকে না, সেইরূপ তুমি বিশ্বেশ্বর, তোমার নিকট অপরাধ করিয়া জীব তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? তোমার নিকট অপরাধীর তুমিই অবলম্বন, তুমিই গতি। তাই আমি পতিত হইয়াও—অপরাধী হইয়াও তোমাকে ডাকিতে—তোমাকে আশ্রয় করিতে সাহসী হইয়াছি। দয়া করিয়া দীন হীনকে তোমার শান্তিময় কোলে তুলিয়া লও। আমি তোমার হইয়া, তোমাতে সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিয়া তোমার লীলাগুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনে প্রাণ-মন শীতল করি। দয়াময় দয়া করিয়া দীনের এই কাতর আর্ত্তনাদে কর্ণপাত কর।

সম্পাদক।

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১৩)

২৩।— (ওহে আমার) শ্রীগুরু করুণাময়।

(আমার) কি হবে কি হবে দিন যায় ভবে,
বৃথা রঙ্গরস আমোদ উৎসবে,
ভ্রমেও ভাবিনে (সে) ভবারাধ্য ধনে
কোন গুণে পাব ওপদে আশ্রয়॥

হেলায় গেল দিন তবু ত রসনা
'হরে কৃষ্ণ' নাম না করে ঘোষণা
মিথ্যা প্রবঞ্চনা পাপ কুমন্ত্রণা—কু-রসে মজিয়া রয়॥

নাহি বুদ্ধি বল সাধন সংযম,
যা আছে কেবল দম্ভ আর তম,
ভ্রম পরমাদ বিষাদ বিষম—অপরাধ অপচয়॥

অশুদ্ধ এ চিতে অসত সন্ধান,
আলস্য অশুচি সদা বলবান,
অশান্তি অনলে তাই সদা জ্বলে—প্রাণান্ত করিয়া লয়॥

এ বিশ্বরূপের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ,
শুন হে কাণ্ডারী ক্ষম অপরাধ,
অক্ষম এ দাসে রক্ষ দীননাথ অন্তে শমন ভয়॥

২৪। কীর্ত্তন-রঙ্গবিহারী অবতারি বলিহারি গৌরহরি রূপধারী।
বিন্দ্রাবন্ মে ভিন্ন তনু রূপ, কুঞ্জনকেলি বিলাস বহুরূপ,
অব্ তো মিলে দোনো এক স্বরূপ, ললিত কিশোর কিশোরী॥
বিন্দ্রাবন্ মে বংশী কো তান, শুনাকে মোহে লিয়ে মন-প্রাণ
অব্ তো মুখ্ মে রটেওঁ হরি নাম, প্রেম ধরমকে পরচারী॥
বিন্দ্রাবন্ মে রাস-রসরঙ্গ, মচাওঁ ফকৎ গোপীন্ কি সঙ্গ,
অব্ তো নাচত লই এক সঙ্গ, বিপ্র শূদ্র নরনারী॥
বিশ্বরূপ দেওয়ত জয়কার, জয় জগন্নাথ মিশ্রকুমার
মহাপ্রভু জয় পরম উদার, পতিতনকে হিতকারী॥

২৫। এমন! মহাপ্রভু গুণ গাও।
নবদ্বীপ পুর নাথ স্মরি মন প্রেমরসে ভাসি যাও॥
দিবস যামিনী আন প্রসঙ্গে, মত্ত কাল গত কু-রসরঙ্গে,
শমন ভয়ে ভীত, তবুও হতচিত, হিত বিধান না চাও॥
এ ভবতুস্তর জলধি অতলে, গো-ক্ষুর বারিসম তরিবি হেলে,
'বিশ্ব' পাবন গৌর নাম বোলে, আপনি মাতি মাতাও॥

সম্পাদক

"নাড়া"

শ্রীমন্মহাপ্রভু কেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'নাড়া' শব্দে অভিহিত করিতেন? মনে হইতেছে, অনেকবৎসর আগে একবার তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। কি যে বলিয়াছিলাম—মনে নাই, তবে তখন কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে পারিনাই, তাহা বেশ মনে আছে।

"ভক্তি" গত ভাদ্র সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় "নাড়া" শব্দের অর্থবিচার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তাই দুই একটি কথা বলিব।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু উপরোক্ত বাক্যে অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্বোধন করেন, তখন অদ্বৈতের বয়স সপ্ততি বর্ষেরও উর্দ্ধে। এজন্য কেহ কেহ বলেন যে, বৃদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর মস্তকে কেশ ছিল না বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে 'নাড়া' (নেড়া) বলিতেন।

কিন্তু একথা ঠিক নহে; "কাণাকে কাণা, খোঁড়াকে খোঁড়া" বলা সাধারণ নীতি বিগর্হিত, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা করেন নাই। স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, ইহা একটি স্নেহাত্মক সম্বোধন। আবার অদ্বৈত প্রভুর ধ্যানেও পাওয়া যায় যে, তাঁহার মস্তকে কেশ ছিল। যথা—

"শুদ্ধস্বর্ণরুচিং দিব্যোপবীতং বনমালিনং
তিলতণ্ডুল কেশাভং সূক্ষ্ম শ্বেতাম্বরং বিভুং
প্রেমানন্দময়ং শান্তং চন্দনাক্ত-কলেবরং
অদ্বৈতং গৌরচন্দ্রস্যাচার্য্যমীশং স্মরাম্যহং।"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গঙ্গাজল ও তুলসীদল সমন্বিত পূজায়, তাঁহার ঐকান্তিক অর্চনায়—তাঁহার আকর্ষণে ও হুঙ্কারে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। ইহা প্রসিদ্ধ কথা। আবেশে স্বয়ং মহাপ্রভুই বলিয়াছেন—

"শুতিয়া আছিনু মুই ক্ষীরোদ সাগরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হুঙ্কারে॥" (চৈতন্যভাগবত)

এই উক্তির উপলক্ষে বলা যাইতে পারে না কি যে, যাঁহার আকর্ষণে—যাঁহার হুঙ্কারে তিনি ক্ষীরোদসাগরে সুখে স্থির হইয়া শায়িত রহিতে পারেন নাই, তাঁহাকে নড়িতে অর্থাৎ ধরাধামে আসিতে হইয়াছিল, সেই অদ্বৈতের উদ্দেশ্যে (ঐ অর্থে) 'নাড়া' শব্দ প্রযুয্য হইয়া থাকিতে পারে? লেখক কর্ত্তৃক এইরূপ একটা কথা পূর্ব্বে উপস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। আর মনে হইতেছে, গোলোক গত শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিবিনোদ কেদার বাবুর কথা; তিনি অনুমান করিয়াছিলেন,—'নার' হইতে 'নাড়া' হইয়াছে। কেননা, শ্রীঅদ্বৈতই নারায়ণ, মহাবিষ্ণুর অবতার।

ইহার পরে আমরা "বাল্য-লীলাসূত্র" গ্রন্থালোচনায় এই শব্দের যে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের নিকট নবগ্রাম। যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

"বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
সর্ব্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম॥
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ॥"

শ্রীহট্টে দুইটী মহাপীঠ বিরাজমান, একটি শ্রীহট্ট সহরে, অন্তটী সহরের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী জয়ন্তীয়া নগরে।

১। "শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব, বৈভব যাহা সেবি॥"
২। জয়ন্তায় বামজঙ্ঘা ফেলিলা কেশব।
জয়ন্তীদেবতা, ক্রমদীশ্বর ভৈরব॥"

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

জয়ন্তীদেবী হইতেই জয়ন্তীয়ার নাম হইয়াছে। সুতরাং শ্রীহট্টের প্রাচীনত্ব ইহা তই প্রতিপন্ন হয়। এই শ্রীহট্টে প্রাচীনকালে তিনটী হিন্দুরাজ্য ছিল। ১। লাউর, *। গৌড়, ২ ও ৩। জয়ন্তীয়া।

প্রাচীনকালে লাউড়ে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। শকাব্দ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঐ বংশে দিব্যসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার মন্ত্রীর নাম কুবেরাচার্য্য। অদ্বৈত প্রভু এই কুবেরাচার্য্যেরই পুত্র।

অদ্বৈতের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন কোনও কারণে ‡ তিনি জন্মভূমি লাউড় পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গমন করেন ও তথায় কালক্রমে তিনি বিখ্যাত হইয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন, এবং ভক্তিহীন দেশে তিনিই তখন ভক্তির শীতল বারি বর্ষণ করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজা দিব্যসিংহ শক্তি উপাসক ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কাশী গমন ব্যাপদেশে শান্তিপুরে গিয়া মন্ত্রী-পুত্রকে দর্শন করেন। কিন্তু তাঁহার আর কাশী যাওয়া হইল না, অদ্বৈতের হুঙ্কারে তিনি তাঁহার চিরাচরিত মত পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

---

* এ গৌড় শ্রীহট্টের—পশ্চিম গৌড় নহে।

‡ বারান্তরে এই মতের বাল্যলীলাপ্রসঙ্গে এই কারণ উল্লেখ করিব।

অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দের শিষ্য হরিচরণ দাস কৃত "অদ্বৈতমঙ্গল" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

"ছিলট্ট দেশের রাজা বৈষ্ণব হইল॥
এই রাজা পূর্ব্বে বৈষ্ণবদ্বেষী ছিল বড়।
বৈরাগী হইয়া প্রভুর কৃপা পাইল দঢ়॥"

রাজা দিব্যসিংহের বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস। তিনি অতঃপর শান্তিপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং তথায় অদ্বৈতের শ্রীহট্টীয় দ্বাদশবর্ষের বাল্যলীলা 'বাল্যলীলা-সূত্র' নামক গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় বর্ণনা করেন। এই আদি শ্রীচরিতগ্রন্থ ১৪০৯ শকাব্দে রচিত হয়। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যে অদ্বৈত-শিষ্য ঈশান দাস লিখিয়াছেন :—

"লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র।
যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥"

বাল্যলীলাসূত্র গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আদিশূরের রাজ্যে কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ তপস্বী আগমন করেন, তন্মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের প্রথমা পত্নীজাত সন্তান দেশেই ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা বঙ্গদেশে বসতি করায় পিতা পতিত বলিয়া তিনি স্বদেশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হন, ও অনন্যোপায় হইয়া আদিশূরের সভায় আগমন করেন। আদিশূর তাঁহাকে বরেন্দ্রভূমে এক গ্রাম দিয়া স্থাপন করেন। ইহার পুত্রের নাম গুণকরাচার্য্য। তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র বিষ্ণুমিশ্র, ইঁহার পুত্র কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থের পুত্র প্রজাপতি অগ্নিহোত্রী, তৎপুত্র মাতঙ্গ, তাঁহার পুত্র জিষ্ণনাচার্য্য, ইঁহার পুত্রই প্রসিদ্ধ ভাস্কর বৈদান্তিক। বল্লাল সেনের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগকালে এই ভাস্করের পুত্র আরুওঝা নাড়ুলী গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, এজন্য 'নাড়ুলীগাঞি' সংজ্ঞা লাভ করিল।

যথা—শ্রীবাল্যলীলাসূত্রে—

"আরুর্বেদ বিদাং শ্রেষ্ঠ ওজোপাধি বিভূষিতঃ।
নাড়ুলী গ্রামবাসাচ্চ নাড়ুলী গাঞি সংজ্ঞকঃ॥"

১ম সর্গঃ ৩৬ শ্লোকঃ।

আরুওঝার পুত্র যদু, যদুর পুত্র শ্রীপতি দত্ত (স্মৃতিসার গ্রন্থ প্রণেতা) ইনি লাউড়াধিপতির মন্ত্রিত্ব গ্রহণে শ্রীহট্টে গমন করেন।

ইঁহার পুত্র শ্রীহট্টবাসী কুলপতি, তৎপুত্র প্রভাকর, প্রভাকরের আত্মজ

বিখ্যাত নরসিংহ। ইনি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ গণেশের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন।

"দেবে শ্রীহট্ট হৈতে শ্রীগণেশ রাজা।
নরসিংহ নাড়িয়ালে করিলেন পূজা॥" (প্রেমবিলাস গ্রন্থ)

নরসিংহ তৎপর গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে এক বাড়ী প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি শ্রীহট্টের বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁহার পুত্রই লাউড়াধিপতির মন্ত্রী শ্রীমৎ কুবেরাচার্য্য। এই কুবেরাচার্য্যই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতা। শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য বলরাম দাস কৃত প্রেমবিলাস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—

"শ্রীহট্টে লাউড় দেশে নবগ্রাম হয়।
যথি দিব্যসিংহ রাজা বসতি করয়॥
তাঁর সভাপণ্ডিত ভরদ্বাজ মুনি বংশ।
কুবের আচার্য্য নাম সদ্‌গুণ প্রশংস॥
অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শুদ্ধমতি।
নরসিংহ নাড়িয়ান বংশের উৎপত্তি॥　ইত্যাদি।"

পুনশ্চ অদ্বৈত-শিষ্য ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে কুবেরাচার্য্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

"নাম তার হয় শ্রীমন্ কুবের আচার্য্য।
ধর্ম্ম বিদ্যা বলে হৈল সকলের পূজ্য॥
তানগুণ বর্ণিতে মোহর শক্তি নাই।
নরসিংহ সন্ততি বলি লোক যাঁরে গায়॥
যেই নরসিংহ নাড়িয়ান বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরুওজার বংশজাত॥"

অদ্বৈত প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'নাড়া' বলিয়া ডাকিতেন কি অর্থে, এতক্ষণে বোধহয় তাহা স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। অদ্বৈতপ্রভু 'নাড়িয়ান' বংশ জাত বলিয়াই 'নাড়া'। ইহা তাঁহার গৌরবসূচক পরিচয়। এ গৌরব শুধু বংশ গৌরব নহে, আবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ কখনই বংশগৌরব প্রকাশ করেন নাই। অদ্বৈত স্বয়ং তপস্বী ছিলেন, তপস্যাতেই তিনি প্রভুকে আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু তপস্যাতেই 'নাড়িয়ান' বংশের বিশেষত্ব। নরসিংহ, আরুওজ', ভাস্কর, প্রজাপাত, নারায়ণ, ইঁহারা প্রত্যেকেই তপস্বী ছিলেন। তাই 'নাড়া' সম্বোধনে

নাড়িয়া বংশেরই তপশ্চর্য্যের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ তপস্বী অদ্বৈতাচার্য্যের অর্চ্চনাই তাঁহার অবতারণের কারণান্তর মাত্র।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

"ভক্ত নরসী"

শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তেমে ভক্ততমা মতাঃ ॥

অর্থাৎ যে কেবলমাত্র আমার ভজনা করে সে আমার তত প্রিয় নয়, যে আমার ভক্তের ভজনা করে সে আমার যত প্রিয়। মোট কথা ভগবান ভক্তের মহিমা বাড়াইয়াই গিয়াছেন। ভক্তের পূজা, নিজের পূজা অপেক্ষা বড় বলিয়া ভগবান যে কেবল মুখে বলিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, শাস্ত্রেও তাহার বহু বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক ভক্তের গুণ-কীর্ত্তনে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। আমরা সংসারী জীব, যেটা করিলে লাভ হয় সেইটাই আমাদের বড় প্রিয়, আর করিয়াও থাকি তাই। ভক্ত-মাল হইতে আমরা আজ ভগবানের অতি প্রিয় একটী ভক্তের কথা ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিতে আসিয়াছি, আলোচনা করিয়া আনন্দ পাইলে দীন লেখকও সে আনন্দের কণা লাভে বঞ্চিত হইবে না।

যাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্র বর্ণনে আজ আমরা উপস্থিত সে ভক্তটীর নাম "নরসী" জুনাগড় নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতেই নরসী কৃষ্ণ ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুনেন, গুণ কীর্ত্তন করেন, কখন কখনও বা ধ্যান যোগে সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া আনন্দ-সিন্ধুতে ডুবিয়া যান। এই ভাবেই নরসীর দিন চলিয়া যায়। নরসী যখন এই ভাবের তখন নরসীর পিতামাতা তাহাকে বিবাহ দিয়া যান, কিন্তু নরসী সংসারী হইতে পারিল না। কারণ সে উপার্জ্জনাক্ষম। কাজেই নিজ পরিবারকে লইয়া সে তাহার ভ্রাতার সংসারেই থাকে।

একদিন পিপাসায় কাতর হইয়া নরসী ভ্রাতৃবধুর নিকট জল চাহিয়াছিলেন,

ভ্রাতৃবধূ জল ত দিলেনই না অধিকন্তু নানাবিধ কটুবাক্য বলিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন।

নরসী নিজে উপার্জ্জন করিতে পারেন না, তাহাতে সভাবতঃই লজ্জিত ছিলেন; তাহার উপর আবার ভ্রাতৃবধূর ভর্ৎসনা, ইহাতে নিজেকে বিশেষ অপরাধী মনে করিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে বাড়ীহইতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে পথে সঙ্কল্প করিলেন "এ প্রাণ আর রাখিব না।" সম্মুখেই ভীষণ হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্য, প্রাণত্যাগ সংকল্প করিয়া নরসী ধীরে ধীরে সেই বনেরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, হিংস্রজন্তুগণ নরসীকে দেখিয়া হিংসাত করেই না অধিকন্তু যেন পরমাত্মীয়ের মত তাহাকে ঘিরিয়া বসে।

নরসী দেখিলেন এও একবিপদ, কোথায় মরিব বলিয়া বনে আসিলাম এখানেও আবার বিঘ্ন? সম্মুখের দিকে চাহিয়া একটী শিবমন্দির দেখিয়া নরসী ঐ মন্দিরপ্রাঙ্গনে অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। একদিন দুইদিন করিয়া সাতদিন গেল, বাঘেও খায়না, অনাহারেও মরে না, এইবার নরসী যেন আরও ব্যাকুল হইল। মনে করিল সম্মুখস্থ দীর্ঘিকায় জীবন বিসর্জ্জন দিবে। রাত্রে এইরূপ সংকল্প করিয়া শিবমন্দিরের প্রাঙ্গনে পড়িয়া রহিল হঠাৎ যেন শেষ-রাত্রে কেমন একটু তন্দ্রা আসিল এবং সেই তন্দ্রার ঘোরে দেখিল—

"আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া।
বরমাগ কহে নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া ॥"

নরসী ঘুমের ঘোরেই মহাদেবকে প্রণাম করিল এবং নিজের মনোব্যথা জানাইয়া যাহাতে তাহার প্রাণবিয়োগ হয় তাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহাদেব নরসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ, কি দুঃখে তুমি আত্মহত্যা করিবে? তোমাদ্বারা জগতে অনেক কার্য্য সাধিত হইবে। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বরপ্রার্থনা কর।" নরসী ত অবাক্, "প্রাণত্যাগ সংকল্প করিয়া বনে আসিলাম, এখানেও নিস্কৃতি নাই! আবার দেবদেব মহাদেব—আমাকে দর্শন দিয়া বর লইবার অনুরোধ করিতেছেন? আচ্ছা! দেখি লীলাময়ের লীলা কত দূর যায়," এই মনে করিয়া নরসী করযোড়ে বলিল—

"কি বর মাগিব মুই বুঝিতে না পারি।"

প্রভু, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা যে, কি বর প্রার্থনা করিব। তবে তুমি যখন পুনঃ পুনঃ আমাকে বর দিবার জন্য আগ্রহ করিতেছ, তখন—

"সর্ব্বোত্তম যাহা হয় তাহা মোরে দেহ।
আপনি সকল জান বিচার করহ ॥"

এবার ঠাকুর বিপদে পড়িলেন। কেননা, নরসী যদি নিজের মুখে কিছু ব্যক্ত করিত তাহা হইলে ভাল মন্দ বিচার আসিত না, তথাস্তু বলিয়াই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রার্থী যখন নিজের দায়িত্ব না রাখিয়া দাতার উপর নির্ভর করিয়াছে তখন তো একটা যা তা দিয়া গেলে চলিবে না? তারপর নরসী আবার—"সর্ব্বোত্তম যাহা হয় তাহা মোরে দেহ বলিয়াছে। মহাদেব বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। শেষে—

"চিন্তিয়া দেখিলা দেব কৃষ্ণভক্তি বিনে।
সর্ব্বোত্তম কিছু নাই এ তিন ভুবনে ॥
নরসীও বৈষ্ণব, কৃষ্ণচরণ আশ্রিত।
কৃষ্ণপ্রেম দান হয় ইহারে উচিত ॥
কৃষ্ণ প্রেমদাতা মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্কর।
বড় কৃপা কৈল দেব নরসী উপর ॥"

নরসী একেই ভক্ত ছিলেন তাহার উপর আজ শঙ্করের কৃপায় কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। শঙ্কর শুধু কৃষ্ণ প্রেম দান করিয়াই নরসীকে ছাড়িলেন না, সেই অবস্থাতে তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণ সঙ্গে নানাবিধ লীলাবিলাস দর্শন করাইয়া দিলেন। হঠাৎ লীলাদর্শন ও কৃষ্ণ প্রেম লাভ হওয়ায় নরসীর স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তখন সেই লীলা পুনর্ব্বার দেখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই আর তাহা দর্শন হইল না। ভক্তমালে বর্ণিত আছে—

"কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দিয়া তাহারে লইয়া।
বৃন্দাবন গেলা দেব হরসিত হইয়া ॥
যথা নিত্য রাসলীলা কৃষ্ণচন্দ্র করে।
ভক্তির প্রভাবে দোঁহে গোপীরূপ ধরে ॥
গোপীরূপে শ্রীরাসমণ্ডলে যবে গেলা।
মুচকিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে লাগিলা ॥

গোপীগণ ঠারে ঠোরে হাসিয়া কহয়।
কোথাহৈতে আইল এ নূতন সখীদ্বয় ॥
নরসী দেখিয়া শ্রীমন্‌রাধাকৃষ্ণ রূপ।
গোপীগণ শোভা রাসমণ্ডল অনুপ ॥
বিভোল হইয়া মুখে নাহি সরে বাণী।
গোপীগণ হাসেন ধরিয়া তার পানি ॥
এইরূপে অনেক যে কৌতুক হইল।
ক্ষণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পাইল ॥
হাহাকার করি মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়।
যাহা দেখিবারে চাহে দেখিতে না পায় ॥"

নরসী আর কি করিবেন, মনে ভাবিলেন যখন এমন হইল দেখি যদি তিনি পুনরায় দয়া করিয়া দর্শন দেন। আরও সেই মহাদেবের বাক্য "আত্ম-হত্যা মহাপাপ" এই বাক্য যেন থাকিয়া থাকিয়া নরসীর কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সাত-পাঁচ ভাবিয়া ক্ষুন্নমনে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু আর পূর্ব্বের আশ্রমে না গিয়া বাহিরে একখানি কুঁড়ে ঘর করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া দিন রাত্র কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নরসীর ভ্রাতা নরসীর গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। আজ আবার পুনরায় ভ্রাতাকে দেখিয়া পরম যত্নে নিজ বাড়ীতে আনিতে গেলেন নরসীও দাদার কথা ফেলিতে পারিলেন না, তাঁহার সহিত আসিলেন বটে কিন্তু সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার বাসনা করায় তাহার ভ্রাতা বাড়ীর সন্নিকটেই একটী ক্ষুদ্র আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া নরসীর ভজন সাধনের উপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। নরসীর কিন্তু কোন ভাবান্তর ঘটিল না ঐ এক ভাবে 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদা কখনও বা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য এই ভাবেই দিন যাইতে লাগিল। কাহারও সহিত মেলামেশা বা কোনও রূপ বাজে কথা নরসীর নিকট হইতে কেহ আর শুনিতে পাইত না।

এই ভাবে কৃষ্ণ চিন্তা, কৃষ্ণগুণ গানে ভক্ত নরসীর দিন যায়। বাহিরের লোকে তাহার অন্তরের ভাব না জানিয়া পাগল বলিয়া উপহাস করে। এমন করিয়া কিছুদিন যায়, একদিন এক অপূর্ব্ব ব্যাপার হইল। এক বৈষ্ণব দ্বারকাধামে দ্বারকানাথকে দর্শন করিতে যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে নরসীর

বাড়ীর নিকটে আসিয়া কোনও মহাজনের নিকট হুণ্ডি করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। মহাজন তো তাহাকে হুণ্ডি দিলেনই না অধিকন্তু বিদ্রূপ ভাবে বলিয়া দিলেন। আমাদের নিকট তোমার সুবিধা হইবে না তোমার দলেরই একজন আছে তার কাছে যাও হুণ্ডি পাইবে। বৈষ্ণব যখন জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, তখন মহাজন নরসীর বাড়ী দেখাইয়া বলিয়া দিলেন "নরসী ভকত স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া॥" সরলমতি বৈষ্ণব মহাজনের বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ছুটিতে ছুটিতে নরসীর নিকট আসিয়া বলিলেন—

" * * * একশত টাকা লহ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ॥"

নরসী ভক্ত বৈষ্ণবের কাতরতা দেখিয়া কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল—

"* * ভাল ভাল শত টাকা দেহ।
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেই লহ॥"

এই বলিয়া শ্যামল সাহার নামে হাজার টাকার হুণ্ডি লিখিয়া দিয়া বৈষ্ণবকে বলিয়া দিলেন দ্বারকাধামে শ্যামল সাহা বড়ই তুখর লোক, ইহার নামে সর্ব্ব দেশে হুণ্ডি চলে, তুমি যাইয়া হুণ্ডি দিবামাত্রই টাকা পাইবে।

সরল স্বভাব বৈষ্ণব নরসীর অন্তরের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার কথাতেই বিশ্বাস করিয়া হুণ্ডি লইয়া চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে দ্বারকা ধামে উপস্থিত হইয়া সহরময় শ্যামল সাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহাকে দেখে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে শ্যামল সাহা কে এবং কোথায় থাকে জান কি? এমন সময় ভক্তবৎসল শ্রীহরি এক অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ করিলেন।—

* * * *

"হেন কালে সম্মুখেতে দেখে এক ঠাঁই॥
একজন এক থলি টাকা স্কন্ধে করি।
আসিয়া কহয়ে বৈষ্ণবের বরাবরি॥
জুনাগড় হৈতে এক চিঠি আসিয়াছে।
মোর নামে নরসী এক হুণ্ডি লিখিয়াছে॥

তাহা শুনি হর্ষে তবে বৈষ্ণব কহেন।
হাজার টাকার হুণ্ডি মোরে দিয়াছেন॥
শ্যামল সাহা কি তবে হয় তব নাম।
তেঁহ কহে হয় হয় আমারি আখ্যান॥"

ভক্ত বৈষ্ণব এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না যে, শ্যামল সাহা কে? সে শ্যামল সাহা নাম শুনিয়া তাহার হুণ্ডি দিয়া টাকা গুণিয়া লইল। এবং তাহাকে দিয়াই টাকার থলিয়া বহন করাইয়া নিজ বাসায় পৌছাইয়া লইল। ভক্ত নরসী কিন্তু কৃষ্ণকেই শ্যামলসাহা নামে অভিহিত করিয়া হুণ্ডি লিখিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তের প্রতিজ্ঞা, ভক্তের বাক্য, ভক্তের পন বজায় রাখিতে ভগবান নিজে মাথায় করিয়া টাকা বহিয়া দিয়া গেলেন। ভক্ত তুমিই ধন্য, তোমার পদরজ পাইলে কত জন্ম জন্মান্তরের দুর্দ্দৈব যে এক নিমিষে কাটিয়া যায় তাহার ঠিক নাই।

ভক্ত নরসীর আর একটী অপূর্ব্ব কাহিনী পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। নরসীর দুইটী কন্যা যথাকালে জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ হইয়াছে, তাহার পুত্রও বিবাহযোগ্য হইয়াছে দেখিয়া কন্যা পিতাকে বিশেষ করিয়া পাত্রি দেখিয়া বিবাহ দিবার জন্য বলিলে নরসী কন্যাকে বলিতেছেন—

" * * কৃষ্ণ দিবে আমি কি করিব।
জগতে যে করে সেই সম্পন্ন করিব॥"

কন্যা কিন্তু সে কথায় নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া যথাকালে ঘটক ডাকিয়া এক কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিল।

এদিকে কন্যাকর্ত্তাগণ পরস্পর শুনিলেন—

* * *
"নরসী কাঙ্গাল সদা করয়ে ভজন॥
তাহার দৌহিত্র তার অন্ন নাহি ঘরে।
ইহা শুনি সবে মিলি আর্ত্তনাদ করে॥"

বিবাহের দু'একদিন মাত্র বাকী আছে, কন্যা আসিয়া পিতাকে বলিলেন, "বাবা বিবাহের উদ্যোগ কর?" নরসী উত্তর করিল—

" * * যার ভার সেই বিভা দিবে॥"

কন্যা এবার বিশেষ চিন্তিতা হইল। মনে ভাবিল, বিবাহ স্থির হইয়াছে, এখন যদি পিতা কোনরূপ আয়োজন না করে, তবে কি করিয়া এ কার্য্য

নির্ব্বাহ হইবে? কিন্তু নিজের কোনই ক্ষমতা নাই; বিবাহের পর হইতে শ্বশুর বাড়ীর আদর যত্ন বড় বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই, কারণ ঐ পুত্রটীর জন্মগ্রহণের পরই সে বিধবা হয় এবং শ্বশুরকুলে তেমন আপনার জন কেউ নাই বলিয়া বাপের বাড়ীই পড়িয়া থাকে। এমতাবস্থায় এখন একমাত্র বাপ ভিন্ন তার আর কে আছে? কিন্তু বাপতো কিছুই করিতেছেন না। কি করিবে, নিতান্ত দুঃখিত ভাবে কেবল চিন্তাই করিতে লাগিল কি প্রকারে এই দায় হইতে উদ্ধার পাইবে।

এদিকে বিবাহের দিবস প্রাতে এক অদ্ভুত ব্যাপার হইল। নরসীর কন্যা বা অন্য কেহ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সকলেই ভাবিল নরসীর নির্দ্দেশ মতই এ সকল হইতেছে—বিবাহের দিন প্রাতে—

* * *

"শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীসহ আইলা তথায়॥
ছদ্মরূপে আসি বিবাহের আয়োজন।
করিলা সকলি সঙ্গে নিয়া বহুজন॥
সন্ধ্যাকালে হাতি ঘোড়া মশাল দীপক।
লইয়া আইল তথা শত শত লোক॥
কোথা হৈতে আইসে তাহা কেহ না সমুঝে।
নরসী আনিল বলি সব লোক বুঝে॥"

এইভাবে ইচ্ছাময় হরি অতিশয় জমকাল ভাবে বরসজ্জা করিয়া নরসীকে ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতে বলিল। নরসী বলিল, 'ভাল বস্ত্র আমি কোথায় পাইব, আর তাহা পরিয়াই বা কি হইবে? বল আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?' এই বলিয়া একখানি ছেঁড়া কাঁথা গায় জড়াইয়া করতাল হাতে লইয়া 'হরে কৃষ্ণ' নাম গাহিতে গাহিতে আসিয়া দাঁড়াইল। পরম রসময় শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রিয় ভক্ত নরসীর ভাব দেখিয়া মুচকি হাসিয়া একটী সুসজ্জিত হস্তী পৃষ্ঠে তাহাকে উঠাইয়া দিলেন এবং ভক্তাধীন ভগবান আজ নিজেই বরকে লইয়া শোভাযাত্রার অধ্যক্ষতা করিতে করিতে চলিলেন। ক্রমে—

"কন্যাকর্ত্তা গৃহে গিয়া সবে পহুঁছিলা।
সমৃদ্ধি দেখিয়া তারা বিস্মিত হইলা॥
পূর্ব্বে যে দারিদ্র বলি উপহাস কৈল।
বরের সমৃদ্ধি দেখি চমৎকৃত হৈল॥

লোকজনে খাইতে দিবার নাহি যোত্র।
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল দেখিয়া বিচিত্র॥"

দর্পহারী শ্রীমধুসূদনের কৃপায় কন্যাপক্ষের দর্পচূর্ণ হইল। বরপক্ষের সমৃদ্ধি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত। এদিকে বিবাহ সভায় সকলে নানা প্রকার কার্য্যে ব্যস্ত, নরসীর কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে একমনে বসিয়া করতাল বাজাইয়া নাম গান করিতে লাগিল। সভাক্ষেত্রে বহু রকমের লোক উপস্থিত ছিল, কেহ কেহ বা তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল।

ভক্তবৎসল ভগবানের দয়ায় ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট লোক জনের কার্য্য তৎপরতায় বিবাহের কোনও বিশৃঙ্খলতা হইল না, নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য শেষ হইল। পরদিন যথাকালে বর কন্যা ঘরে আসিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই লোকজন, হাতি ঘোড়া, আর কেউ দেখিতেও পাইল না।

আর এক কাহিনী পাঠক শুনুন। নরসীর কন্যা যথাকালে শ্বশুর বাড়ীতে গেল, তথায় দারিদ্র্যতায় বিশেষ কাতর হইয়া—

"শ্বশুর শাশুড়ী কহে তোমার পিতারে।
কহিয়া পাঠাও কিছু উপকার করে॥"

শ্বশুর শাশুড়ীর কথা শুনিয়া কন্যা পিতার নিকট বারবার সংবাদ পাঠান। কিছুতেই তিনি কিছু দেন না দেখিয়া শেষে বিশেষ কান্না-কাটি করিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, যদি নিতান্তই কিছু নাই দেন তবে একবার আসিয়া দর্শন দিয়া যাইবেন। নরসী কি করেন সেই করতাল হাতে, ছিন্ন বস্ত্র গায়, হরিনাম গাহিতে গাহিতে গিয়া কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কন্যার শ্বশুর শাশুড়ী তো নরসীর হাল-চাল দেখিয়া অর্থ পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া তাহাকে ও কন্যাকে উপহাস করিতে লাগিল এবং অতি অনাদর করিয়া এক ভাঙ্গা চালার মধ্যে তাহাকে থাকিতে দিল। নরসীর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, যেখানে থাকিতে দিল উহাই পরমানন্দে অঙ্গীকার করিয়া লইল।

যথাসময় ফুল তুলসী লইয়া নরসী কৃষ্ণ পূজায় বসিল, দৈবের ঘটনে সেই সময় ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাঙ্গা চালায় জল পড়িয়া যখন ফুল তুলসী ভাসিয়া যাইতে লাগিল তখন ভক্ত নরসী হাত জোড় করিয়া ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে বলিল—

* * *

"কৃষ্ণ পূজার দ্রব্য কেনে কর অপচয়॥

এতেক কহিতে জল নাহি পড়ে তথা।
চতুর্দ্দিকে বর্ষে মুষলের ধার যথা॥
বিহাই দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য মানিল।
কারণ কি তার কিছু বুঝিতে নারিল॥
তবে তার কন্যা তার পাকের সামগ্রী।
যথা শক্তি আনি দিল হৈয়া অতি ব্যগ্র॥
পাক না করিয়া সাধু গব্য কিছু খাইল।
দুহিতা নিকটে বসি কহিতে লাগিল॥
শ্বশুর শাশুড়ী আদি ইঁহারা দরিদ্র।
অন্ন না খাইতে জোড়ে সদাই অভদ্র॥
তুমি কিছু উপকার করিবে বলিয়ে।
শ্বশুর শাশুড়ী মোর আছিল আশায়ে॥
তুমি যদি শূন্যহস্তে আইলে দেখিয়া।
মোরে উপহাস করে গঞ্জনা করিয়া॥
ইহাশুনি সাধু তবে কন্যারে কহয়।
শাশুড়ীরে কহ তুমি কি চৈহ চাহয়॥
যাহা চাহে তাহিদিব নাহিক সংশয়।
আমার প্রভুর ঘরে কিবা না আছয়॥"

পিতার কথা শুনিয়া কন্যা তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর নিকট গিয়া সকল কথা বলিল। শাশুড়ী পূর্ব্ব হইতেই তাহার হালচাল দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিল, আবার এখন 'যাহা চাহিবে তাহাই দিবে' এতবড় স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া রাগে গড়্ গড়্ করিতে করিতে বলিল, "সম্বলতো দেখি ছেঁড়া নেকড়া, একি কল্পতরু যে, যাহা চাহিব তাহাই দিবে? ভাল যদি তাহাই হয় তবে—

"পানিহারায় দিতে হবে দুইটা পাথর।
তাহাগিয়া চাহ তব পিতার গোচর॥"

হায়! হায়! মোহান্ধ মানব বুঝিতে পারে না যে, বাহিরে উহার ছেঁড়া নেকড়া দেখিলে কি হয়? উহার অন্তরে সেই সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীরও আরাধ্য ধন বিরাজ করিতেছে। বেশীকথা কি, একবার মনে করিলে পলকের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পারে। যাক্, কন্যা শাশুড়ীর কথাশুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া পিতার নিকট আসিয়া

সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। শুনিয়া নরসী কন্যাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "মা! তুমি দুঃখ করিও না, তুমি বল তোমার কি চাই আমি সত্যকরিয়া বলিতেছি তোমাকে তাহাই দিব।"

স্ত্রীলোকের স্বভাব যে, অন্য স্ত্রীলোকের নিকট শ্লাঘা হয়। তাই পিতার নিকট বলিল 'পাড়ায় যত স্ত্রীলোক আছে প্রত্যেককে এক এক খানি বস্ত্র দাও।' কন্যার আবেদন শুনিয়া পিতা বলিল, 'ভাল তাহাই হইবে তোমার শাশুড়ী যে পাথর চাহিয়াছে তাহাও দিব।'

"তবে সাধু শ্যামলসাহার স্থানে কহে।
গাড়ী ভরি নানাবস্ত্র আইসে তার গৃহে॥
আর, স্বর্ণময় এক আর এক রৌপ্যময়।
দুইখানি পাথর যে আনিয়া ডারয়॥"

কন্যা পিতার প্রদত্ত দ্রব্যে গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে বস্ত্র বিলাইয়া দিল। পরে কেবল তাহার শাশুড়ীর প্রার্থিত পাথর দুইখানি নিয়া শাশুড়ীকে দিল। তবে এ পাথর একখানি স্বর্ণময় একখানি রৌপ্যময়। কন্যার ও তাহার শাশুরীর প্রার্থিত দ্রব্য দিয়া সাধু নিজালয়ে গমন করিলেন। এইবার সকলেরই সাধুর উপর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। কন্যাতো আর শ্বশুর বাড়ী থাকিলই না; পিতার এইসকল ব্যাপার দেখিয়া একেবারে পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পিতাকে বলিল, "আমাকে কৃষ্ণ ভজিবার প্রণালী বলিয়া দাও আমিও তোমার সহিত কৃষ্ণ ভজন করিব।" ভগ্নির ঐকান্তিকতা দেখিয়া তাহার ছোট ভগ্নিও বলিল "আমিও ঐ আশা করি, আমিও আর বিবাহ করিব না, একান্তপ্রাণে শ্যামলসাহাকে ভজিব।

"সেই মোর পতি সেই বন্ধু যে বান্ধব।
মায়ার প্রভাবমাত্র অন্যে পতিভাব॥"

এইভাবে বিচার করিয়া দু'জনেমিলিয়া পিতার নিকট সরলভাবে সমস্ত বলিলে পিতা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়া উভয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

এবার ভক্ত নরসীর সঙ্গী হইয়াছে দুই কন্যা, তিনজনে মিলিয়া তম্বুরা ও করতাল সংযোগে কৃষ্ণগুণ গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহাদের কাহারও বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই গ্রামে গ্রামে তিনজনে এইভাবে কৃষ্ণ গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। কিন্তু গাঁয়ের লোকসকল তাহাদের অন্তরের ভাব বুঝিতে না পারিয়া নানাভাবে নিন্দা করিতে লাগিল।

জাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনগণ সকলে তাহাদের ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাদের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্রমে কোন দুষ্ট লোক তথাকার রাজা 'মালদের' নিকট নানাভাবে পল্লবিত করিয়া ইহাদের বিষয় বলিল। তাহাতে রাজা পদাতিক দ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া লইবার জন্য হুকুম দিলেন।

ইহারা কিন্তু পরমানন্দে কৃষ্ণ নামগুণ গানে মত্ত। পদাতিক যেমন আসিয়া রাজার আদেশ জানাইল অমনি তিনজনে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে রাজার নিকট চলিল। রাজা ইহাদিগকে দেখিয়া কটুবলিবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু ইহাদিগের তেজঃপুঞ্জময় দেহ দর্শনে কটুবাক্য তো মুখে আসিলই না, অধিকন্তু যোড়হাত করিয়া নানা প্রকার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির সময় উপস্থিত জানিয়া রাজা অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাদিগকে লইয়া আরত্রিকদর্শনে গেলেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও তাঁহার সেবাপরিপাটী দর্শনে তিনজনেই প্রেমবিহ্বলভাবে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। কৃষ্ণকৃপায় রাজা পাত্রমিত্র বন্ধুবান্ধব সকলকে লইয়া সেই সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ করিতে লাগিলেন এমন সময় এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। ঠাকুরের কণ্ঠ হইতে একছড়া ফুলের মালা আসিয়া আচম্বিত নরসীর গলায় পড়িল। সকলেতো দেখিয়া অবাক। এইবার রাজা ও পাত্র মিত্র সকলেই বুঝিল এ সামান্য লোক নয়। তাই নানাবিধ প্রসাদ মিষ্টান্নাদিদ্বারা তিনজনকে পরিতোষ পূর্ব্বক সেবা করাইয়া নগরের সর্ব্বত্র ঢেঁড়া পিটাইয়া দিলেন—

> "নরসী সাধুর উপহাস যে করিব।
> অপযশ কহি দুষ্টকরি যে মানিব॥
> তার দণ্ড হবে, ঘর সর্ব্বস্ব লুটিয়া।
> মস্তক মুণ্ডন করি দিব খেদাড়িয়া॥
> তখন জানিল লোক নরসীর মহিমা।
> দুইকন্যা আর তেঁহ নিষ্পাপের সীমা॥"

ধন্য ভক্ত, তুমিই ধন্য! আমি মায়ার দাস হইয়া বিষয়ের কীট হইয়া রহিলাম, তোমার পদধূলি ধারণ করিয়া ধন্য হইতে পারিলাম না। কৃপা কর, যেন তোমার দাসানুদাসের সঙ্গ পাইয়া জীবন ধন্য করিতে পারি। ভক্ত নরসীর জীবনে এরূপ বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল; ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে আমরা তাহা জানিতে পারি। ভক্তির পাঠকগণকে তাহার মধ্য হইতে দু'একটী শুনাইয়াই আজ বিদায় লইলাম।

দীন—শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শাস্ত্র-বাণী

দেবোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কৃপা নিমিত্ত তদীয় ভক্তজনের সঙ্গ হইতে ভক্তিমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সৎ গুরুর আশ্রয় লইতে হইবে। যদি বল বিষয়াসক্ত ব্যক্তির উল্লিখিত জ্ঞান অতিশয় দুর্ঘট, অতএব কেন তাহাদের ভক্তি বিষয়ে ইচ্ছা হইবে? ইহার উত্তর এই যে, দুঃখ সাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় ভক্তি বাঞ্ছা করিলে অবশ্যই সদগুরুর অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহলোকে নিত্য দুঃখ পরম্পরা অনুভব করিতে হয় এবং শাস্ত্রে শুনা যায় পরলোকেতেও ঐ দুঃসহা দুঃখশ্রেণী ভোগ হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে, দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন এবিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক কি। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্য মর্থদ মনিত্য মপীহ ধীরঃ
তূর্ণং যতেত নপতেদনুমৃত্যু যাব—
ন্নিঃ শ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলুসর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ ভাঃ ১১।৯।২৯

ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের পর পুরুষার্থ প্রাপক, অনিত্য এই দুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত না হয় সেই পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে মুক্তি লাভ নিমিত্ত যত্ন করিবেন, যেহেতু বিষয় পুনর্ব্বার পশ্বাদি যোনিতেও লাভ হইতে পারে। পুনরায় ভগবান পরম ভক্ত উদ্ধবকে বলিতেছেন—

নৃদেহ মাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারং।
ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ভাঃ ১১।২০।২৭।

হে উদ্ধব! ফল ভোগের মূল, যদৃচ্ছালব্ধ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধার বিশিষ্ট, অনুকূল বায়ুরূপ আমা কর্তৃক প্রেরিত দুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ রূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও যে পুরুষ ভবসাগর পার না হয় সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতী।

যে সকল ব্যক্তি উপায় স্বরূপ শ্রীগুরুচরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণ সকলকে বশীভূত করিয়াই ইহলোকে চঞ্চল অশান্ত মনকে সংযত

করিতে যত্ন করে, তাহারা কর্ণধার শূন্য নৌকাশ্রিত বণিকগণের মহাসমুদ্রে পতনের ন্যায় বহু দুঃখে আকুল হইয়া সংসার সমুদ্রে পতিত হয়।

স্বীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্য সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে এবং সংসার হইতে ত্রাণ হইবার জন্য শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিবে—

ত্রাহ্যাস্ব ভো জগন্নাথ গুরোসংসার বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বমহং শরণং গত॥ (বৈষ্ণবতন্ত্র)

হে জগন্নাথ, হে গুরো, আমি সংসারাগ্নিতে দগ্ধ, কাল আমাকে দংশন করিয়াছে, অতএব আমাকে ত্রাণ করুন, আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।

দীক্ষার পর শিষ্য গুরুদেবের নিকট—সর্ব্বাগ্রে সদাচার শিক্ষা করিয়া সদাচার অভ্যাস করিবে।

যেহেতু সদাচার ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির কোন কার্য্যই সিদ্ধি হয় না, সেই কারণ সকল বিষয়ে সদাচারের আবশ্যক করে। গৃহস্থ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা আচার প্রতিপালন করিবে, আচার হীন হইলে তাহার ইহলোক বা পরোলোক কোন লোকেই সুখ লাভ হয় না। যে পুরুষ সদাচার লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করেন যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি তাহার মঙ্গল করিতে সমর্থ হয় না। যেমন নর-কপাল অথবা কুক্কুর চর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্রের জল আধার দোষে দূষিত হয়, তদ্রূপ সদাচার হীন ব্যক্তির শুভ অথাৎ তীর্থ পর্য্যটনাদি পুণ্য কর্ম্ম দুষিত হয়। যে ব্যক্তি আচার হীন, ইহকালে ও পরকালে তাহার আনন্দ নাই। ভবিষ্য পুরাণের উত্তর খণ্ডে সদাচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

আচার প্রভবোধর্ম্ম সন্তশ্চাচার লক্ষণাঃ
সাধূনাঞ্চ যথা বৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে।
তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সদাচারং যইচ্ছেদ্গতি মাত্মনঃ।
সর্ব্ব লক্ষণ হীনোপি সম্যগাচার বান্নৃপ।
শ্রদ্ধধ নেহনসূয়শ্চ সর্ব্বান কামান বাপ্নুয়াৎ।

ধর্ম্ম আচার হইতে উৎপন্ন হয়, সাধুগণ আচার সম্পন্ন. সাধু সকল যেরূপ আচার করিয়া থাকেন তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত হয়। অতএব যিনি আপনার সদ্গতি ইচ্ছা করেন, তিনি সদাচার পরায়ণ, শ্রদ্ধাশীল ও অসূয়া বর্জ্জিত হইবেন। তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় কামনা পূর্ণ হয় অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই সুসিদ্ধ হইবে।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবেন। পরে আচমন করিয়া রাত্রির বসন পরিত্যাগ করতঃ অন্য বসন পরিধান করিয়া পুনরায় দুই বার আচমন করিবে অনন্তর অন্তর্বাহ্য শুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া মস্তকে শ্রীগুরুদেবের চরণদ্বয় ধ্যান ও স্তব করতঃ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া নিম্ন লিখিত শ্লোক পাঠ করিবে।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ভাঃ॥ ১০।৯০.৪৮
স্মৃতেঃ সকল কল্যাণে ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥
বিদগ্ধ গোপাল বিলাসিনীনং সম্ভোগ চিহ্নাঙ্কিত সর্ব্বগাত্রং।
পবিত্র মাম্নায় গিরাম গম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীত চৌরং॥
ভাঃ ১০।৯০.২৪
উদ্গায়ত্রী নামরবিন্দ লোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবস স্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন শব্দ মিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশাম মঙ্গলং॥
ভাঃ ১০।৬৪।৩৫

অর্থাৎ যিনি সমস্ত জীব মধ্যে অন্তর্যামি রূপে নিবাস করিতেছেন, দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা যাঁহার অপবাদ, যিনি স্থাবর জঙ্গমের দুঃখনাশন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদুবর পার্ষদরূপ হস্ত দ্বারা পৃথিবীর অধর্ম্ম নাশ করতঃ ও সহাস্য বদন দ্বারা ব্রজপুর বনিতাদিগের অনঙ্গ বর্দ্ধন করতঃ জয়যুক্ত হউন। যাঁহাকে স্মরণ করিলে সকল কল্যানের পাত্র হওয়া যায়, সেই অজ অর্থাৎ প্রকৃত জন্মরহিত, নিত্যস্বরূপ শ্রীহরির শরণাগত হই।

যিনি পবিত্র বেদবাক্যের অগোচর পরব্রহ্ম অথচ রসময়ী গোপ রমণীদিগের নখক্ষতাদি চিহ্ন দ্বারা যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অঙ্কিত, সেই নবনীত চৌরের শরণাপন্ন হই। ব্রজাঙ্গনা সকল উচ্চৈঃস্বরে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের গান করাতে তাহার ধ্বনি দধি মন্থন ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া গগন মণ্ডল স্পর্শ করিল। সেই ধ্বনি সামান্য নহে, তাহাতে দিক্ সকলের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও নাম স্মরণাদি এই প্রকারে কৃত হইলে তাহা সর্ব্বতীর্থের স্নানের ফল

প্রদান এবং বাহ্য ও অন্তর বিশুদ্ধ করে। সর্ব্বতীর্থ স্নান অপেক্ষা স্মরণের মাহাত্ম্য অধিক। স্মার্ত্তেরাও কহিয়াছেন,—যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ তাঁহারা প্রাতঃস্মরণ অবশ্য করিবেন আর যাঁহারা কেবল স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করেন তাঁহারাও প্রাতঃস্মরণকে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং প্রাতঃস্মরণ সর্ব্ববাদি সম্মত।

স্নান সপ্ত প্রকার

মান্ত্রং পার্থিব মাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসংচেতি স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতং।
শন্ন আপস্তু বৈমান্ত্রং মৃদালম্ভস্তু পার্থিবং।
ভস্মনাস্নান মাগ্নেয়ং স্নানং গোরজ সানিলং।
আতপে সতি যা বৃষ্টি দিব্যং স্নানং তদুচ্যতে।
বহির্নদ্যাদিষুস্নাম বারুণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ণো র্মানসং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস এই সপ্ত প্রকারের স্নান শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

বৈদিক সন্ধ্যার প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে স্নান তাহার নাম মান্ত্র স্নান। মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া যে স্নান তাহার নাম পার্থিব স্নান। ভস্ম দ্বারা যে স্নান তাহার নাম আগ্নেয় স্নান। গোধূলি দ্বারা যে স্নান তাহার নাম বায়ব্য স্নান। রৌদ্র থাকিতে যে বৃষ্টি হয় তাহার দ্বারা স্নান করাকে দিব্য স্নান বলে। বাহিরে নদ্যাদিতে যে স্নান পণ্ডিতেরা তাহাকে বারুণ স্নান কহেন। আর মনোমধ্যে যে বিষ্ণু স্মরণ তাহা মানস স্নান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যদি অতিশয় দুস্তর বিবিধ পাপেও দূষিত হয় তাহা হইলেও মনোমধ্যে বিষ্ণুস্মরণ করিলেই বাহ্য ও অভ্যন্তর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

যত প্রায়শ্চিত্ত, যত তপস্যা, যত দান ও ব্রতাদি কর্ম্ম আছে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ সে সমুদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হরিকে একবার মাত্র স্মরণ করিলে সদ্য সদ্যই মনুষ্যগণের নরক যাতনার উৎপাদক অতি ভয়ানক পাপ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কৃতঃ পাপ সঞ্চয়ঃ।
সোঽপ্যশেষঃ ক্ষয়ং যাতি স্মৃত্বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পঙ্কজম্।

কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের চরণার বিন্দ স্মরণ করিলে সে সকল পাপই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

ত্রিষ্টি সকল, ব্যতিপাত সকল তথা অন্যান্য যে সকল দুঃখপ্রদ আছে, বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রেই ঐ সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়—দেব বিষয়ে, যজ্ঞ বিষয়ে, ইষ্ট কর্ম্ম বিষয়ে, পূর্ত্ত কর্ম্ম বিষয়ে মনুষ্যের পক্ষে যাহা উপদেশ আছে, বিষ্ণু স্মরণ করিলে সে সমুদায়েরই ফল হইয়া থাকে। কলিতে বেদ বিহিত কর্ম্ম সকলের অবশ্যই অল্পতা ও আধিক্য হইয়া থাকে কিন্তু এ বিষয়ে হরিস্মরণ সম্পূর্ণ ফল প্রদান করে। স্মৃতিতেও বলিতেছেন—

প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষুযৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ॥

যজ্ঞেতে কর্ম্ম কর্ত্তাদিগের প্রমাদ বশতঃ যে কর্ম্মের অঙ্গ হানি হয় বিষ্ণু স্মরণ করিলে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

জরাসন্ধ নিরুদ্ধ রাজগণের প্রার্থনা, ভাগবতে দশম স্কন্ধের ৭৩ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে বর্ণনা আছে যথা—

তৎনঃ সমাদি শোপায়ং যেনতে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতি র্যথানবিরমেদপি সংসরতামিহ॥

হে ভগবন! এক্ষণে আমাদিগকে এমত কোন উপদেশ করুন যাহাতে সংসারী হইয়া থাকিলেও আপনার চরণ কমলে স্মৃতির বিরাম না হয়।

অমিত তেজস্বী দেবদেব বিষ্ণুর সঙ্কীর্ত্তন মাত্রে যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল ভূত, প্রেত, বিনায়ক ডাকিনীগণ ও অন্যান্য হিংসকগণ পলায়ন করে, অতএব হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বানর্থ হর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কলিকাল কুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মাভয়ং।
গোবিন্দং নামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্॥ (স্কন্দপুরাণে)

কলিকালের তীক্ষ্ণদংষ্ট্রশালী কুৎসিত সর্পের ভয়নাই; সে গোবিন্দ নামরূপ দাবানলে দগ্ধ হইয়া ভস্মত্ব প্রাপ্ত হইবে।

হরিনাম পরাযে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ ন কলির্ব্বাধতে হি তান॥

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতিরটন্তি যেনিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ (বৃ'ন্নারদীয়পুরাণ)

ঘোর কলিযুগে যে সকল মনুষ্য হরিনাম পরায়ণ নিশ্চয়ই তাহারা কৃত কৃত্য। তাহাদিগকে কলিবাধা দিতে পারে না। হে হরে, হে কেশব, হে গোবিন্দ, হে বাসুদেব, হে জগন্ময়, যাঁহারা নিরন্তর এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন তাহাদিগকে কলি বাধা যুক্ত করে না;

যেঽহর্নিশং জগদ্ধাতুর্ব্বাসুদেবস্য কীর্ত্তনং
কুর্ব্বন্তি তান্ নব ব্যাঘ্র ন কলির্ব্বাধতে নরান্॥ (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)

হে নরশ্রেষ্ঠ, যাঁহারা দিবারাত্র জগদ্বিধাতা বাসুদেবের কীর্ত্তন করেন তাহাদিগকে কলি বাধা দিতে পারেনা।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥ (বিষ্ণুপুরাণে)

সত্যযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয় কলিযুগে কেশবের নাম কীর্ত্তন করিয়া তাহাই লাভ হয়।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ;
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥ ভাঃ ১২।৩.৪১

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিলে মুক্তহয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলে মুক্তহয়, দ্বাপরযুগেবিষ্ণুর সেবায় মুক্তহয়, আর কলিযুগে কেবল হরিকীর্ত্তন দ্বারাই জীব মুক্ত হইয়া থাকে।

নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে এরূপ প্রমাণের অভাব নাই কিন্তু বিশ্বাস না হইলে কেবল প্রমাণ দেখাইয়া কি হইবে? যাহা হউক নামে বিশ্বাস করিয়া নাম গ্রহণ করিয়া সকলে আনন্দ লাভ করুন। আমিও আপনাদের সহিত সেই আনন্দের অংশ লাভে ধন্য হই। হরিবোল! হরিবোল!!

শ্রীনন্দলাল ঠাকুর।

গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর

ভারতের ভাগ্যাকাশে সেই অকলঙ্ক শশীর উদয়—যাঁহার পদধূলি সংস্পর্শে কত পবিত্র তীর্থের উদ্ভব ও কত সামান্য ব্যক্তিও সিদ্ধ হইয়াছিল। মনে হয় সে আজ কতদিনের কথা। যাহার তরুণ জীবনের গোলকের মাধুরী দেখিয়া নদীয়া ভাসিয়া শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়া ছিল—সমগ্র নরনারীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া প্রেমের পুলক শিহরণ জাগিয়াছিল। এখন মনে হয় সে আজ কতদিনের কথা।

তাঁহার নামের সহিত কত সুখ-স্মৃতিই যে মনোমধ্যে উদিত হয় তাহা আর বলিয়া শেষ করিবার নহে। মনে পড়ে সেই ঠাকুর গোবিন্দ ঘোষের কথা—যিনি তাঁহার অভয় পাদপদ্ম সমীপে কেমন মধুর ভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। বড় সাধ হইতেছে সে পবিত্র কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে এ পাপ-তাপে উত্তপ্ত জীবন শীতল করিয়া লইব।

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া সহরের পাঁচ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অজয় নদীর তীরবর্ত্তী কুলাই গ্রামে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের জন্ম হয়।

শ্রীযুক্ত প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় দ্বাবিংশভাগ—প্রথম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা বড়ই মূল্যবান। ভক্তির প্রিয় পাঠকগণকে তাহার কিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি।—

"প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা মহাপ্রভুর পার্ষদ বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে এই স্থান (কুলাই) প্রসিদ্ধ। ঘোষ ঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণার যশোড়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বল্লভ ঘোষ- বাইশটী করণ করিয়া উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"যসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে বসতি।
বাইশ বল্লভ ঘোষ নাম হইল খ্যাতি॥" (কুলপঞ্জি)

এই বল্লভ ঘোষের ৯ পুত্র - ১ম পক্ষে বাসুদেব, গোপাল ও মাধব। ২য় পক্ষে দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন এবং ৩য় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন

করেন। * * * কংসারি ঘোষের সন্তানেরা অদ্যাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই ঘোষ বংশেই দিনাজপুরের মহারাজা সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়বাহাদুর জন্মলাভ করেন।

"কুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থান ও তাহার একপোয়া উত্তরে গ্রামের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতির বাসচিহ্ন আছে। এখানে বাসুদেব ঘোষ যে নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই নিম্ববৃক্ষ লইয়া গিয়াই মহাপ্রভুর বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাটোয়ায়, কাহারও মতে শ্রীখণ্ডে বর্ত্তমান।

কাশীপুর বিষ্ণুতলায় সিংহবংশে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের বিবাহ হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয় তখন তিনি পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন, সন্তানাদিও ছিল না, চক্ষু হইতে ক্রমশঃ মোহের বন্ধন কাটিয়া গেল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মনিয়োগ করিয়া পরমানন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।"

* * *

বহুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচল হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে ফিরিতেছেন। জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিবেন ইহাই তাঁহার বাসনা। একবার আসিয়া দর্শন দিবেন ইহাই যে তিনি তাঁহার মায়ের নিকট প্রতিশ্রুত। প্রভু আসিতেছেন, আর সমভিব্যাহারে অসংখ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে আসিতেছে। এ বিপুল লোক-সংঘট্টের মধ্যে পথে তিনি একদিনের তরেও বিশ্রাম করিতে পান নাই।

সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপে বাস করেন। তিনি যেমন ভক্ত আবার তেমনই ভাগ্যবান। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ একদা গোপনে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ভক্তের সহিত তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতিকে অতিথি পাইয়া প্রভুভক্ত বাচস্পতির যে কি আনন্দ হইল তাহা আর বলিবার নহে। তিনি যে কি বলিয়া প্রভুকে অভ্যর্থনা করিবেন তাহা আর খুঁজিয়া পাইতেছেন না। প্রভু তখন তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া মধুর বচনে বলিতেছেন—

"চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কতদিন গঙ্গাস্নান করিব এথাতে॥

নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান।
যেন কতদিন মুঞি করো গঙ্গাস্নান ॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা ॥*

শ্রীগৌরাঙ্গের বাক্যে পণ্ডিত বড়ই আনন্দিত হইলেন। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন

ভাগ্য সব বংশের আমার।
যথায় চরণধূলি আইল তোমার ॥
মোর ঘর দ্বারে যত সকলি তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহ না জানিবে আর ॥

কিন্তু তাহাও কি কথন হয়? সূর্য্যের উদয় কথনও কি গোপনে থাকে? শ্রীগৌরাঙ্গকে পাইয়া সগোষ্ঠি বাচস্পতির অস্বাভাবিক আনন্দ দৃষ্টে সকলেই অনুভব করিতে লাগিল কি যেন ঘটিয়াছে। ক্রমে চারিদিক হইতে ধ্বনি হইল সন্ন্যাসী শিরোমণি নবদ্বীপে আসিয়া বাচস্পতির গৃহে লুকাইয়া আছেন।

শুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হইল বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥

আনন্দে সকলেই তখন হরি হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। স্ত্রী পুত্র দেহ গেহ আর তাহাদের মনে রহিল না। সকলেই কোলাহল করিতেছেন, সকলেরই চিত্ত তাঁহার চরণ যুগল দেখিবার জন্ম উন্মত্ত।

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি হরি হরি।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

সে অপূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত করিবার শক্তি আমার নাই। কবি বৃন্দাবন দাসের অমর তুলিকায় তাহা সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। মোট কথা প্রভু বৃন্দাবন দর্শনে চলিয়াছেন আর তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে অনন্ত অর্ব্বুদ লোক যাইতেছে। তাহাতে এত কলরব হইয়াছিল যে গৌড়ীয় পাদশা পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। এক কুলিয়ার যে জনতা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ম ভাগবতকার বলিতেছেন—

কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় বর্ণন।
কেবল বলিতে পারে সহস্র বদন ॥

হেন অপরূপ ঘটনা এক শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে ব্যতীত জগতে অপর কুত্রাপি সংঘটিত হয় নাই।

প্রভু শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে চলিয়াছেন, সঙ্গে বহুতর লোক যাইতেছে, তন্মধ্যে গোবিন্দ ঘোষও আছেন। একদিন তিনি ভোজন করিয়া মুখ শুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন, গোবিন্দ ঘোষ নিকটে ছিলেন; ছুটিয়া গ্রামের ভিতর হইতে হরিতকী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এক টুকরা প্রভুর হস্তে দিলেন। পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা * করিলেন, আহারান্তে তিনি হাত বাড়াইলেন, আর গোবিন্দ তাঁহার বহির্ব্বাসে পূর্ব্বদিনের হরিতকী খণ্ড টুকু যাহা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ প্রভুর হস্তে দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যেন চমকিত হইলেন, বলিলেন, গোবিন্দ তুমি কাল যখন আমায় মুখশুদ্ধি দিয়াছিলে তখন কিছু বিলম্ব হইয়াছিল কিন্তু আজ চাহিবামাত্র কোথা হইতে পাইলে? গোবিন্দ বলিলেন ,প্রভু, কল্য যে হরিতকী পাইয়াছিলাম তাহার কিঞ্চিৎ রাখিয়াছিলাম অদ্য তাহাই দিলাম।

প্রভু ভক্তের সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বলিলেন, আজ হইতে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব। যেহেতু তোমার সঞ্চয় বাসনা যায় নাই। গোবিন্দ ইহাতে স্তম্ভিত হইলেন, তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

দয়াল প্রভু তখন বলিতেছেন, গোবিন্দ তুমি আমার অতীব প্রিয়; তুমি দুঃখিত হইওনা, আমার নির্দ্দেশ মত তুমি এইখানেই থাক তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য সাধিত হইবে—ভগবান যে ভক্তেরই, জগদ্বাসী তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবে।

গোবিন্দ প্রভুকে বড়ই ভাল বাসেন—একতিল না দেখিয়া থাকিতে পারেন না—অতীব শোক তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

দীনদয়ার্দ্র নাথ তখন বড়ই কোমল হইলেন। ভক্তের উত্তপ্ত গাত্রে তাঁহার অভয় হস্ত সঞ্চালন করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন—গোবিন্দ, সক্ষম বলিয়া তোমাকে এ বিরহ জনিত দুঃখ সহিতে দিলাম, আমি সত্বর ফিরিব, সেবার আর তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। যখন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে তাহার পর তুমি আমার দর্শন পাইবে।

সুতরাং গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে রহিয়া গেলেন। প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায়, দিন কাটিতেছে। এইরূপে কতদিন গেল তিনি গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে একখানি কুটির বাঁধিয়া দিবানিশি সাধন ভজনে নিযুক্ত রহিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদিন তিনি গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি কাষ্ঠ আসিয়া বার বার তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। ইহাতে

* সন্ন্যাসীর ভোজনকে ভিক্ষা বলে।

তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি সেখানিকে. শব দাহের কাষ্ঠ ভাবিয়া তীরে রাখিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোবিন্দ, সামান্ত কাষ্ঠ ভাবিয়া যেখানি তুমি ফেলিয়া দিয়াছিলে সে খানি যত্ন করিয়া রাখিয়া দাও। স্বপ্ন দর্শনে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই কাষ্ঠ খানি আনিতে গেলেন। তখন চারিদিক ঘোর অন্ধকার, তিনি সেই কাষ্ঠ খানি আনিয়া যত্নপূর্ব্বক গৃহে রাখিয়া দিলেন। প্রভাতে উঠিয়া তিনি দেখিতেছেন সেখানি কাষ্ঠ নহে একখনি সমুজ্জল প্রস্তর।

গোবিন্দ ইহাতে বড়ই বিস্মিত হইলেন। ইহার পর হইতে প্রত্যহই তিনি প্রভুকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার পর সত্য সত্যই প্রভু একদিন দলবল সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে দেখিয়া গোবিন্দ কত যে আনন্দিত হইলেন তাহা বলিবার নহে। তাহার পর তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—কিরূপে সকলকে ভিক্ষা করাইবেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ আর ব্যস্ত থাকিতে হইল না, শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন সংবাদে যাহার যাহা কিছু ছিল তাহাই লইয়া গ্রামবাসীগণ আসিতে লাগিল। সে কি এক অপরূপ দৃশ্য! প্রভু ভিক্ষা করিলে সকলেই প্রসাদ পাইল।

অন্তর্য্যামী ভগবান গোবিন্দের প্রস্তর প্রাপ্তি সংবাদ সমস্তই জানেন, তিনি বলিলেন, কাল একজন ভাস্কর আসিয়া ঐ প্রস্তর হইতে শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া দিবে। আমি স্বহস্তে তাহা স্থাপন করিয়া দিব। আর তুমি তাহার সেবাইত হইবে।

পর দিবস প্রাতে জনৈক অ রিচিত ভাস্কর আসিয়া প্রভুর আদেশ মত একটী সুন্দর শ্রীমুর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। প্রভু শ্রীহস্তে ঐ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া "গোপীনাথ" নাম রাখিলেন। গোবিন্দের জীবিত কাল হইতেই অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, গোবিন্দ এই ঠাকুর আমি তোমায় দিয়া গেলাম, তুমি মন দিয়া ইহার সেবা করিয়া আমার বিরাগ জনিত দুঃখ দূর কর। এবার আসিয়া আমি তোমার নিকট আসিব বলিয়া ছিলাম, এই গোপীনাথই আমার অভিন্ন কলেবর বলিয়া জানিবে।

শ্রীগোবিন্দ কিন্তু ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না, তিনি প্রভু অন্তঃপ্রাণ। তিনি সচল গোপীনাথ চাহেন, অচল চাহেন না।

প্রভু তখন বড়ই মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন, "দেখ গোবিন্দ, তুমি মনে কিছু দ্বিধা করিও না। আমি তোমার নিকটেই রহিলাম, তুমি যত্নের সহিত আমার সেবা কর, আর বিবাহ কর। তোমার দ্বারা জগদ্বাসীকে ভক্তের মহিমা প্রদর্শিত হইবে। তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর।" ইহার পর প্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর (কারণ ইহার পর হইতে তিনি ঠাকুর নামেই প্রসিদ্ধ হন) গোপীনাথের সহিত অগ্র দ্বীপে রহিয়া গেলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ আদেশ তিনি অবহেলা করিতে পারিলেন না। তাহাকে বিবাহ করিতে হইল। ক্রমশঃ তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু পুত্রটী জন্মিবার কিছুদিন পরেই তাঁহার স্ত্রীর কাল হইল।

গোবিন্দ স্বীয় পুত্র ও গোপীনাথ উভয়কেই সমস্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি রসিক শেখর, ষোল আনা প্রেম না দিলে যে তাঁহার মন উঠে না।

"যে করে আমার আশ তারি করি সর্ব্বনাশ।
তবুও যে করে আশ, তার হই দাসের দাস॥"

গোপীনাথ দেখিতেছেন, যদিও গোবিন্দের চিত্ত তাঁহার প্রতি পূর্ণ ভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অপর দিকে তাঁহার পুত্র আবার তাহাকে সমভাবে আকর্ষণ করিতে হয়। উহাতে তিনি এক রঙ্গ উঠাইলেন,—গোবিন্দের পুত্রটীকে ইহ জগৎ হইতে অপঃসৃত করিলেন।

গোবিন্দের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি সমগ্র জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। ভাবিতেছেন, তবে আর জীবন ধারনের আবশ্যক কি। আর যে ঠাকুর এত নিষ্ঠুর তাহাকে ভজন করিয়াই বা ফল কি?

তিনি ঠাকুরের নিকট হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন, ইচ্ছা ঐ অবস্থাতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।

ঠাকুরের প্রতি গোবিন্দের কিন্তু অহেতুকী ভক্তি জন্মিয়াছে। গোপীনাথ সমস্ত দিন উপবাসী আছেন। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, বেশ হইয়াছে তিনি যেমন আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তেমনি এইবার উপবাসী থাকিয়া মজা দেখুন। আমিও এইভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি?

গোপীনাথ গোবিন্দের এই মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইলেন। ইহা যে ভগবানের প্রতি ভক্তের অভিমান। যেথানে ভালবাসার আদান প্রদান আছে সেইখানে যে

অভিমান চলে। ভক্তের কাতরতায় ভগবান বড়ই ব্যাকুল হইলেন। রাত্রে তিনি মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন, "বাপ, সারাদিন উপবাসী রহিয়াছি ক্ষুধায় যে প্রাণ গেল।" গোবিন্দের প্রথম মনে হইল বোধ হয় তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু ক্রমশঃ স্পষ্টই প্রতীত হইল, গোপীনাথ সত্যই কথা কহিতেছেন, কিন্তু গোবিন্দ ইহাতে নরম হইলেন না। তিনি বলিলেন পুত্র শোকে আমার চিত্ত স্থির নহে, আমার দ্বারা তোমার সেবা কি প্রকারে চলিতে পারে? ঠাকুর বলিলেন, "বাপ! পুত্র বিয়োগ কি কাহারও হয় না। তোমার দুই পুত্র ছিল, একজন গিয়াছে, এক্ষণে আমি আছি।"

গোবিন্দ একথা শুনিয়া যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তিনি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সত্যই গোপীনাথ তাহার পুত্র হইতে স্বীকৃত হইতেছেন। তিনি তখন তাহার সন্দেহ নিবারণের জন্য বলিতেছেন, হে ঠাকুর ইহা কি সত্য, আর যদি তাহাই হয় তাহাহইলে তুমি কি আমার শেষের সে দিনের কার্য্য করিবে? গোপীনাথ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন।

গোবিন্দের তখন আনন্দের সীমা নাই। তিনি তখন উল্লাস ভরে ভোগ রন্ধন করিতে গমন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের দেহ ত্যাগ হয়। ঐ সময়ে তাঁহার বহু সংখ্যক শিষ্য হইয়াছিল ও প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন।

গ্রামের এক পার্শ্বে তাঁহার দেহের সমাধি দেওয়া হইল। তাঁহার জন্য রোদন করিবে এমন আত্মীয় কেহ ছিল না। শিষ্যগণই নিদারুণ শোকে রোদন করিতে লাগিলেন।

নূতন সেবাইতকে গোপীনাথ রাত্রে স্বপ্নে বলিলেন,—দেখ, গোবিন্দ ঘোষ আমার বাপ ছিলেন, আমি একমাস অশৌচ গ্রহণ করিব এবং হবিষ্যান্ন খাইব। তুমি কল্য হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিবে।" সেবাইত প্রাতে সকলের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়া রাখিলেন, সকলেই গোবিন্দ ঘোষ এবং তাঁহার ঠাকুরকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। আর সকলের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশের উপর আর কি কথা আছে।

একথা ক্রমশঃই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। চৈত্রমাস, কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ হইল। বহুদেশ হইতে লোক আসিয়া সমবেত হইল। সেই জনতার মধ্যে শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশের অঙ্গুরী পরাইয়া ঠাকুরকে আনয়ন করা হইল। এ দৃশ্য দেখিয়া কেহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সকলেই

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, আর ভাবে মগ্ন হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

গোপীনাথ সকলের সম্মুখে তাঁহার পিতার পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার আয়ত নেত্র হইতে জল বিন্দু ক্ষরিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

গোলকগত শিশির বাবু তাঁহার অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থে বলিতেছেন,—শ্রীভগবানের এই অপরূপ লীলা অদ্যাবধি অগ্রদ্বীপে বৎসর বৎসর হইতেছে। আর এখনও একান্ত ভক্তগণ এই পিণ্ডদান রূপ কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। যদি গোবিন্দ ঘোষের ঔরস পুত্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে বড় না হয় বিংশতি বৎসর পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করিতেন। কিন্তু গোপীনাথ চারিশত বৎসর গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিলেন। এইরূপ পিতৃভক্ত পুত্র কেবল গোপীনাথই হইতে পারেন। জীবগণ কি নির্ব্বোধ! কি মূঢ়মতি। এরূপ প্রভুকেও ভুলিয়া থাকে।"

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ (১৩)

(শ্যামদাদার পানিহাটিতে আগমন)

নবদ্বীপ দাদার কৃপায় আমাদের গৃহে অনেক ভক্তের পদরজ প'ড়তো। শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীশ্রীরাঘব ভবন ও বৃক্ষ রাজ দর্শন ক'রতে প্রায়ই নানা স্থান হইতে ভক্তের আগমন হ'তো, ঐ সব ভক্তদের মধ্যে অনেকেই দয়া ক'রে আমাদের গৃহে পদধূলি দিয়ে যেতেন। একদিন পুলীন দাদা শ্যামদাদাকে আমাদের বাড়ীতে এনেছিলেন। শ্যামদাদা পূর্ব্বাশ্রমে শিক্ষিত এবং ভদ্রবংশোদ্ভব ছিলেন। ইনি অনেক দিন শ্রীবৃন্দাবনে ভজন করিয়াছেন। এখন ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাজ বাড়ীতে পূজ্যপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী দাদা মহাশয়ের নিকট থাকেন।

শ্যামদাদার সঙ্গে মেলা মেসাতে আমাদের কিছু মাত্র ভয় হ'তো না। তিনি আমাদের ঠিক ছোট ভাইয়ের মত দেখ্তেন, তাঁর মুখে শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের মহিমার কথা বিস্তর শ্রবণ করি। দু'চারটী মনে আছে।—

(ক) তিনি বল্লেন,—"একদিন ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়কে বলি—"কিছু দেখ্তে পেলেম না।" বাবাজী মহাশয় হেঁসে বল্লেন "দেখ্বি ?" তার পর তাঁর সঙ্গে রাত্রে সমুদ্রের ধারে যাই, তিনি এক স্থানে বসে বলিলেন, আমি নিকটেই রইলাম, খানিক বাদে বোধ হ'তে লাগলো কে যেন বাবাজী মহাশয়ের নিকট এসেছেন আর তাঁর সঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের কথা বার্ত্তা হ'চ্চে। আমি কিছু দেখতে না পেলেও যেন একজনের আগমন বেশ স্পষ্ট করে অনুভব হতে লাগ্লো।"

(খ) "একদিন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয় আমৃলি তলায় বসে

আছেন, (যে আম্‌লি তলা হ'তে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীযমুনা দর্শন ক'রে ছিলেন)—এমন সময়ে তন্দ্রাভঙ্গের মত হ'য়ে বলে উঠলেন—শ্যামদাদা! ত্রিপুটী ভেদ "না হ'লে বৃন্দাবন দর্শন হয় না।" এই ব'লেই চুপ ক'রে রইলেন।"

আমরা "ত্রিপুটী" কাকে বলে তাই-ই জানিনা, শ্যামদাদার মুখে এই নূতন শুন্‌লাম। অনেকদিন পরে এক খানি পুস্তকে ঐ ত্রিপুটীর কথা প'ড়ে মনে হ'য়েছিলো কেন বাবাজী মহাশয় ঐ কথা বলেছিলেন। (১)

(গ) আর একটী কথা ব'লেছিলেন, সেটী বাবাজী মহাশয় কি অন্য কাহারও মহিমা তা আমার ঠিক মনে হচ্চে না। শ্যামদাদা বলেছিলেন ;—"একদিন তাঁকে বল্লুম নাম করি, কিন্তু নামে মিষ্টতা কিছু মাত্র পাই না কেন? যাতে মিষ্টতা পাই আর ছাড়তে ইচ্ছা না যায় এমন ক'রে দিতে পারেন? এই কথায় তিনি একস্থানে বসে আমাকে নাম করতে আজ্ঞা করেন, আমি কথামত কিছুক্ষণ নাম করবার পরই দেখি যেন সুধা হতে সুমধুর কোন দ্রব্য আস্বাদ করচি, আর নাম ছাড়তে পারচি না, এই ভাবে অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিলো।

(ঘ) তারপরে শ্রীবৃন্দাবনের কত কথা হ'লে। একদিন বল্লেন,—

"একদিন অন্যের বারণ সত্ত্বেও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল রাঘব গোস্বামীর ভজনগোফায় (এই রাঘব গোস্বামী পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিত হতে ভিন্ন ভক্ত।) ভজন করবার জন্যে ঢুকেছিনু। খানিক ক্ষণ ব'সে নাম করবার পরেই দেখি অন্ধকার গুহা হ'তে দুটী গোলাকার চোখ জ্বলচে, ভালকরে দেখি প্রকাণ্ড সাপ। তাকে দেখেইত আমার প্রাণ শুকিয়ে গেলো, তার দিকে আর চাইবার সাহস রইলো না, পরে কোন মতে সেস্থান থেকে সরে এসে নিস্তার পাই। যে স্থানে মহাভক্তের পদরজ র'য়েছে তার মধ্যে প্রবেশ করা যে বড়ই অন্যায় পরে তা বুঝি।

(ঙ) কুসুম সরোবরে থাকা কালিন শ্যাম দাদার নিকট মধ্যে মধ্যে চোর ডাকাত এসে কত উৎপাৎ করতো তারও কত গল্প হলো।

"ঘরের মধ্যে রাত্রে চোর ঢুকে, চোর ব'লতো শ্যামদাস টাকা দে।" আমিও তাদের ধমক দিয়ে বলতুম—"টাকা দেব বৈ কি? শ্যামদাস এখানে জমিদারী ক'রতে এসেছে তাই তোরা টাকা নিতে এসেচিস।" চোরেরা ঘরের সব স্থান তন্ন তন্ন করে খুঁজে তবে চ'লে যেতো। ঐ স্থানে ভরতপুরের মহারাজার যে কেল্লার মত ঘর আছে, তাতেও মাঝে মাঝে ডাকাত পড়তো বল্লেন। বনবাসী

---

(১) "পন্থা" মাসিক পত্রিকা (১৩১৪। ভাদ্র ১৬৪পৃঃ) "রাসতত্ত্ব" প্রবন্ধে লেখা আছে ;—

"ত্রিপুট ভেদ না হইলে আমরা পরম অক্ষর অনুভলাভ করিতে পারি না। প্রণব মার্গ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জ্ঞান ত্রিপুটীর সীমায় আবদ্ধ। আধ্যাত্ম, আধিভূত ও আধিদৈব এই তিনটী ত্রিপুটী। প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয় আছে। সেই বিষয় অধিভূত, সেই বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য নিজের ইন্দ্রিয় চাই, সেই বহিরিন্দ্রিয় কি অন্তরেন্দ্রিয়—আধ্যাত্ম। সেই ইন্দ্রিয়ের সহকারী দেবতা অধিদেব। আমরা যাহা করি, তাহাও এক ত্রিপুটীর সীমায় আবদ্ধ। ××× ত্রিপুটীর নাশ হইলেই তিনি শান্ত আত্মা। ইত্যাদি।

বাবাজীদের মাসে মাসে রাজা রাজারাজড়ারা টাকা দেন, ঐ টাকাকে "বন্ধনী" বলে। ঠিক ঐ টাকা পাবার সময়েই চোরেরা এসে সব বাবাজীদের ভয় দেখিয়ে টাকা কেড়ে নিয়ে যায়।"

আবার চোরেদের ধর্ম্ম জ্ঞানের কথাও বল্লেন—"কোন বাবাজীর হয়তো কম্বল ও পিতলের লোটা কাছে আছে, চোরেরা এসে—বাবাজীকে গালাগালি দিয়ে বল্লে;—"শালা কম্বল উড়ায়কে ভজন করনে আয়া, দেশালা কম্বল লোটা দে।" এই বলে সে সব কেড়ে নিয়ে আবার পাছে রাত্রিরে বাবাজী শীতে কষ্ট পায় এজন্ত ছেড়া কাঁথা এবং মাটীর জল পাত্র দিয়ে চলে যায়। ভজননিষ্ঠ বাবাজীরা এই ঘটনায় প্রভুর মহিমা বুঝে সন্তুষ্ট থাকেন।

(চ) শ্যামদাদা বল্লেন;—বৃন্দাবনে এমন সব বাবাজী আছেন যাঁরা মায়া কাটাবার জন্য পাখীকেও জল পর্য্যন্ত খেতে দেন না। অর্থাৎ কমণ্ডলুতে জল থাকে, সে জল নিত্য পাখীতে এসে খায় দেখে, পাছে সেই পাখীর উপর মায়া পড়ে এজন্য কমণ্ডলু উপুড় ক'রে রাখেন।" এসব কথা কিন্তু আমাদের ভাল লাগতো না।

(ছ) শ্যামদাদা জল খেতে চাইলে তাকে এক গেলাস জল এনে দিলুম, কিন্তু এক ঢোক জল খেয়েই বল্লেন, "গেলাসে মাছের গন্ধ ছাড়চে।" আমরা মাছ খেতুম। খুব ভাল করে মাজা গেলাস দিলেও দাদা ঠিক গন্ধ পেয়ে ছিলেন। কিন্তু এর জন্যে আমাদের যে ঘৃণা বা ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গেলো বলে হাহুতাস তা কিছু কল্লেন না।

শ্যামদাদা পুলীনদার কাছে অনেক দিন কলিকাতায় ছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয় পরে ৺পুরী ধামে চলে যান। অনেক দিন পরে পুলীনদার মুখে শুনলাম "বাবাজী মহাশয় উন্মাদ হ'য়েছেন, পুলিসে তাঁকে ধ'রে রেখেছে আমি তাঁকে এখানে আনবার জন্যে পুরীতে যাচ্চি।" ঐ সময়ের সমুদয় কাহিনী "চরিত সুধাতে" বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে।

(পুরীধাম হইতে বাবাজী মহাশয়ের বরাহনগরে পুনরায় আগমন।)

প্রেমোন্মাদ অবস্থা

পুলীনদাদা পুরী হ'তে ফিরে আসবার পর একদিন দেখা হ'তে বল্লেন—"বাবাজী মহাশয়কে এনেছি। এখন বরাহনগরে কেদারনাথ কর্ম্মকারের বাগানে আছেন, দেখতে যাবেতো আমার সঙ্গে চলো।"

দাদার কথা শুনে তখুনিই দাদার সঙ্গে বরাহনগরে গেলাম। এই বাগানটী দেখতে তেমন ভাল না হলেও, খুব বড়। গাছ পালা খুব কম। প্রবেশ পথ হতে গৃহ একটুখানি দূর। গৃহের সম্মুখে বা দক্ষিণ দিকে একটী খুব বড় পুকুর। জলটী বেশ পরিষ্কার। গৃহের সম্মুখে ইটের কেয়ারির মধ্যে বাবাজী মশায় রকের উপর একখানি মাদুরে বসে ছিলেন। অটলদাদা কতকগুলি তুলসী চারা নিড়ান দিয়ে রোপন করছিলেন। দাদারা নানা কার্য্যে নিযুক্ত রয়েছিলেন। দরজা হতে ঘরের ভিতরে দেখলুম মহাপ্রভুর খুব বড় বড় চিত্রপট টাঙ্গানো

আছে। একটী মাটীর প্রদীপ তখনও জ্বলচে। ঘরের মেঝে ঘি ও ভূষোতে কাল চটচটে হয়েছে। শুনিলাম এ ঘরে ঘি ঢেলে তার উপর কীর্ত্তন হয়েছিলো। বাবাজী মহাশয় দরজা চেপে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কাকেও বাহিরে বেরুতে দেন নাই। অনেকের গায়ে পর্য্যন্ত কাল দাগ এখনও রয়েছে। আমরা যাবামাত্র আমাকে দেখে তিনি বল্লেন,—"কি কর্ত্তাভজা মশায়! ভাল আছিসতো। আমরা দণ্ডবৎ করে তাঁর কাছে বসলুম। তখন অটল দাদাকে দেখিয়ে বল্লেন—"দেখ ওর কোপ্‌নিতে চড় মেরে দিয়েছি, এইবারে ও গোপী হবে।"

এবারে শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের চেহারা যেন খারাপ দেখ্‌লুম। কৃশ হ'য়েচেন আর শরীর কাল হ'য়েছে। পাগলের মত কথাবার্ত্তাতো কিছু বুঝলুম না। পুলীনদাদাকে বলাতে তিনি বল্‌লেন—বর্ত্তমানে বাবাজী মহাশয়ের যা অবস্থা তার নাম "দিব্যোন্মাদ।"

ঐ সময়ে বাবাজী মশায়কে দর্শন জন্য যারা বাগানে আসবেন তাদের উপর নিয়ম হ'য়েছিলো—জামা, জুতা, হাতের তাগা, এমন কি গলার কণ্ঠিমালা পর্য্যন্ত অর্থাৎ যত কিছু বন্ধন আছে সব খুলে রেখে আসতে হবে। কেবল ব্রাহ্মণদের পৈতা খুল্‌তে হবে না। পুলীনদাদা ও আমি পূর্ব্ব হতেই সে নিয়ম পালন করে বাগানে ঢুকেছিনু।

আবার ঐ সময়ে তিনি বৈদ্যরাজ হ'য়েছিলেন। সকলকেই ঔষধ দিচ্ছিলেন। ঐ অঞ্চলের চারিধারে রটনা হ'য়েছিলো, এক মহাপুরুষ এসেছেন কঠিন কঠিন রোগ তাঁর কৃপায় আরোগ্য হচ্চে। এ জন্য নিত্য চারি ধার হ'তে কতলোক ঔষধ পাবার জন্যে আস্‌চেন।

আমরা যাবার পরে বরাহনগর হ'তে একটী ভদ্র ব্রাহ্মণ বালক বয়স বোধ হয় ১৮।১৯ দিব্য সুন্দর চেহারা, অম্লরোগে কষ্ট পাচ্ছিলো তাই ঔষধ নিতে এসেছে। তার জন্যে বাবাজী মহাশয় যা প্রেস্‌কৃপ্সন্ করলেন সে কিরূপ মজার তা বলচি।

বাবাজী মহাশয় বালককে বল্‌লেন—"বাবা! তুমি ঐ পুষ্করিণীতে প'ড়ে দমভোর জল খাও, আর সাঁতার কাটো। যুবক তৎক্ষণাৎ পুকুরে প'ড়ে জল খেতে ও সাঁতার কাটতে লাগলো। এই পুষ্করিণীর ৩টী ঘাটের নাম করণ করেছিলেন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও ললিতাকুণ্ড খানিক বাদে তাকে বল্লেন—"বাবা! তোমার পরিধেয় কাপড়খানি খুলে তীরেতে ছুড়ে ফেলে দাও। যুবক তাহা করিলেন। তার পরে বল্‌লেন "তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান তাই সূর্য্য অর্ঘ্য দাও। কিন্তু হাটু পর্য্যন্ত জলে থেকে দাঁড়িয়ে অর্ঘ্য দিতে হবে। যুবক আজ্ঞামাত্রেই তাহা করিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থা, কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের ভাব যুবকের মুখে আমরা দেখতে পেলাম না। তার পরে বল্‌লেন "তীরে উঠে তোমার কাপড় পর।" যুবক তৎক্ষণাৎ তীরে উঠে কাপড় পরল। এতক্ষণ পুকুরের মধ্যে ছিলো, তীরে অনেক লোক রয়েছে, তা দেখেও যুবকের কিছুমাত্র বিকার এলো না। তার পরে বল্‌লেন যাও তোমার সব অসুখ সেরে গেলো। যুবক চলে যাবার পরে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন; আমিতো তোর গুরু, তোকে যদি ঐরূপ করতে বলতুম তুই কি পারতিস দেখিদিকি বালকের কি

সুন্দর প্রাণ, কি সরলতা, কি বিশ্বাস। আমি বল্লুম "সত্যই আমি পারতুম না। এর কিছুপরে দুজন স্ত্রীলোক ঔষধ পাবার জন্যে বাগানে এলো, দূর থেকে তাদের দেখেই বাবাজী মহাশয় লাঠী নিয়ে তাড়া করলেন। তারা ভয় পেয়ে কিছুদূর সরে গেল, পুনরায় কাছে এলো। তখন বাবাজী মহাশয় উলঙ্গ হয়ে বসে রইলেন। আর সকলকে বল্‌তে লাগলেন "তাড়িয়ে দে কে এয়েছে বুঝতে পারচিস না? মায়া মায়া।

স্ত্রীলোক দুটী কি কথা বল্‌লে তাতে বাবাজী মশায় চোক লালকরে বল্‌ল "যা এখানে কিছু হবে না মায়াপুরে যা এই বলে পুনরায় তাড়া করাতে তারা চলে গেলো।

তারপরে পুলীনদাদার সঙ্গে সহজ ভাবে অনেক কথাবার্ত্তা হ'লো। আমরা অনেকক্ষণ রইলাম। পরে বাড়ী যাবার জন্যে দুজনে বেরুলুম। আসবার সময় আমাদের "কল্যান কল্পতরু" (শ্রীশ্রীভক্তি বিনোদ কৃত) পুস্তক দিলেন। এই স্থানে কিছুদিন অবস্থানের পরে বোধ হয় তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধামে গমন করে ছিলেন। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! নবদ্বীপ দাদার প্রসঙ্গ আজ বৎসরাধিক কাল বাহির হইতেছে, এখনও অনেক আছে সুতরাং আমরা এই স্থানে এই প্রসঙ্গের প্রথমভাগ সমাপ্ত করিলাম। আগামী সংখ্যা হইতে দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এই হতভাগ্য দেশের জন্য যে সমস্ত কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা যতই পাঠ করি গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে ততই হৃদয় আমাদের অবনত হইয়া পড়ে। তিনি জগদ্বাসীর সমক্ষে ভারতীয় বেদান্ত ধর্ম্মের অতুলনীয় মহিমা প্রচার করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোন প্রসঙ্গ তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে পাঠ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। বর্ত্তমানে আমরা প্রমথ বাবুর "স্বামী বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থ খানি পাঠ করিতেছিলাম তাহাতে এ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি বিবরণ পাইলাম যাহাতে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ভক্তির প্রিয় পাঠকগণকে এখানে তাহার কিছু কিছু উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

"আমেরিকায় তাঁহার বেদান্ত প্রচারের কৃতকার্য্যতা শ্রবণে এদেশের কতকগুলি বৈষ্ণব ভাবিয়াছিলেন বোধ হয় তিনি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের প্রচারে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই এবং সেই জন্য তাঁহার নিন্দা ও তাঁহার কার্য্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একদিন কথায় কথায় বলিলেন 'বাবাজি, আমি একদিন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমেরিকায় এক বক্তৃতা দিই। তাহাতে এত ফল হ'য়েছিল যে, এক অতুল সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিকারিণী যুবতী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন দ্বীপে কৃষ্ণ চিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে

আরম্ভ করিয়াছিলেন।' ত্যাগ সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন 'ত্যাগ চাই। যাহারা ত্যাগ অভ্যাস না করে তাহারা ধীরে ধীরে অধঃপাতে যায়, যেমন বল্লভাচার্য্যের দল!"—(৬৯৩ পৃষ্ঠা।)

আর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন,—"মানুষের প্রাণ যখন ভক্তিতে ভরিয়া উঠে, তখন তার হৃদয় ও স্নায়ু সকল এত নরম হয় যে, তাতে ফুলের ঘা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। তোমরা কি জানো যে আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেম কাহিনী পর্য্যন্ত পড়্‌তে পারি না? ঠাকুরের কথা খানিকক্ষণ বল্‌তে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হ'য়ে থাকৃতে পারি না? সেই জন্যে কেবলই এই ভক্তি স্রোতটা চেপে রাখার চেষ্টা করি, আর জ্ঞানের শেকল দিয়ে নিজকে বাঁধিতে চাই, কারণ এখনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্ত্তব্য শেষ হয় নি। সেজন্য যেই দেখি উদ্দাম ভক্তি প্রবাহে প্রাণটা ভেসে যাবার উপক্রম হ'য়েছে অমনি তার মাথায় কঠোর জ্ঞানের অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত কর্ত্তে থাকি। ওঃ এখনও আমার অনেক কাজ বাকি র'য়েছে; আমি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দাসানুদাস, তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন যতদিন না সে কাজ শেষ হয় তত দিন আমার বিশ্রাম নেই।

*　　*　　*　　*

"এই ঘটনায় আমরা দেখিতে পাই স্বামিজীর মনের স্বাভাবিক গতি কোন দিকে। ইহা যে অন্তঃসলিলা ভক্তি প্রবাহে নিরন্তর সিঞ্চিত ও জ্ঞান কর্ম্মের বাহ্য উপকরণে আচ্ছাদিত এবং সেই জ্ঞান কর্ম্মের আবরণ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে যে নিশি দিন প্রবল অন্তর্যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার গুরু ভ্রাতাগণও জানিতেন যে সেই কঠিন শৈলাবরণ ভেদ করিয়া যেদিন তাঁহার হৃদয় নিহিত প্রেমভক্তির প্রবল উৎস ছুটিয়া বাহির হইবে সেদিন আর তাঁহার ভঙ্গুর পার্থিব দেহ তাহার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না, সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিমনা দেখিলেই তাঁহার মনের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিতেন।"

আরও একটী কারণে উল্লিখিত ঘটনাটী স্মরণ করিবার যোগ্য। উহা যেন স্বামিজীর দুর্ব্বোদ্ধ চরিত্রের একটী সরল টীকা স্বরূপ। যে চরিত্রে আপাতবিরোধী বহুবিধ ভাব সমাবেশে সাধারণের নিকট একটা জটিল প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়, তাহা উক্ত চিত্রে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে উহা হইতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি। কেন তিনি সময়ে সময়ে এক একটী ভাবের উপর অতি মাত্রায় জোর দিতেন, কেন কর্ম্ম মার্গকে ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর

বলিয়া উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক এ দিনকার এই প্রবল ঝটিকা স্বামিজীর গুরু ভাইদের মন হইতে সন্দেহের মেঘরাশি উড়াইয়া লইয়া গেল। এদিন আর তাঁহারা কখনও স্বামিজীর কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন নাই। তাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি হইয়া গেল ঠাকুর সত্য সত্যই তাঁহার মধ্য দিয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। (১২৫—১২৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীচৈতন্য প্রভুর ভক্ত সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটী আমরা পাইতেছি, যথা—

"মীরাবাই সম্বন্ধে এই গল্পটী বলিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন,—মীরাবাই বৃন্দাবনে পৌছিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শিষ্য - বাঙ্গালার নবাবের ভূতপূর্ব্ব উজীর সনাতন দাসকে * নিমন্ত্রণ করেন। বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত স্ত্রীগণের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া সাধু যাইতে অস্বীকার করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল, তখন মীরাবাই "বৃন্দাবনে কেহ পুরুষ আছে তাহা জানিতাম না, আমার ধারনা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ রূপে এখানে বিরাজ করিতেছেন।" এই বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং যখন নিভৃতে সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি, নির্ব্বোধ তুমি, তুমি নাকি নিজকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর? এই বলিয়া স্বীয় অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিও মাতা যেরূপ সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করেন, সেই রূপে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মীরাবাইয়ের দৈন্য, প্রার্থনা পরতা, সর্ব্বজীব সেবা প্রচার এবং রাজ্ঞী হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমে রাজপদ ত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ স্বামিজীকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং মীরাবাই এর এই গানটী আবৃত্তি করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন ও তাহা অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন—

হরিসে লাগি রহোরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই।
মুগা পড়ায় কে গণিকা তারে তারে মীরাবাই।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা বনিয়া বৈল চরাই।
এক বাতকা ঠাণ্ডা পড়েতো খোঁজ খবর না পাই।

---

* মীরাবাই রূপ গোস্বামীর সহিতই সাক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যথা ভক্তমালে—"বৃন্দাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন। বাঞ্ছা হৈল-শ্রীরূপ গোস্বামী দরশন।" লেখক।

ঐসী ভক্তি কর ঘট্ ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দি ঔর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই।

"অর্থাৎ লাগিয়া থাক ভাই, হরিপাদ পদ্মে লাগিয়া থাক। যদি সেই অঙ্কা বঙ্কা নামক দস্যু ভ্রাতৃদ্বয়, সেই নিষ্ঠুর কসাই সুজন এবং যে খেলার ছলে তাহার টীয়া পাখীকে কৃষ্ণনাম শিখাইয়াছিল সেই গণিকা- ইহারা যদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবে সকলেরই আশা আছে। টাকা কড়ি সংসার এক কথায় সব উড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ছল চাতুরি ছাড়ো ভক্তি কর সার। সেবা বন্দনা আর আত্ম সমর্পণ ইহতেই রঘুমণি ধরা দিবেন।" (৮৭৯—৮১ পৃষ্ঠা—)

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

আলোচনা

(৫—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান।)

কয়েক বৎসর যাবৎ নবদ্বীপের পরপারে স্বর্গীয় কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রচারিত মায়াপুরকে প্রকৃত মায়াপুর নয় বলিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস নামক জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব নবদ্বীপেরই নিকটবর্ত্তী গঙ্গার তীরবর্ত্তী কোন স্থানকে প্রকৃত মায়াপুর বলিয়া প্রচার করেন। উক্ত বাবাজী মহাশয় নানাভাবে বহু প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা জন সাধারণকে বুঝাইতেছেন যে, ভক্তিবিনোদ মহাশয় যেটীকে মায়াপুর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন সেটী মায়াপুর নয় "মিঞাপুর"। আর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান মায়াপুর এবং উহাই প্রকৃত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্ম ভিটা। যাহাই হউক ইহা লইয়া ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের দলের সহিত ব্রজমোহন দাসের দলের কথার কাটাকাটি কিছু হইয়াছে। তারপর শুনিয়াছিলাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ব্রজমোহন দাসের নির্দ্দিষ্ট স্থানকেই প্রকৃত বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। সেস্থানে মৃত্তিকাগর্ভে মহাপ্রভুর জন্মভিটার উপর ৺গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে বলিয়াও নাকি জানা গিয়াছে। ব্রজমোহন দাস সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থি হইয়া বহু আবেদন নিবেদন করিয়াছেন, কেহ কেহ সাহায্যও করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মন্দির বাহির করিবার আয়োজন হইতেছে। তারপর কিন্তু আর বিশেষ কোন খবরাখবর পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ কি? মন্দির উদ্ধারের কতদূর কি হইল ব্রজমোহন দাস পরম উৎসাহী ও অক্লান্ত পরিশ্রমী তিনি বলেন "কায়িক পরিশ্রম বা ঐতিহাসিক তথ্যাদির সন্ধান প্রভৃতি যাহা কিছু করা দরকার সবই আমি করিব কেবল সাধারণে উদ্যোগী হইয়া যাহাতে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে মন্দিরটী বাহির হয় তাহা করুন।" দাস মহাশয়ের কথাটি আমরা সাধারণকে ভাবিতে

বলি। মন্দির বাহির হইলে এবং উহাই প্রকৃত মহাপ্রভুর জন্মভিটা বলিয়া স্থির হইলে বৈষ্ণব জগতের পরম উপকার হয়। যাহাতে কার্য্যটী শীঘ্র শীঘ্র হয় তাহার জন্ম আমরা সর্ব্বসাধারণকে একটু দৃষ্টি দিতে বলি। ব্রজমোহন দাস এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে যাইয়া বহু পরিশ্রমে বহু প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া কয়েকখানি পুস্তক এবং কয়েকখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি পাঠ করিলে এ বিষয় সকলতত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

শ্রীব্রজমোহন দাস নবদ্বীপ শ্রীবাস অঙ্গনঘাট নদীয়া "এই ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বা সাক্ষাৎ করিয়া সকল অবগত হইতে পারা যায়।

যখন একটা আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তখন শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে প্রকৃত মীমাংসা হয় তাহা করাই সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য।

কাশিম বাজার বৈষ্ণব সম্মিলনী ও কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও প্রাচীন শ্রীপাট সংস্কারের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাঁহারাও কি এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত মনে করেন না? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ নিজ কীর্ত্তি বজায় রাখিতে এত উদাসীন কেন? আমরা দাসমহাশয়কে উৎসাহিত করিবার জন্য সকলকেই আহ্বান করিতেছি, সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়া যাহাতে সত্য প্রকাশ হয় তাহা করুন।

(৬—বীরভূমি।)

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন সম্পাদিত। মাসিক পত্রিকাকারে পূর্ব্বে ৪ বৎসরাধিক চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় এতদিন পরে আবার বাহির হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকার জন্যই নাকি কাগজখানি বন্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক পুনরায় বীরভূমি প্রকাশ হইতেছে দেখিয়া আমরা পরম আনন্দিত হইলাম।

বর্ত্তমানে যদিও মাসিক পত্রিকা নাম দিয়া বীরভূমি প্রকাশ হইতেছে কিন্তু ইহার প্রত্যেকখানিই এক একখানি পৃথক পুস্তকের মত সম্পূর্ণ। আমরা ৪ খণ্ড পত্রিকা পাইয়াছি উহাতে ৪টী বিষয় নির্দ্দেশ হইয়াছে। ১। কৃপাবাদও আত্মশক্তি। ২। ধর্ম্মের গ্লানি ও দেবজন্ম। ৩। সঙ্কর্ষণ প্রসঙ্গ। ৪। শ্রীমদ্ভাগবতের ধারণা ও ধ্যান। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক খণ্ডেই বিশেষ গবেষণা-পূর্ণ অন্যান্য প্রবন্ধ আছে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ তিন টাকা প্রতিখণ্ড ।০ চারি আনা। সিউড়ী, বীরভূম সম্পাদকের নিকট পাওয়া যায়। আমরা এই পত্রিকার উন্নতি কামনা করি।

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

(২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা

দীনবন্ধু হে! আমার হইল কি? কেন আমি প্রত্যেক বিষয়েই অকৃতকার্য্য হইতেছি? কেনই বা ইচ্ছা না থাকিলেও অসৎ চিন্তা আসিয়া হৃদয় ব্যাকুল করিতেছে? তোমার ভাবে বঞ্চিত হইয়া নিরন্তর অসৎ বিষয় ভাবনায় মত্ত রহিয়াছি কেন? এ সকল কি তোমার খেলা, না আমার কর্ম্মফল? যদি তোমার খেলা হয় তবে আমার আর কিছু বলিবার নাই, তুমি যাহাতে সুখ পাও, যেমন করিয়া নাচাইলা তোমার আনন্দ হয় সেইরূপই কর। আর যদি আমার কর্ম্মফল হয়, তবেতো দেখিতেছি আমার আর উপায় নাই।

কেন না—কত পাপ, কত অন্যায়, কত শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম যে জীবনে করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকল অসংখ্য কর্ম্মের ফল যদি ভোগ করিয়া একে একে আমাকে ক্ষয় করিতে হয় তাহা হইলে এ জন্মেতো হইবেই না, কত জন্ম জন্মান্তর যে সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে চলিয়া যাইবে তাহারও ঠিক নাই। তারপর পূর্ব্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আবার কত যে নূতন নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছি তাহারও সংখ্যা নাই। কাজেই আমার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া যদি শেষ করিতে হয়, তবে শান্তি পাইবার আশা আমার মোটেই নাই। সেইজন্য তোমার নিকট কাতর প্রার্থনা, তুমি যদি দয়া করিয়া আমার কর্ম্মফল ক্ষয় করিয়া দাও তবেই আমার উপায় হয়। তুমি দীন-জন-বৎসল, দীন—পতিত

তোমার নিকট প্রার্থনা না করিলেও তুমি তাহার ব্যথা বুঝিয়া ব্যবস্থা কর। তাই তোমার এই অপার—অসীম দয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে যে, তোমার ভাবে হৃদয় জুড়াইতে পারিব।

সংসার করিয়া যদি শান্তি পাই ক্ষতি নাই, নতুবা দিন রাত যদি অশান্তিই ভোগ করিতে হয়, মায়ার লাথি খাইতে খাইতে যদি অবিরত অসহ্য যন্ত্রনাই ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে আমার সকল বন্ধন ঘুচাইয়া দাও। শুধু প্রাণে প্রাণে বুঝাইয়া দাও যে,"তুমি আমার আর আমি তোমার" বেশ সুদৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে জাগাইয়া এমন ব্যবস্থা কর যাহার দ্বারা তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও না ভুলি।

আর এক নিবেদন, সুখ দুঃখ, ভালমন্দ, লাভ অলাভ, নিন্দা স্তুতি, প্রভৃতির দ্বন্দ সহ্য করিবার শক্তি দাও। এই দ্বন্দ সহিবার অভাবেই আমি অতিশয় চঞ্চল হইয়াছি—ধন, জন, মান প্রভৃতি পাইলেই সুখ মনে করি কিন্তু যেমন তাহার একটু অভাব হয় অমনি একেবারে অধীর হইয়া পড়ি। যাহাতে সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, জয়ে পরাজয়ে, সম্পদে বিপদে, লোকের নিন্দায় বা স্তুতিতে সমভাবে থাকিয়া তোমাতে একান্ত নির্ভর রাখিয়া তোমায় ভাবিতে, তোমায় ডাকিতে ও তোমারই গুণগান শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে মাতিয়া থাকিতে পারি তাহা কর। দীন হীনের আজ এইটাই প্রার্থনা।

দীন—সম্পাদক

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১৪)

২৬।—(হের) নবজলধর কান্তি মহোজ্জল অভিনবরূপ ত্রিভঙ্গ।
চরণ কমল পর নূপুর রঞ্জিত অলিকুল গুঞ্জর রঙ্গ ॥
মন্দ মধুর বেণু বাদ্য বিনোদন
কেলি কদম্ব তরুবর হেলন
(হের) গোপ বধূগণ কৃতপরি রম্ভন
মনসিজ সমর তরঙ্গ ॥
পীত বসন মণি-কাঞ্চন আভরণ
শীরে চূড়া শিখি পুচ্ছ বিভূষণ
শ্রুতি মূলে কুণ্ডল অলকা আবৃত ভাল
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ ;—

হৃদিপর বনফুল মাল বিলম্বিত
মৃগমদ কুঙ্কুম গন্ধ আমোদিত
মধুরাধরে মৃদুহাস্য শোভিত হেরি—
মুরছিত কোটী অনঙ্গ ॥
ধীর ললিত শুভ বঙ্কিম ঠাম অতি-
অনুপরূপ রসময় রস ভূপতি
বৃন্দাবন বিপিনে মহা বিলসতি
রাস বিলাসিনী সঙ্গ,—
হের নব নটবর গোপকিশোরাকৃতি
রাধারমণ মোহন মূরতি
বিশ্বরূপ মতি অবিচল রহুঁমাতি
চরণ কমলে হই ভৃঙ্গ ॥

—:০:—

২৭।—যা যেতে যা গৌর ব'লে ভয় রবে না শমনে।
যমে তার নাই অধিকার গৌর নামটী যার বদনে ॥
মন তোর এত ভাবনা কিসে
মিছে কেন হারাস্ দিশে
তোর এ ভাল সাম্‌লাবে সে
ভরসা দে প্রাণে ;—
হোক্ না হোক্ সাধন করা
মুখে বল দয়াল গোরা
এ নামের এম্‌নি ধারা
পার লেগে যায় অসাধনে ॥
গৌর বিনা আর কেহ নাই—
পতিতের বন্ধু সে ভাই
পতিত পাবন নামের দোহাই
দেনা সাবধানে ;—

কাতরে ডাক্‌লে তাঁরে
সব ভয় যাবে দূরে
অকূলে কূল পাবি রে
ও বিশ্বরূপ সে নামের গুণে ॥

সম্পাদক

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে, নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস একখানা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থই প্রসিদ্ধ। চরিতামৃতে চৈতন্যমঙ্গল নাম লিখিত হইবার কারণ কি ?*

উঃ—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—

"বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥"

কিন্তু বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য মঙ্গল নামক কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কথিত চৈতন্য মঙ্গলে যে যে লীলা বর্ণিত হয় নাই, তাহাই বর্ণনোদ্দেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আদেশে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রণয়ন করেন। (উহা ১৫০৩ শকাব্দে রচিত হয়। †) সুতরাং কৃষ্ণদাস--কথিত চৈতন্য মঙ্গলই চৈতন্যভাগবত। চৈতন্য ভাগবতেরই পূর্ব্ব নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।

শ্রীখণ্ডের লোচন দাস কৃত একখানা গ্রন্থের নামও চৈতন্যমঙ্গল। গৌড়ীয় ভক্তবর্গ যখন নীলাচলে গমন করেন (১৪৩৩ শকাব্দ), নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য সুলোচন বা লোচনও তখন গুরুর সহিত গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণীর বয়স দশ বৎসরও হয় নাই। লোচন দাস নারায়ণীর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং লোচনদাস বৃন্দাবন দাস অপেক্ষা বয়োঃজ্যেষ্ঠ হইলেও, উভয়ের গ্রন্থই প্রায় সমকালেই লিখিত হইয়াছিল। কেহ

---

* প্রশ্ন কর্ত্তার এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা লিখিত হইয়াছিল, ভক্তিতে প্রকাশার্থ তাহাই প্রেরিত হইল। (লেখক।) † ১৫৩৭ শকাব্দে নহে।

কাহারও গ্রন্থ রচনার কথা অবগত ছিলেন না, কাজেই উভয় গ্রন্থেরই নাম হওয়া এক বিচিত্র নহে।

চৈতন্য ভাগবত প্রকাশের সময় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়,—যাহা হউক উহা ১৪৯৭ শকাব্দের পূর্ব্বে কোন এক সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এরূপ কথা আছে যে, লোচনের চৈতন্যমঙ্গল যখন প্রকাশিত হয়, তখন তৎ-বর্ণিত কোন কোন ঘটনা—যথা সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিষ্ণু প্রিয়ার সহিত প্রেম-সম্ভাষণ সত্য কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, নারায়ণী দেবী ইহার সত্যতার প্রমাণ দেন। তখন মাতৃবাক্যে, বৃন্দাবনদাস নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করেন। সে যাহা হউক, লোচনের গ্রন্থ প্রচারের পরই যে, বৃন্দাবন দাস নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম অন্য কিছু না হইয়া চৈতন্যভাগবত হওয়াই সঙ্গত; কেননা ইহার বহুতর সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই গৃহীত এবং অনেক স্থল শ্রীমদ্ভাগবতেরই স্পষ্ট অনুবাদ। একথার উদাহরণ অনেক আছে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও তাই উক্ত হইয়াছে—

"ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছে ইহা আনি করিয়া উদ্ধার॥"

কিন্তু প্রেমবিলাসে লিখিত আছে যে, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণই করিয়াছিলেন, যথা—

"ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্যমঙ্গল।
দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী ভকত সকল॥
চৈতন্যভাগবত নাম দিল তার।
যাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ অপার॥"

সকল কথাই যথার্থ। আমাদের মনে হয় গৌড়ে যাহা স্থির হয়, বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণও তাহাই গ্রহণ ও অনুমোদন করিয়া লইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাস ব্যাসাবতার। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবানরূপে প্রকাশ হইলে, নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে আগমন করেন। ঐ সময় হঠাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছায় শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হয়। ব্যাসপূজার আবশ্যকতা কি? ব্যাস পূজার ছলে ব্যাসদেবকে আকর্ষণ করা হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। চারিবৎসর বয়স্কা শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীও তথায় ছিল; এই নারায়ণীই তৎপূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমলাভ করিয়াছিলেন। এবং

তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥"

এই নারায়ণী'তই ব্যাসদেবের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, এবং ইহার গর্ভেই ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাসের উদ্ভব হয়। অতি বালিকাবয়সে কুমারহট্টবাসী বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর সহিত নারায়ণীর বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি বিধবা হন। এই সময়ে তিনি শ্রীহট্টে মাতুলালয়ে গমন করেন, তদবস্থায় তথায় বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। শিশু বৃন্দাবনকে লইয়া তাঁহার মাতামহ মাউগাছিতে আগমন করেন, এই স্থানেই বৃন্দাবনদাস শ্রীগৌরলীলা কথা বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্ত-মুখে শুনিয়া বিমুগ্ধ হন এবং নিজগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতেই বৈষ্ণব সমাজে তিনি ব্যাসাবতার বলিয়া নির্ণিত হন। ১৪৯৮ শকাব্দে কবিকর্ণপুর "গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা" রচনা করেন, তাহাতে বৃন্দাবনদাসের স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ১৫০৩ শকাব্দের পূর্ব্বে বৃন্দাবনে এই নাম পরিবর্ত্তনের সংবাদ পৌঁছে নাই; পৌঁছিলে শ্রীচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নাম লিখিত হইত না। ফলতঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনার পরে—১৫০৩ শকাব্দের পরে, এই নাম পরিবর্ত্তন ঘটনা বৃন্দাবনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বৃন্দাবনের ভক্তগণ শ্রীচরিতামৃতোক্ত কৃষ্ণদাসের উক্তি অবগত ছিলেন এবং তাহাদেরই দ্বারা এই নাম পরিবর্ত্তন গৃহীত হইয়াছিল। এই জন্য বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলই শ্রীচৈতন্য ভাগবত নামে খ্যাত হইয়াছে।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী

ভক্তি

এক একবার ভাবি, ভক্তির কথা আমি লিখিতে বসিলাম কেন? ভক্তির যেখানে উদ্বোধন সেই মনের উপর কত কালীমা কলুষে ভরিয়া গিয়াছে।

জীবন-মধ্যাহ্নে আর তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। অন্তঃদৃষ্টি বলিয়া শ্রেষ্ঠদৃষ্টি—যা মানুষের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়—বিগত জীবনের কাঁটা জঙ্গলে সেখানে অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। পাপচিন্তা শিশুকাল

হইতে মনকে উপহার দিয়া অপরাহ্নে আর তার নিকট হইতে কিছুই পাইবার আশা নাই।

মানুষ সারা জীবন ভরিয়া পাপ করে—এবং অন্যের অগোচর হইলেই নিশ্চিন্ত হয়। মনে করে তাহার এ পাপ কেহ জানিল না—এ পাপ বুঝি সহিয়া গেল। সহিয়া যে যায় না, জীবনের অপর প্রান্তে যে তাহা ধরা পড়ে, সেইটে না বুঝাই সাধনার অভাব। পাপকে প্রশ্রয় দিলে—চাপা দিলে তার শক্তি বাড়িয়া উঠে; জীবনের পরতে পরতে ময়লা পড়িতে সুরু করে।—পাপ যদি মানব সমাজে প্রকাশ করা যায় তবে তাহা ধৌত হইবার একটু সহজ পথ আপনা আপনিই আইসে।

ভগবানের সঙ্গে আমাদের মন লইয়া একটা ব্যবসা চলে। তারসঙ্গে এই দীর্ঘ কারবারে ঠিক মতন আদান প্রদান রাখিতে পারিলেই শান্তিমুক্তির পথ প্রস্তুত হয়।—তাই বলিতেছিলাম যেখানে মন লইয়া কথা সেখানে মনটার বিরুদ্ধে অন্যায় অত্যাচার করিয়া মনের স্বাধীনত্বক অস্বীকার করাই মহাপাপ। যে কাজটী শেষ অবধি নিজের কাছে ভাল বলিয়া মনে হয় না তাহাই পাপ নামে অভিহিত হয়। জীবনে উন্নতিলাভের একমাত্র পথ ভক্তি। ভক্তির উৎপত্তি নিজের মনে। মনের এই যে ব্যাকুলতা ইহাকে কোন কোন ব্যাখ্যাকার শ্রীরাধা এবং প্রাণের সত্যকার আহ্বানে জগতের হিতকামনায় কর্ম্ম করার যে শুভেচ্ছা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভক্তিদ্বারা রাধার বিকাশ। রাধা দ্বারা জ্ঞানের উদ্বোধন—জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম যাগী শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। এই উভয় মিলিয়া মানবের মানস সরোবরের হৃদিবৃন্দাবন। হৃদিবৃন্দাবনের লীলাকে মধুময় করার যে স্নেহ বিহ্বল ব্যাকুলতা তাহাই মা যশোদা। পরের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করিয়া প্রাণদানের যে উদ্দাম বাসনা এই বাসনা মাতা যশোদারই পূর্ণমূর্ত্তি! ইন্দ্রিয় সমূহ সখীরূপে বিরাজিত;—মানব জীবনে মন্দ কিছু হইতে সুরু করিলেই ভক্তিরূপিণী শ্রীরাধাকে কাণে কাণে সুপথ বলিয়া দেয়। মানুষ জ্ঞানকে হারাইলেই কৃষ্ণকে হারায়—তখনই তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস ডাকিয়া আনিয়া দুঃখী সাজিয়া ডুবিয়া মরে। তখন ভিতরের চৈতন্য কৃষ্ণেরমতই ব্যাকুল হন—বিহ্বল হন। শেষে অসহ্য হইয়া হৃদি বৃন্দাবন ছাড়িয়া দেহের উপর কুরুক্ষেত্র অভিনয়ে নিঃশেষে ধ্বংস সাধন করেন। এ সত্যকে সেই ধ্বংস মুখে মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে। এই ব্যর্থ জীবনের জ্বালাময় আর্তনাদ—নানা চুরী দিয়া কেবলই বাহিরে প্রকাশ

হইতেছে না কি? সে দীর্ঘশ্বাস তো মানবের নহে, সে হতাশময় দুঃখ ত আর কাহারও নহে, সেই-ই যে ভগবানের ব্যাকুল কাতরতা। ভক্তের জন্য ভগবানের সেই আকুলক্রন্দন। যাঁহারা হৃদয়ে এই বৃন্দাবনস্থাপনের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন ভক্তি দ্বারা যে আত্মশুদ্ধি জন্মে তাহাই পবিত্র তীর্থরজ। মনুষ্য জীবনে কুপথে যে গৃহের আহ্বান সেই-ই ননদিনী বাঘিনী। এইখানেই ভক্তির পরীক্ষা। ভক্তির পরীক্ষায় কি আমরা পাশ হইতেছি?—তাহা নহে, সকলেই ননদিনীর ভয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিতেছি। মনকে হৃদ্‌কমল হইতে সরাইয়া আনিয়া ব্রহ্মপথ ত দূরের কথা ননদিনীর গৃহ সেই নাভিমূলে স্থাপন করিতেছি। তাহাতে মন কখন নাভিমূলে, কখন গুহ্যে, কখন লিঙ্গপথে নরক ভোগ করিতেছে। কামসেবা জীবনের একমাত্র কাম্য হইয়া দেহতরী মলমূত্রে জরিত করিয়া পঙ্কিল পঙ্কে বিসর্জ্জন দিতেছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন "ওরে তোরা রমণ সুখ তো জানিস? এ পথে এলে কোটিগুণ রমণ সুখ হয়।"

একথা বলিলে হইবে কি? বিশ্বাস করে কে? যে বিশ্বাস করিবে সেই মনই যে হীনপথে আবদ্ধ। হীন কর্ম্মভিন্ন অন্য চিন্তা করিবার তাহার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি যে হয়না সেইটাই হইতেছে ভক্তির অভাব। এ সব বিশ্বাস করিয়া সত্যানুসন্ধানের একমাত্র পথ ভক্তি। রাত্রিকালে নীরবে প্রার্থনা করিও চোখের জল দাও। চোখে যদি জল আসে, তবে বিশ্বাস আসিবে—বিশ্বাস আসিলে ভক্তিরূপিণী সা জয়া শ্রীবৃন্দাবনের কামগন্ধ শূন্য রস সমূহ মধুর ভাবে উপলব্ধি হইবে। এই ভক্ত অর্থাৎ রাধা সাজিলে সর্ব্বপ্রথম অল্পে অল্পে ক্রত কাম প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া দূর করিতে হইবে। মনের জোরে সব করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন শ্রীকৃষ্ণ, মনে জোর করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সহায় হন। এ সব প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কামগন্ধশূন্য বৃন্দাবনলীলার যাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিনা কেন, তাহাই ব্যর্থ হইয়া আমাদের পতন হইবে। মধুর রস সমূহ শিবের মত পরম বৈষ্ণব ভিন্ন বিনা সাধনায় অন্যের আলোচনার সাধ্য নাই;—করিলে তাহাতে নীচে নামিতে হইবে। যাহার ফলে দলে দলে ভ্রূণহত্যাকারী কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ পিপাসু বৈষ্ণব নামধারী বৈরাগীর দল সৃষ্ট হইয়াছে। (বৈষ্ণবধর্ম্মগত মহাপ্রাণগণ ক্ষমা করিবেন। নমস্য বৈষ্ণব বা বৈরাগীর কথা এ স্থলে উল্লিখিত হইতেছে না।) এসব বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিব। এখন আমাদের সর্ব্বপ্রথম পথ ভক্তি সঞ্চয়।

ভক্ত হইলে সমস্ত পথই সম্মুখে আপনি পরিষ্কার হইবে,—পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান আপনিই আসিবে, মনকে তবে যদি সেই গুহ্যাদি নরক পথ হইতে মুক্ত করিয়া ধন্য হওয়া যায়।

এই সহজ পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ ও সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। বারান্তরে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ লইয়া আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

আমার মতে সহজ সরল ভাষায় ভক্তি ও তত্ত্বের কথা ব্যক্ত হওয়া—উচিত। নহিলে ভাষা ও শাস্ত্র ব্যখ্যার গম্ভীরতা উপলব্ধি করিবে সাধারণতঃ সেরূপ লোক মেলেনা। সহজ ভাষায় ভক্তি স্থাপন দ্বারা মানব হৃদয়ে আত্মবোধের ক্ষমতা জন্মাইলে যদি বলিতে পারি ভারতবর্ষের বৈষ্ণব নাম সার্থক হইয়াছে। *

শ্রীজিতেন্দ্র প্রসাদ বসু

গয়া প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ।

বহুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আজ নবদ্বীপে ফিরিয়াছেন। গয়ার মোহন মাধুরী—গদাধরের শ্রীপাদপদ্ম তাঁহার উদ্দাম হৃদিকন্দরে যে প্রণয় তটিনী সঞ্জাত করিয়া দিয়াছে, পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্যের স্মরণে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নয়ন পথে উৎসারিত হইয়া সুকুমার ভক্তগণের কোমল প্রাণে কি এক নবীন প্রেমের উন্মাদনা আনিয়া দিতেছে। প্রণয় দেবতার কি সে অপার্থিব মাধুরী! ভক্তগণ কি যেন আবেগে, অঞ্চল নেত্রে সে রূপসুধা পান করিতেছেন। রূপ-তৃষ্ণা বুঝি আর মিটিবার নহে।

প্রভু আসিয়াছেন,—ভক্তগণের হৃদিকন্দর আলোড়িত হইয়া অবিরত আনন্দ ধ্বনি উঠিতেছে। প্রেমের পুলক স্পন্দনে জগতের তাবত বস্তু আজ তাঁহারা নূতন ভাবে দেখিতেছেন।

---

* প্রবন্ধ লেখক শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা প্রভৃতির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি মূল লীলাকে উড়াইয়া দিয়া এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহা হইলে আমরা তাহা মানিতে পারিনা, কেন না পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের মত এরূপ নয়। কাজেই আমরাও লীলাকে রূপকভাবে মানিয়া লইতে বাধ্য নয়। আশাকরি তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে মূল লীলা ও ধামকে নিত্য ও সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। এবিষয় পাঠক গণের মত কি জানিতে বাসনা। (ভঃ সঃ)

নদীয়ার বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই যে তিনি অতি আদরের ধন। আজ তাহাদের চিরবাঞ্ছিত ধনের সমাগম আশে সকলেই আকুল আবেগে অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে লইতে আসিতেছেন। বিনয়ী প্রভু সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার সেই হাস্যোৎফুল্ল কমনীয় মুখখানির প্রকটিত জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সকলেরই বহুদিনের সঞ্চিত বিরহ ব্যথা দূরীভূত হইল। প্রণম্যদিগের পদপ্রান্তে শির লোটাইয়া বিনয়ের খনি প্রভু আমাদের বলিতেছেন যে, আপনাদের এই অবিরত মঙ্গল কামনাই আমার তীর্থদর্শনের পথ পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। সকলেই এ কথায় কত না আনন্দ পাইলেন। প্রাচীনেরা তাঁহার শিরে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর বলিলেন, "গোবিন্দ শীতলানন্দ তোমার মঙ্গল করুন।" ত্রিভুবন জননী শচী এ দৃশ্যে কত যে আনন্দ পাইলেন তাহা আর বলা যায় না। আর সেই পতিপ্রেম-পাগলিনী বালা বিষ্ণুপ্রিয়া—সেই বিরহ বিধুরা দেবীর মিলনানন্দ যে কত আমরা আর তাহা কি বর্ণনা করিব।

গৃহে আসিয়া প্রভু আমার তাঁহার প্রিয়তম কয়েকটী ভক্ত লইয়া গয়া-কাহিনী বিবৃত করিতে বসিলেন। বলিলেন, কি অপরূপ দৃশ্যই না দেখিয়া আসিলাম। শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র বিপ্র বেদধ্বনি করিতেছেন। কেহ কেহ বা যাত্রিগণকে সেই বিষ্ণুপাদোদক তীর্থটী দেখাইতেছেন। পাদোদক তীর্থ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে প্রথমে তাঁহার পদদ্বয় ধৌত করিয়াছিলেন—যে পাদোদকের জন্য গঙ্গা দেবীর এত মাহাত্ম্য, শিব যাহার তত্ত্ব জানিয়া শিরে তাঁহাকে ধারণ করিয়াছেন, সেই চরণবারি-স্পর্শ পূত পাদোদক তীর্থ ভক্তের নিকট কত পবিত্র। পাদপদ্ম তীর্থের নাম লইতে প্রভু অসম্বর হইয়া পড়িলেন। দুই কমল নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইয়া প্রসর বক্ষ-বহিয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতেছেন আর নিকটবর্ত্তী ফুলের গাছগুলি সেই মন্দাকিনী ধারায় স্নাত হইতেছে। দেহে পুলক কদম্বের আবির্ভাব হইয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া দিতেছে। আবার অমানুষিক প্রেমভরে থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। শ্রীমান পণ্ডিত প্রভৃতি ভাগ্যবান ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে বসিয়া সে অপূর্ব্ব প্রেম ক্রন্দন নিরীক্ষণ করিতেছেন। সকলেই দেখিয়া বিস্মিত যে, প্রভু কিছুদিন পূর্ব্বে কি ছিলেন আর এখনই বা কি হইয়াছেন। উদ্ধতের শিরোমণি আজ প্রেমিক শিরোমণি। সকলেই ভাবিতেছেন, না জানি শ্রীকৃষ্ণের কি অনুগ্রহই ইহার উপর

হইয়াছে, পথে ইনি বোধ হয় তাঁহার কিছু "বিভব" দেখিয়া থাকিবেন।

কতক্ষণ পরে প্রভু আবার বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া সকলকে স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—ভাই সব, বন্ধু সব, আজ তোমরা ঘরে যাও। শ্রীমান পণ্ডিত আর সদাশিব, তোমরা দুই জনে কাল আমার সহিত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারির গৃহে মিলিত হইও।

প্রভুর আর সে পূর্ব্বভাব নাই। সমস্ত কার্য্যেই উদাসীন, বিষয়ে মহা বিরক্ত। সে গোলকের দেহে গোলক নাথের ভাব অনবরতই বিরাজ করিতেছে। বদনে কৃষ্ণ নামের বিরাম নাই। জননী এ সমস্ত দেখিয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। পুত্রের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। সোণার চাঁদ ছেলে অনবরত কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছে—বহু পুত্র শোকে পাগলিনী শচীর প্রাণে তাহা সহ্য হইবে কেন? বিশ্বরূপের সে দিনের সে শাস্তি তাঁহার প্রাণে যে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নিমাইকে এক দণ্ডও বিশ্বাস করিতে পারেন না। কি জানি তাহার মনে আবার কি আছে। তথাপি বহুদিন পরে তিনি পুত্রকে দেখিয়া সুখীই হইয়াছেন।

শচী দেবী দেখিতেছেন পুত্রের সে অশ্রু থামিবার নহে। অবিরাম ধারায় পতিত হইয়া অঙ্গন প্লাবিত হইতেছে। ক্রমেই প্রেম বাড়িতেছে—ডাকিতেছেন "কৃষ্ণ হে দেখা দাও, আর বিচ্ছেদ সহিতে পারি না।" মায়ের চক্ষে এ দৃশ্য বড়ই কষ্টকর—বড়ই অসহ্য ঠেকিতে লাগিল। করযোড়ে তিনি গৃহের জাগ্রত বিগ্রহ রঘুবীরের শরণাপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার নিমাই চাঁদের মতি গতি ফিরাইয়া দেন।

ভাগ্যবান সকল বৈষ্ণবই গৌরের কথা শুনিলেন। স্নানান্তে সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেছেন। সকলের প্রতিই সেই এক অনুজ্ঞা—"ভাই সব, আজ আমি সুস্থির নই, কাল তোমরা সকলে আমার সহিত শুক্লাম্বরের গৃহে নিভৃতে মিলিত হইও,—আমার প্রাণের বেদনা তোমাদের নিকট উঘাড়িয়া বলিব।" সে অনির্ব্বচনীয় প্রেম-দৃশ্য দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই মোহিত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীমান পণ্ডিতের আনন্দ যেন বেশী। তার যেন আর আনন্দ ধরে না। তিনি পরদিন প্রাতে উঠিয়াই সাজি হস্তে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী পুষ্প আহরণে চলিলেন। শ্রীবাস

পণ্ডিতের বাড়ী একটী কল্প বৃক্ষরূপী কুন্দ পুষ্পের ঝাড় ছিল। সকল বৈষ্ণব মিলিয়া তাহা হইতে ফুল তুলিয়াও শেষ করিতে পারিতেন না। অন্যান্য দিনের মত আজিও সকলে ফুল তুলিতে আসিয়াছেন, এমন সময় শ্রীমান পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফুল তুলিতেছেন আর অধর প্রান্ত দিয়া হাসি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। সকলেই অমনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আজ যে বড় হাসি দেখিতেছি ব্যাপার কি? শ্রীমান পণ্ডিত বলিতেছেন, ভাই সব তোমরা শুনিয়া থাকিবে গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাইচাঁদ আমাদের কেমন অদ্ভুত বৈষ্ণব হইয়াছেন। কাল বিকালে আমি সম্ভাষণ করিতে গেলাম, দেখিলাম সে কি ভক্তি! পূর্ব্ব ঔদ্ধত্যের তিলমাত্রও আর নাই। বসিয়া কত না কৃষ্ণকথা— কত না কৃষ্ণের স্থানমাহাত্ম্য শুনাইলেন। সেই কৃষ্ণনাম লইতে লইতে মূর্চ্ছা—সর্ব্বোপরি প্রেমাশ্রু পূরিত সেই মুখমণ্ডলের শোভা আমি ভুলিতে পারিতেছি না। আর সেই মূর্চ্ছার কথা স্মরণ করিলেও ভয় হয়। তাহাতে অল্প মাত্রও জীবিতের চিহ্ন দেখায় না। ভক্তিবারি দেখিয়া মনে হয় জননী জাহ্নবী যেন আপনি আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। আহা! সে ভক্তি দেখিয়া আর কে তাহাকে মানুষ বলিয়া মনে করিবে। বাহ্যজ্ঞান পাইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি অদ্য শুক্লাম্বরের গৃহে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া নিভৃতে তাঁহার মনের কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবেন। কি আনন্দ সংবাদ! না জানি ইহার অন্তরালে কত শুভ ঘটনাই নিহিত রহিয়াছে। ভক্তগণ সকলেই শুনিলেন আর মহানন্দে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এবং—

"প্রথমেই কহিলেন শ্রীবাস উদার।
গোত্র বাড়াউন্ কৃষ্ণ আমা সবাকার॥"

তখন সকলেই আনন্দভরে কৃষ্ণকথা আলাপন করিতে লাগিলেন। উল্লাসে যে মুকুন্দভজন করিতে পারিবেন ইহাতে কাহার না আনন্দ হইবে? শ্রীমান পণ্ডিত পুষ্পচয়ন করিয়া গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বরের গৃহে গমন করিলেন। আর সেই আশৈশব পরম ভক্ত গদাধর—তাঁহারও বড়ই আগ্রহ জন্মিল যে কি কৃষ্ণকথা হয় গিয়া শুনেন। কিন্তু প্রভুর তাঁহার প্রতি কোন আদেশই ছিল না। তাই তিনি শুক্লাম্বরের গৃহে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। কথিত বৈষ্ণবগণ সকলেই আসিয়া সমবেত হইয়াছেন এমন সময় পূর্ণচন্দ্র সদৃশ শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া মিলিত হইলেন। সকলেই কতনা আনন্দভরে প্রভুকে

সম্ভাষণ করিতেছেন। কিন্তু প্রভুর ত আমাদের সে দিকে দৃষ্টি মাত্রই নাই। প্রাণনাথকে প্রাণে রাখিয়া তিনি যে দৃষ্টি হারা। তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া ভাগবতগণ ভক্তি উদ্দীপক শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রভুর যেটুকু ধৈর্য্য ছিল তাহাও নষ্ট হইল। প্রভু, "প্রাণনাথ! তুমি কোথায় গেলে" এই কথা বলিয়া দুয়ারের যে খুঁটিটী ধরিয়া বসিয়াছিলেন, প্রেম ভরে তাহা ভাঙ্গিয়া লইয়া অচেতন হইয়া প্রাঙ্গনে পড়িয়া গেলেন। সে কি আবেশ! সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। ভক্তগণ আর তাহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। সকলেই প্রেমভরে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন, আর গদাধর, তিনিও গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছিত হইলেন।

"সবেই হইলা কৃষ্ণ-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
গঙ্গার কূলেতে ঘর—জাহ্নবী বিস্মিত॥" চৈঃ ভাঃ।

বিশ্বম্ভর বহুক্ষণ পরে বাহ্য পাইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "হে কৃষ্ণ, হে প্রভু, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোনদিকে গমন করিলে এই কথা বলিয়া তিনি আবার মাটীতে পড়িয়া গেলেন। কত যে আছাড় খাইতেছেন, শ্রীঅঙ্গ কত যে লাগিতেছে প্রেমাবেশে প্রভু আমার তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। ত্রিভুবন-মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-ক্রন্দনে শুক্লাম্বরের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে প্রভু কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন কিন্তু নয়নের ধারার আর বিরাম হইতেছে না। গৃহ-মধ্য হইতে ক্রন্দনের শব্দ আসিতেছে শুনিয়া প্রভু জানিতে চাহিলেন গৃহে কে আছে। ব্রহ্মচারী বলিলেন, তোমার গদাধর গৃহ মধ্যে একাকী রহিয়াছেন। প্রভু দেখেন যে গদাধর মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া কান্দিতেছেন। ইহাতে তিনি বড়ই সুখী হইলেন, কাছে বসিয়া বলিতেছেন—"গদাধর! তুমি বড়ই ভাগ্যবান যে, শিশুকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মতি স্থির করিতে পারিয়াছ, আমার জন্ম বৃথাই গেল। তেমন অমূল্য নিধি পাইয়াও হারাইলাম।" এই বলিয়া আবার তিনি মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িলেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ বাহ্য পাইতেছেন আর পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছেন। দৈবে কোন রকমে সে আছাড়ে নাক মুখ রক্ষা পাইতেছে। চক্ষু দিয়া এত প্রেমবারি পড়িতেছে যে আঁখি মেলিতে পারিতেছেন না। শ্রীবদনে সেই এক কথা আর মধুর কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ। ক্রমে তিনি সকলেরই গলা ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "ভাই, সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ নাম

জপ কর।" প্রভুর এই অপূর্ব্ব আর্ত্তি দেখিয়া কাহারও মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছে না—কেবল প্রেমাশ্রু পাত করিতেছেন। প্রভু বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেছেন, "ভাই, তোমরা আমাকে সেই নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দিয়া আমার দুঃখ দূর করিয়া দাও।" এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল কিন্তু ভক্তগণের নিকট তাহা ক্ষণকাল বলিয়া অনুমিত হইল। গদাধর প্রমুখ ভক্ত কয়জন প্রভুর এই অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেম দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

এই অনির্ব্বচনীয় প্রেম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সকলেই বাহ্য হারাইয়াছেন, গৃহে গিয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট একথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। যে-ই শুনেন—সেই হরি হরি বলিয়া ক্রন্দন করেন সকলেই অনুমান করিতে লাগিলেন—তবে কি শ্রীভগবানই তাঁহাদের মধ্যে উদিত হইয়াছেন? বেশ হইয়াছে, নিমাই পণ্ডিতকে যখন তাঁহাদের দলে পাইয়াছেন, তখন আর পাষণ্ডীর হস্তে ভয় কি? হায় ভগবান! এ সুখস্বপ্ন সত্যই কি তাহাদের অদৃষ্টে ফলবতী হইতে চলিল? তখন তাঁহাদের কি আনন্দই না লাভ হইল। কেহ বলিতেছেন তাহা যদি হয় তবে কৃষ্ণ নিন্দুক যত দুর্ব্বৃত্ত আছে তাহাদের মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিব, কেহ বলিতেছেন হয় ত বা পরম ভক্ত ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ-গুণে গয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী পূর্ণ শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। এইরূপে নানা মতে জল্পনা কল্পনা করিয়া ভক্তগণ অশেষ আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠগণ আশীর্ব্বাদ করিলেন, আহা! তাহাই যেন সত্য হয়—

"সবে মিলি করিতে লাগিল আশীর্ব্বাদ।
হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আনন্দে লাগিল সবে করিতে কীর্ত্তন।
কেহ গায় কেহ নাচে করিয়া ক্রন্দন॥

ঠাকুর এদিকে কতকটা আবিষ্ট অবস্থাতেই শিক্ষক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে চলিলেন। বহুদিন পরে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিতে—পণ্ডিত আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া তাঁহাকে বক্ষে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, বাবা নিমাই, তোমার গৌরবে তোমার পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই আজ গৌরবান্বিত, আর আমি—তোমাকে শিক্ষা দিয়া আমিও নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলাম। আরও বলিলেন,—

"তোমার পড়ুয়া সব তোমার অবধি।
পুঁথি কেহ নাহি মেলে ব্রহ্মা বলে যদি ॥
এক্ষণে আইলা তুমি সবার প্রকাশ।
কালি হৈতে পড়াইবা আজি চল বাস ॥"

শ্রীবিশ্বম্ভর তাঁহার গুরুদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন, ছাত্রগণ তখন একে একে আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়াছে, তিনি তখন তারাগণের মধ্যবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। আহা! এই নবীন বয়সে প্রভু আমার পণ্ডিত সমাজ নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। ধন্য নবদ্বীপ! ত্রিলোকে তুমিই ধন্য। যে হেতু সেই মদন মোহনের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য তুমিই লাভ করিয়াছিলে।

প্রভু যখন ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া বসিলেন তখন সেই ভাগ্যবান গৃহস্বামীর যে কত আনন্দ হইল তাহা আর কি বলিব। প্রভু তখন ভাগ্যবান মকুন্দকে কোলে করিয়া প্রেমানন্দ জলে তাহার অঙ্গ ধৌত করিয়া দিলেন। তখন—

"জয়কার দিতে লাগিল নারীগণ।
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ ভবন ॥
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি সবাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে ॥"

গৃহে আসিয়া দেবগৃহের দুয়ারে বসিলেন। প্রতি জনাকে আলিঙ্গন দিয়া সে দিনকার মত বিদায় দিলেন। যাঁহারা যাঁহারা প্রভুকে সম্ভাষণ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন, যেন সে নিমাই নহেন।—

"পূর্ব্ব বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোনজন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥"

শচীমার কিন্তু এসব কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তীর্থস্থান হইতে ফিরিয়া নিমাই যেন একেবারে নূতন মানুষ। ভাব—বৈরাগ্যপূর্ণ, দৃষ্টি—উদাস। দেখিয়া শুনিয়া শচীমা অকুল ভাবনা সাগরে পড়িলেন। কি যে করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। পুত্রের প্রেমাশ্রু পূরিত মুখখানিতে স্বর্গীয় সুষমা বিরাজ করিতেছে। শচীমা ভাবিতেছেন না জানি আবার তাহার অদৃষ্টে কি আছে।

"পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে॥
স্বামী নিল কৃষ্ণচন্দ্র নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে একজন।
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ এই দেহ বর।
স্বস্থচিত্তে মোর গৃহে রহুঁ বিশ্বম্ভর॥"

শচী দেবী অনেক ভাবিয়াও যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না তখন বধূকে আনিয়া পুত্রের নিকট বসাইয়া দিলেন, কিন্তু প্রভুর সে দিকে দৃষ্টিমাত্র নাই। তিনি নিজের ভাবেই আছেন। নিরবধি শ্লোক পড়িতেছেন আর রোদন করিতেছেন। বলিতেছেন "কোথা কৃষ্ণ, তুমি আমায় দেখা দাও।" আবার মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন। বালিকা প্রিয়াজী দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে পলাইয়া গেলেন। শচীও মনে মনে বড়ই ভীত হইলেন। রাত্রেও প্রভুর নিদ্রা নাই কৃষ্ণবিরহে আদৌ সুখী হইতে পারিতেছেন না। কখন কখন উঠিতেছেন কখন বসিতেছেন আবার কখন শুইতেছেন। অজ্ঞান —বিরহোন্মাদ অবস্থা। কিন্তু বড়ই আশ্চার্য্য; বহিরঙ্গব্যক্তি দেখিলে সমস্ত ভাবই সম্বরণ করিয়া লয়েন। আর অন্তরঙ্গগণের মধ্যে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে দিশাহারা হইতেছেন। কি মধুর—কি আশ্চর্য্যভাব।

প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া দেখেন ছাত্রগণ আসিয়াছেন। কি করেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়াইতে গেলেন। কিন্তু ঠাকুরের আমাদের মুখে কৃষ্ণনাম ভিন্ন আর কিছু আসিতেছে না। গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর যে এরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থা হইয়াছে তাহা তাঁহারা কিছুই অবগত নয়। কাজে কাজেই তাহারা যেমন অনুরোধ করিল তিনিও তেমনি পড়াইতে গেলেন। পড়ুয়ারা "হরি হরি" ধ্বনি করিয়া পুথির ডোর খুলিলেন। আর রক্ষা নাই, সেই মধুর নাম শুনিয়াই প্রভু অমনি বাহ্য হারাইলেন এবং আনন্দিত চিত্তে সকলের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ছাত্রগণ বিস্মিত হইয়া শুনিতেছেন—প্রভু প্রতি সূত্র, বৃত্তি ও টীকা হইতেই সেই ভুবন মঙ্গল হরিকথা বাহির করিতেছেন—

"প্রভু বলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ বিনু না বোলয়ে আন॥"

হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে যা'য় বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য বচনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥"

ছাত্রগণ দেখিতেছেন তাঁহাদের গুরুদেবের নয়ন হইতে কি এক অপার্থিব জ্যোতি নির্গত হইতেছে। তখন তাঁহার প্রতি তাঁহাদের আর মনুষ্যজ্ঞান রহিল না। তাঁহারা তন্ময় চিত্তে শুনিতে লাগিলেন, নিমাই চাঁদ ভক্ত পণ্ডিত মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

"মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়।
করুণা সাগরকৃষ্ণ জগত জীবন।
সেবক বৎসল নন্দ গোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণের ভজনা ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনাকরে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহিমরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥"

কি সুন্দর কথাগুলি। প্রভুর মুখ দিয়া যেন সুধাবৃষ্টি হইতেছে। ভক্ত মণ্ডলী নির্নিমেষ নেত্রে প্রভুর মুখারবিন্দ পানে তাকাইয়া তাকাইয়া সে সুধারাশি পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছেন। আহা! গৌরহরি যাহাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের কি আর ভব যন্ত্রণা

ভয় আছে? প্রভু তখন সেই করুণাময়ের করুণ কাহিনী ছাত্র মণ্ডলীকে শুনাইতে লাগিলেন।

"পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান।
হেনকৃষ্ণ ছাড়ি লোকে করে অন্য মন॥
অঘাসুর হেন পাপি যে কৈল মোচন।
কোন দুঃখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগৎ পবিত্র।
না ব'লে দুঃখিত জীব তাহার চরিত্র॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্য গীতে কয়য়ে মঙ্গল॥
অজামিল নিস্তারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন কুল বিদ্যামদে তাহা নাহি জানে॥
শুন ভাই সব সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণের পাদ পদ্ম ধন॥
যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী পরকাশ।
হেন পাদ পদ্ম ভাই সবে কর আশ॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥"

ছাত্রগণ তখন তাঁহাকে পরম ব্রহ্ম ও মুর্ত্তিমান শব্দরূপে দেখিতেছেন। তিনি ভক্তির দিক দিয়া যে শব্দের যাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাই সত্য হইতেছে। কাহার সাধ্য তাহা খণ্ডন করে? এমন যে হইতে পারে তাহা কেহ ভাবেন নাই। সকলেই একেবারে মোহিত, প্রভুরও বিহ্বল অবস্থা। কিছু বাহ্য পাইয়া বলিলেন—

"সহজেই শব্দ মাত্র কৃষ্ণ সত্য কহে।
ঈশ্বর যে বাখানি তা কিছু চিত্র নহে॥"

বলিতে বলিতে সম্পূর্ণ বাহ্য পাইলেন। তখন শিষ্যমণ্ডলীর মুখের দিকে তাকাইয়া বড়ই লজ্জিত হইয়া গেলেন। বলিলেন, ভাই সব আমি আজ কি রকম পড়াইলাম, তাঁহারা বলিলেন আমরা—কিছুই বুঝিলাম না, আপনি যত

কিছু ব্যাখ্যা করিয়াছেন সমস্তই কৃষ্ণ কথায় পূর্ণ। আপনার ব্যাখ্যা বুঝিবার পাত্র দেখিনা। প্রভু তখন হাসিলেন, বলিলেন ভাই সব আজ আমার পাঠ থাক, চল সবে গঙ্গাস্নানে যাই। তখন সকলেই প্রভুর কথায় পুঁথিতে ডোর দিয়া তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সুরনদী জলে অবগাহন করিতে চলিলেন। ছাত্র মণ্ডলী পরিবেষ্টিত পূর্ণ চন্দ্র প্রতীম শ্রীগৌরাঙ্গ চঞ্চল হইয়া স্নান করিতেছেন আর নদীয়ার ভাগ্যবান নরনারীবৃন্দ মুগ্ধনেত্রে তাহা দর্শন করিতেছেন, পরস্পর সকলে বলাবলি করিতেছেন, আহা! ইহার জনক জননী না জানি কতই ভাগ্যবান। প্রভুর পরশ লাভ করিয়া নদী দেবীও যেন আনন্দে তরঙ্গ ভঙ্গ ছলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে প্রভু গৃহে গমন করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও পাদ ধৌত করিয়া তুলসী তরুটীতে জল সিঞ্চন করিয়া স্নান করাইয়া দিলেন। অতঃপর যথারিতি গৃহ দেবতার পূজা করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে বসিলেন। মাতা তুলসী মঞ্জুরীর সহিত দিব্য থালে দিব্য অন্ন দিলেন। প্রভুও,—

"বিশ্বকসেনেরে তবে করি নিবেদন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ করয়ে ভোজন॥"

ক্রমশঃ
শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী

(পরিব্রাজক "ভুলুয়া বাবা" লিখিত)

যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে পরমাপ্রকৃতি ও পরমপুরুষ বলিয়া উপাসনা করেন, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের শরণাগত হইয়া, ছয় গোস্বামী প্রণীত শাস্ত্রানুসারে সাধনা করেন, এবং যাঁহারা সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে কেবল মাত্র অনন্য ভক্তিবলে লাভ করিতে পারাযায় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা মাধুর্য্যই অথবা শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলার শ্রবণ কীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণব মহাজনগণ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা অবলম্বন করিয়া, বহু বহু পদাবলী রচনা করিয়া, বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণের শ্রবণকীর্ত্তনের সুবিধা করিয়া গিয়াছেন।

প্রেমের নাম অনুরাগ। বহুপ্রকার অনুরাগ আছে,—যেমন প্রভু-ভৃত্যে অনুরাগ, পিতা পুত্রে অনুরাগ, সখায়-সখায় অনুরাগ, গুরু-শিষ্যে অনুরাগ, রাজ্যের প্রতি রাজার অনুরাগ, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অনুরাগের মধ্যে প্রকৃতির সহিত যে পুরুষের অনুরাগই তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই অনুরাগের মধ্যে পতিপত্নীর

অনুরাগ, সত্যবানের প্রতি সাবিত্রী দেবীর অনুরাগ, রঘুকুলতিলক রামের প্রতি জনক নন্দিনী সীতা দেবীর অনুরাগ, আমরা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দর্শন করি, মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করি এবং উল্লাসে অধীর হইয়া কীর্তন করি। আবার এই অনুরাগের নূতন অবস্থায়—নবানুরাগের সময়—কিশোর কিশোরীর অনুরাগ বা যুবক যুবতীর অনুরাগ যে অনুরাগ আদরসের মধ্যে নিমজ্জমান—যাহার প্রভাব ও পরিণতির সীমা সংখ্যা থাকে না,—উদ্বেলিত জলরাশির মত দুকুল ভাসাইয়া, ঘৃণা লজ্জা মানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সেই অনুরাগ যুবক যুবতীকে ধ্যান ধারণার অতীত জগতে লইয়া যায়। সেই অনুরাগের পূর্ণ অভিব্যক্তি, দ্বাপর যুগে শ্রীধাম বৃন্দাবনে, সেই পূর্ণ প্রেমময় শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া,—আপনি প্রকৃতি ও পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া—একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্ত প্রেমিক সাধক মণ্ডলে, প্রেমের নিগূঢ় রহস্য প্রচারকরিতে,—পথহারা পথিককে সীমাশূন্য বালুকাময় নীরস মরু প্রান্তরে পথ প্রদর্শন করাইতে—তিনি আপনি আপনার অনুরাগ মাধুর্য্য মাখিয়া, প্রকাশকরিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম "শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী।"

শ্রীবৃন্দাবনধামের সেই কিশোর কিশোরীর লীলা-মাধুর্য্য লইয়া এখন এমন স্থান নাই, এমন দেশ নাই যেখানে তাহার সমালোচনা নাই। যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক, যাহারা বিশ্বাসী ভক্ত, সে লীলার সমালোচনা তাঁহারা একভাবে করেন, আর যাঁহারা অভক্ত, অবিশ্বাসী, ভিন্ন মতাবলম্বী, তাঁহারা তাহার সমালোচনা অন্যভাবে করেন, সে লীলার সমালোচনা পণ্ডিতগণ একভাবে করেন, মূর্খগণ অন্যভাবে করে। যাহার প্রয়োজন নাই, অনুধাবনের সামর্থ্য নাই, দূরে দাঁড়াইয়া দু'কথা বলিয়া, সেও লীলার সমালোচনা করে। সুতরাং সে লীলা অপূর্ব্বরহস্যময়, অপূর্ব্ব অদ্ভুত রসে অভিষিক্ত, এবং জগৎ প্রকাশক দিবাকরের মত জগজ্জনের নিকট সুপরিচিত।

শ্রীশ্রীজয়দেব গোস্বামী উৎকট তপস্যা দ্বারা শক্তিমান হইয়া, ভীষণ বিভিষিকাময় শ্মশান সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া, সেই কিশোর কিশোরীর লীলামাধুরী শ্রবণ কীর্ত্তন করাকেই মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং কঠোর তপস্যা প্রভাবে শক্তিমান হইয়া ধ্যান-পরায়ণ চিত্তে সেই লীলা নিরন্তর চিন্তা করিয়া, তাঁহার গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। আবার পূর্ণ প্রেমের পূর্ণাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই গোবিন্দ গতপ্রাণ গোস্বামী রচিত রসসিন্ধু গীতগোবিন্দ, অন্তরঙ্গ পারিষদ পরিবেষ্টিত হইয়া নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তনে প্রেমাবতারের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। অতএব সেই কিশোর কিশোরীর অনুরাগ মাধুরী, সংসার বিরাগী নিষ্কিঞ্চন, পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণের সাধনানন্দের মূলাধার, তাই তাঁহারা দিব ও রাত্রিকে অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়া, অষ্টকালীন লীলা কীর্ত্তনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সুমধুর ভাবে তন্ময় থাকেন।

আবার অন্য দিকে এই মধুর-লীলা রসানভিজ্ঞ অরসিকগণের, মায়া মোহকর অহঙ্কারে আত্ম-বিস্মৃত বিষয়িগণের বর্ণাশ্রমের বিধি নিষেধের গভীর অন্তর্গত কুলীনগণের উপলব্ধির বিষয়ীভূত নহে বলিয়া তাহারা এই লীলার প্রতিবাদকারী, ইহার উপাসকগণের নিন্দাকারী এবং ইহার প্রচারকগণের পথরোধকারী। তাই বলিতে ছিলাম, এই লীলা সকলেই কীর্ত্তন করে;—কেহ অনুকূলে কীর্ত্তন করে, কেহ প্রতিকূলে কীর্ত্তন করে,—কেহ শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের অনুরাগের আগুনে দহ্যমান হইয়া "হা গোবিন্দ" বলিয়া রোদন করে। কেহ লীলা স্মরণে বিরক্ত ও ক্রোধে অধীর হইয়া লীলার অসারত্ব প্রতিপাদন করে, এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিন্দা করে।

এইরূপ নিন্দা স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি যে তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ নহে, সে ব্যক্তি সে তত্ত্বের নিন্দা বা প্রশংসা যাহাই করুক না কেন তাহা দ্বারা সে তত্ত্বের কোন উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্দ্ধারিত হয় না। ব্যসন প্রিয় ভোগীকে যোগীর কর্ত্তব্য করিতে বলিলে সে যোগশাস্ত্রের শত শত দোষ দেখাইয়া দিবে। অমনোযোগী ছাত্রের পক্ষে অধ্যয়নের মত অপকর্ম্ম আর নাই। বিষয়টী যতই উত্তম হউক না কেন তাহার রসবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা কাহারও গ্রহণীয় নহে। যদি বলপূর্ব্বক কে তাহা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহা সকলের পক্ষেই কখনও বিরক্তিকর হয়, কখনও নিন্দার বিষয় হয় এবং কখনও পরিহাসের বিষয় হয়। সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে এইরূপ দৃষ্টান্তের অবধি নাই।

স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক, সর্ব্বজন প্রশংসিত মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমিক ও স্বজাতি-বৎসল মহাপুরুষগণ জন্মভূমির কল্যাণ সাধনাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং সেই লক্ষ্য অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া সাধারণ দৃষ্টিতে বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিড়ম্বিত হইতেছেন। কিন্তু এই ক্ষতি, ক্ষতি কি লাভ, এই বিড়ম্বনা যথার্থ বিড়ম্বনা কি বিজয় বৈজয়ন্তী তাহা বিচারের বিষয়।

তাঁহাদের এই সব কার্য্য অগণ্য লোকের নিকটে প্রশংসনীয় হইলেও আমাদের মত লোকের বিচারে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইয়াছে। কেবল বিসদৃশ নহে, স্থানে স্থানে উন্মাদের কার্য্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। স্বদেশ প্রেম অতিশয় উত্তম কর্ম্ম হইলেও আমাদের মত অপরিণামদর্শী, অল্পপ্রাণ অজ্ঞানের পক্ষে তাহা বোধগম্য নহে।

সেইরূপ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নামে প্রেমে যাঁহারা তন্ময়, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কুল-মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, সেই পরম-পুরুষ ও পরা-প্রকৃতির অর্চ্চনা বন্দনায় নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদের হৃদয়, তাঁহাদের আচরণ, এবং তাঁহাদের ভাব, আমাদের মত তত্ত্বজ্ঞানহীন বিষয়ান্ধ এবং উচ্চভাব শূন্য ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে অনুভব করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আমার মত লোকের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, কোন কর্ত্তব্য নাই। আমরা কেবল খাই, শুই আর ঘুমাই। আমরা মমতার বন্ধনে যেমনই কৃপণ তেমনই ইতর। কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ ত্যাগী ব্যক্তির লক্ষ্যের দৃঢ়তা ও হৃদয়ের বিশালত্ব যে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার সীমার বাহিরে থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা ত অবগুণ্ঠনবতীর মত দুই কুলের কুলবধু,—যে পথে আমাদের দুইকুল বজায় থাকে, আমাদের সেই পথেই গমনীয় এবং সেই ব্রতই গ্রহণীয়।

আমার মত যাহারা সংসারসুখের প্রয়াসী, তাহারা গোবিন্দ পূজা করিতে বসিলেও, সংসারের পূজা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা ব্রজগোপীর মত অথবা নির্ব্বিষয়ী বৈরাগীর মত, সকল কুলের মান মর্যাদা ভাসাইয়া দিয়া, ঐহিক ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া "হা গোবিন্দ" বলিয়া উন্মত্ত হওয়ার সাধনাকে বেমানান বলিয়া বিবেচনা করে। আমার মত লোকে না বুঝিলেও, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের উদ্দেশে ব্রজগোপীর সর্ব্বস্বত্যাগ ও অনন্ত অনুরাগের মহিমা বুঝিবার লোকের একেবারে অভাব ঘটে নাই। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নামে প্রেমে বিভোর হইয়া, নীরবে প্রেমাশ্রু মোচন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ "সে সৌভাগ্য হল না, পেলাম না" বলিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, সজল নয়নে, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন।

যাঁহারা বিষয়াসক্ত, দারাপুত্র পরিজনের সেবায় পরলোক-বিস্মৃত, তাঁহারা মায়ামুক্ত নির্ব্বিষয়ী শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের ত্যাগশীলতার বিষয়, কিংবা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি অনুরাগের বিষয়, অনুভব করিতে বসিলে ত উন্মাদ হইয়া যাইবেন। ত্যাগীর ধর্ম্ম ভোগীর অনুভবনীয় নহে।

আমার বেশ মনে আছে, একবার একজন খ্যাতনামা স্কুল ডেপুটী ইন্স্পেক্টর কুমিল্লার ধর্ম্মসভা হইতে বাহির হইবার সময় আমাকে বলিয়াছিলেন—"মহারাজা রামকৃষ্ণটা কি গাধাই ছিল। বেটা জয়কালী নামে পাগল হইয়া, বায়ান্নলাখ তিপ্পান্ন হাজারের সম্পত্তিটাই উড়াইয়া দিল। এই সব গাধাগুলো না জন্মিলে বাঙ্গালার রাজা জমীদারদের ঘরগুলো এমন ভাবে পড়িয়া যাইত না; এবং দেশটাও এমন দরিদ্র হইত না; কেবল একটা মিথ্যা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া জাতিটা যেমন অকর্ম্মা, তেমন অপদার্থ হইয়া গেল।"

তাঁহার হিসাবে সে কথা তিনি সত্যই বলিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা বিদ্যা-বুদ্ধির সীমা তিনি অতিক্রম করিতে অসমর্থ। তিনি হাজার হইলেও দুই শত টাকার ভৃত্য মাত্র। এই দুইশত টাকার জন্য তিনি দুই হাজার প্রভুর পদলেহন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। স্বাধীনচেতা, লক্ষ লোকের অন্নবস্ত্রদাতা, প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, মহারাজা রামকৃষ্ণের ত্যাগশীলতা ও ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহার মত লোকের পক্ষে

একবারেই অসম্ভব। তাঁহার মত দুই শত টাকার ভৃত্য মহারাজা রামকৃষ্ণের হাজার হাজার ছিল। প্রভুর অন্তঃকরণের বিশালতা যেদিন পদসেবক ভৃত্যে প্রাপ্ত হয়, সেদিন সে ভৃত্য প্রভু হইয়া যায়। প্রভু সন্তুষ্ট হইলে ভৃত্যকে সহস্র টাকা পুরস্কার প্রদান করেন, আর ভৃত্য কাহারো প্রতি সদয় হইলে, তাহাকে এক টাকা প্রদান করিয়াই দাতাকর্ণের আসন দাবী করিয়া থাকে।

প্রভুর সহিত ভৃত্যের এতদুর পার্থক্য। প্রভুর হৃদয় ভৃত্য বুঝিতে অধিকারী হয় না, তাই এত গণ্ডগোল। তাই শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি পরম ভাগবত মহাজনগণের ধ্যান ধারণা ও সাধনার বিষয় আমরা ক্ষুদ্রচিত্ত লইয়া অনুভব করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাই শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলা, যাঁহার বুঝিবার তিনিই বুঝিয়া থাকেন—যাঁহার বলিবার তিনিই বলিয়া থাকেন—আর যাহার অধিকার নাই, তিনি তার অযোগ্য বলিয়া, দূরে পরিহার করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, মথুরানিবাসী পরম ভাগবত এক বৃদ্ধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন রস শ্রেষ্ঠ। তখন সেই নবরসে অভিজ্ঞ, ভাগবতে অভিনিবিষ্ট অদ্বিতীয় বৃদ্ধ পণ্ডিত উত্তর করিলেন আদিরসই শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতের উত্তর শ্রবণ করিয়া, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমরসে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীমন্মহা-প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তিনি ভাগবতের উত্তম অধিকারী বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন।

আদিরসের এতই শ্রেষ্ঠত্ব। জ্ঞান বৈরাগ্যের অতুলনীয় আদর্শ, ভগবদ্‌ প্রেমের প্রকট মূর্ত্তি, শ্রীচৈতন্যদেবও সে রসের নাম শুনিয়াই আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। সাধারণ ভাবে পরীক্ষা করিলেও আদিরসের শ্রেষ্ঠত্ব অনেকাংশে অনুভব করিতে পারা যায়। যেখানে আদিরসের অভিনয় সেইখানেই করুণ রসের রোদনধ্বনি, সেইখানেই হাস্যরসের উল্লাস তরঙ্গ, সেইখানেই প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক বিভৎস রসের নির্য্যাতন, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সেই খানেই সমস্ত রসের সমাবেশ। যেখানে আদিরস নাই; সেখানে নব রসের সমাবেশ নাই, সামঞ্জস্য নাই, সেখানে অভিনয়ের সৌন্দর্য্য নাই, সেখানে কবির কবিত্বের কোমলত্ব নাই, স্বাভাবিকত্ব নাই, সারল্য নাই এবং কবিতা সুন্দরীর অলঙ্কার নাই; আদিরস উচ্চ হইতে উচ্চতম, এবং তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতম। তাই আদিরস রসের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমান, এবং সর্ব্বরসের মূলীভূত বলিয়া আদিরসই শ্রেষ্ঠ রস।

এই আদি রসেরই অন্য নাম কাম। আবার সূত্র ধরিয়া সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কামের নামই প্রেম। মানুষ যখন আপন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া অনন্ত বাসনায় অন্বিত হয়, তখনই তাহাকে কামুক বলে। কামুক কেবলমাত্র আপন টুকু বুঝিতে পারে;—এমন

কি তাহা ভিন্ন সে তাহার আত্মীয় স্বজনের সুখ দুঃখও উপলব্ধি করিতে পারে না। সে আপন ভোগে আপনি অন্ধ। সে কেবল তাহার কথাই শ্রবণ করিতে চায়, অন্যের কথা শ্রবণের সময় সে বধির হয়। তাই কামুক কেবল স্বার্থপর, কেবল ইতর এবং কেবলই কৃপণ। তাই সে জনসমাজে যেমন ঘৃণ্য তেমনই তিরস্কৃত।

আবার মানুষ যখন আপনার ইন্দ্রিয় সুখ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বিধি নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, জগতের নশ্বরত্ব ও জগবাসের ক্ষণস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কেবল পরকালের জন্য ব্যাকুল হয়, কেবলই সেই পরাৎপরের করুণা লাভের বাসনায় আবিষ্ট হয়, দৃষ্টি কেবল তাঁহারই শ্রীচরণ কমলে নিবদ্ধ রাখে, এবং তাঁহারই জগৎ এই জ্ঞানে অন্বিত হইয়া, তাঁহারই সন্তোষের জন্যে কেবল জগজ্জীবের সেবায় নিযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে প্রেমিক বলে। স্বকীয় সুখ, স্বকীয় স্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া, চিত্ত যখন কেবল পরকীয় সুখ ও পরকীয় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রধাবিত হয়, তখনই তাহাকে প্রেমিক বলে।

যে কাম অন্তর্মুখী ছিল, তাহা যখন বহির্মুখী হইয়া, বহির্জ্জগতকে অন্তরের মধ্যে টানিয়া লয়, তখনই তাহার নাম হয় প্রেম। যখন দুর্ব্বাদলস্থ জলবিন্দু বিপুল সিন্ধুর জলরাশিতে মিশ্রিত হয়, তখন আর যেমন তাহার বিন্দুত্ব থাকে না, সে বিন্দু তখন সিন্ধু শব্দবাচ্য হয়। সেইরূপ কামও যখন বিন্দুর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, সিন্ধুর প্রেমে মিশিয়া যায়, তখন তাহাকে আর কাম বলে না; তখন তাহা প্রেম-সিন্ধুর পবিত্র সলিল হয়,—তখন তাহা স্পর্শ করিলে সর্ব্বপাপে—সর্ব্বসন্তাপে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

দেশ কাল পাত্র বিচারে প্রয়োগের তারতম্যে যেমন গরলের নাম অমৃত হয়, কামের নামও তেমনই প্রেম হয়। যখন গরল শোধন করিয়া সান্নিপাতিক বিকারের রোগীকে খাওয়াইয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করা হয়, তখনই গরলের নাম অমৃত হয়। যে গরল প্রাণনাশক, সেই গরল প্রাণ রক্ষক হয়। সেইরূপ যে কাম প্রাণনাশক বিষ, যে কাম নরকের দুয়ার, যে কাম মানুষের আয়ুনাশক, বল নাশক, বুদ্ধি নাশক, মস্তিষ্ক নাশক, সেই কাম যখন সংশোধিত হয়, যখন আত্মসুখের—ভোগ বাসনায় পরিচালিত না হয়, কেবল মাত্র পরমেশ্বরের করুণার প্রার্থী হয়, কেবল মাত্র পর সেবায় নিয়োজিত হয়—তখনই তাহার নাম হয় প্রেম। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই কথা এই ভাবে লিখিত আছে—

"আত্মেন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা তার নাম কাম।
কৃষ্ণ সেবা সুখ ইচ্ছা প্রেম তার নাম॥"

অতএব একই বস্তু কেবল প্রয়োগের পার্থক্যে নামান্তরিত।

ক্রমশঃ

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা

তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি বন্ধু গুরু।
তুমি বিদ্যা তুমি ধন বাঞ্ছাকল্পতরু॥

দীননাথ। নিখিল জীবের তুমিই একমাত্র গতি। তুমি ভিন্ন জীবের দুঃখ দূর করিতে আর কেহ নাই। আমি তোমার তত্ত্ব না জানিয়া, তোমাকে ভুলিয়া মায়ার হাতে পুতুল বাজীর পুতুলের মত নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছি, মোহমদিরার ঘোর পরিপূর্ণরূপে আমার রহিয়াছে; তাই এখন এই নাচন কোঁদনকে ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। একবারও ভাবিতেছিনা যে এক দিন ত এই নাচন কোঁদন ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন আমার দশা কি হইবে? আমার সকল প্রকার শক্তি-ই এই মায়ার মোহিনীশক্তিতে আবৃত হইয়া গিয়াছে।

করুণানিধান। তুমি নিজগুণে আমার এই মোহ দূর না করিলে আর আমার উ'য় দেখিতেছি না। আমি যে বিপদ জালে জড়িত হইয়াছি তাহা হইতে মুক্ত করিবার কর্ত্তা একমাত্র তুমি। তুমিই আমার মাতা, পুত্রের শত সহস্র অপরাধ হইলেও যেমন স্নেহময়ী জননী পুত্রের প্রতি কুপিত হন না বরং অপরাধী পুত্রকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দিয়া নিজক্রোড়ে তুলিয়া লন, তুমিও সেইরূপ আমার সকল অত্যাচার—সকল পাপ—সকল দোষ ভুলিয়া নিজ করুণা-গুণে আমাকে তোমার চরণ পাশে টানিয়া লও। তুমিই আমার পিতা, অখাদ্র—পুত্রকে সৎ করিতে—শিক্ষিত করিতে পিতা যেমন সতত তৎপর, তুমিও তেমনি আমাকে অসৎ হইতে সতে আনয়ন করিবার জন্য অনন্তরূপে অনন্ত-

কৌশল সৃষ্টিকরিয়াছ, সন্তানের শত ত্রুটীও যেমন পিতার অশ্রদ্ধা বা সন্তানের প্রতি অযত্ন আনিতে পারে না, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, আমার এই অন্যায় অত্যাচারও তোমার তদ্রূপ কোন অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা আনয়ন করিবে না। পরন্তু তুমিই বলপূর্ব্বক আমাহেন দুর্দ্দান্ত পুত্রকে অসৎ হইতে সতে তুলিয়া লইবে। তুমিই বন্ধু—প্রকৃত বন্ধু যেমন বন্ধুর হিত ও আনন্দ বিধানে সতত তৎপর, তুমিও আমার সেইরূপ প্রকৃত হিত ও নিত্য সত্যানন্দের জন্য তৎপর। বন্ধু যেমন বন্ধুকে সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে ত্যাগকরে না তুমিও আমাকে তদ্রূপ একমুহূর্ত্তের জন্যও ছাড না। আবার গুরু যেমন শিষ্যকে প্রাণে প্রাণে কতকথা কত ভাব জাগাইয়া শিষ্যের অজ্ঞান তমঃ বিনাশকরে তুমিও আমাকে সেইভাবে জ্ঞানদান করিয়া নিত্যানিত্য—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝাইয়া দাও।

আর কত বলব নাথ! তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার বুদ্ধি, এক কথায় তুমিই আমার সর্ব্বস্বধন। তোমার বলেই আমি বলী, তোমাধনেই আমি ধনী। এখন আমার এইমাত্র প্রার্থনা, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে যেন তোমার ভাবছাড়া না হই। দীন বলিয়া—কাঙ্গাল বলিয়া যেন আমাকে ভুলিওনা।—

"ভুলনা আমায় প্রভু ভুলনা আমায়।
একপাশে একধারে প'ড়ে আছি ধরাপরে
তা ব'লে আমারে যেন ঠেলিওনা পায়।
ভুলনা আমায় প্রভু ভুলনা আমায়॥
অভাগা অশুচি ব'লে সবে যায় পায়ে ঠেলে
তুমি যদি ঠেল পায় কিহবে উপায়।
দু'ফোঁটা শান্তিরতরে সাধিলাম কত নরে
ফিরে না চাহিল কেহ চ'লে গেল হায়॥
তুমি পিতা আমি ছেলে লও প্রভু কোলে তুলে
যেওনা আমারে ফেলে ধরি দুটী পায়।
বারেক দীনের পানে নেহার নয়নকোণে
ভুলেযাও দোষ ঘাট যা' ক'রেছি পায়॥
এ পাপী তোমার কাছে ক্ষমাভিক্ষা চায়।
ভুলনা আমায় প্রভু ভুলনা আমায়॥"

———

শ্রীগুরু-পদে প্রার্থনা

হায় গুরো ! হেনদিন কবে মোর হবে।
প্রেমানন্দে মাতি মন সদাই নাচিবে ॥
কবে বা রসনা মোর ত্যজি অন্য কথা।
সদাই গাহিবে প্রেমে হরিগুণগাথা ॥
কবে বা হেরিব আমি চৌদিকে আমার।
প্রেমময় প্রেমভরা রূপটী তোমার ॥
কবে কর অন্য কাজ সব পরিহরি।
দিবানিশি রবে ব্যস্ত তব সেবাকরি ॥
চরণ অন্যত্র নাহি করি বিচরণ।
কবে হরি-লীলাক্ষেত্রে করিবে চরণ ॥
কাম কবে পরিহরি অন্য অভিলাষ।
করিবে সদাই তব শ্রীচরণ আশ ॥
অহংকার কবে মোরে ফেলে চ'লে যাবে।
তোমার সেবায় মন আনন্দে মাতিবে ॥
এইদয়া কর নাথ এ দাসের প্রতি।
কপটতা দূরে যাক্ হোক পদে মতি ॥

—•—

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১৫)

২৮।— শ্রীগুরু শ্রীপাদ বৈষ্ণবগণ করুণাকর অকিঞ্চনে।
(আমার) ঘুচাও ভ্রান্তি ত্রিতাপ অশান্তি মাতি গোরা-গুণ কীর্ত্তনে ॥
সাধন সুকৃতি সঙ্গতিহীন
কলিহত জীব পাপেতে মলিন
(আছি) কৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে কেবল
পড়িয়া এভব বন্ধনে ॥

যতদিন যায় অনর্থ বাড়ায়
অশুদ্ধ এ মন অসার চিন্তায়
(দিয়ে) গৌরসন্ধান শুদ্ধকর প্রাণ
ভক্তিপ্রেমরস সিঞ্চনে ॥
দাও প্রেমাস্বাদ ভকতসঙ্গে
ভাসাও গৌর রসতরঙ্গে
(ভজি) হরিনামযজ্ঞে প্রভু যজ্ঞেশ্বর
সুন্দর শচীনন্দনে ॥
বিশ্বরূপকয় শুন দয়াময়
পুরাও বাসনা দাও পদাশ্রয়
(মাতি) গৌরগরবে গৌর বৈভবে
গৌর মহিমা বর্ণনে ॥

---

২৯ ।—

হ্লাদে হে মোহন শ্রীরাধারমণ
পুনঃ বাঁশীটী বাজাও না ।
শুন রাধানাথ পুরাইতে সাধ
পুনঃ রাধানাম গাওনা ॥
রাধানামগেয়ে তুমি গুণধাম
বড়সাধে ধর রাধাকান্ত নাম
তাই রাধানাম তবপ্রাণারাম
সে নামে প্রাণ মাতাওনা ॥
রাধা বই কিবা আছে অলঙ্কার
ভূষণের সেযে ভূষণ তোমার
হৃদি আভরণ রাই কণ্ঠহার
তাঁর মহিমা শুনাও না ॥
রাধা অনুরাগে সতত উদাস
রাধা লাগি কর বৃন্দাবনে বাস
রাধা সুখে সুখ নাই অন্য সাধ
সে সুখ আস্বাদ দাওনা ॥

বিশ্বরূপে লও কিণে বিনামূলে
কৃতদাস করি রাখ পদমূলে
শুধু রাধানাম গাহিবার ছলে
এ দাসের আশা পূরাও না ॥

দীন—সম্পাদক

শ্রীভগবৎ চরণ-শরণ

জীব কর্ম্মঘোরে অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, এ ঘূর্ণন দূর হবে কবে? কবে জীব এ ঘূর্ণন-যাতনা হইতে মুক্ত ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবে? উত্তরে শাস্ত্র ঘোষণা করেন—শ্রীহরির চরণে শরণ ব্যতীত নহে।

"সংসারেঽস্মিন মহাঘোরে মোহনিদ্রা সমাকুলে।
যে হরি শরণং যান্তি তে কৃতার্থা ন সংশয়॥" (হঃ ভঃ বিঃ)

কিরূপে শরণ লইতে হইবে? শাস্ত্র বলেন,—যদি জীব, ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সমস্ত পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক অনন্যমনে শরণ গ্রহণ করে তবেই সেই অনন্য শরণাগতকে শ্রীভগবান শ্রীচরণে স্থানদান করেন। যথা—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ (গীতা)

নবদ্বীপে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। যে সময়ে লোকে সাধারণতঃ ব্যবহার রসেই উন্মত্ত ছিল, ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডীর বা বিষহরির গীত গাওয়াই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত, ইনি তখনকার ব্রহ্মচারী। ইনি প্রকৃতই সরল ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সাধকের সাধনকণ্টক স্বরূপ যে অভিমান, তাহা হইতে তিনি অব্যাহতি পান নাই; একজন ধার্ম্মিক লোক বলিয়া তাঁহার নিজ মনে অভিমান বেশ ছিল।

যখন শ্রীবাস গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন এবং রুদ্ধদ্বার বাটীতে প্রবেশ করতঃ এই অপূর্ব্ব প্রকাশিত অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে না পাইয়া যখন নানা জনে নানা জল্পনা কল্পনা করিতেছিল, এই ব্রহ্মচারী তখন শ্রীবাস পণ্ডিতকে ধরিয়া বসিলেন—সেই দুর্লভ সংকীর্ত্তন

দেখিতে। শ্রীবাস পণ্ডিত কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিনা অনুমতিতে কীর্ত্তনকালে তাঁহাকে গৃহে লইতে সাহস করিলেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যদিও বিধি নিষেধের অতীত বস্তু, কিন্তু তিনি লোকাচারে বিধি নিষেধের এক চুলও এদিক ওদিক করিতেন না। শ্রীভগবানের ধরাধামে আগমনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বহু কারণই থাকে; বহিরঙ্গ কারণেরমধ্যে আবার লোকশিক্ষা একটি প্রধান কারণ।

"স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।

শিশুর সকলই কোমল, শিশুর তজ্জন্য সহজেই অনিষ্টোৎপত্তি হয়। চারা-কালে বৃক্ষগণকে আবরণে ঘেরিয়া রাখিতে হয়, নহিলে রক্ষা পায় না। মানস-ক্ষেত্রে ভক্তিলতা যখন অঙ্কুরিত হন তাঁহাকেও তখন সযত্নে সংরক্ষা করিতে হয়। সংরক্ষার প্রধান উপায় একটি—বহিরঙ্গ বর্জ্জন তাই উপদেশ দিয়াছেন—

"অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন।"

স্বামী-স্ত্রীতে প্রেমালাপ হইতেছে, অগুজন সে স্থানে উপনীত হইলে সে পার্থিব প্রেমেও যখন সঙ্কোচ স্পর্শ, তখন বহিরঙ্গ সঙ্গ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম যে লুক্কায়িত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই যুগধর্ম্ম সংস্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কলিযুগ-ধর্ম্ম-সংকীর্ত্তনের অনুশীলন আরম্ভ করেন, (লোকশিক্ষার্থ) তখন শ্রীবাসগৃহে প্রথমে কপাট বন্ধ করিয়া, ভিতরে ভক্তগণ মাত্র লইয়া কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতেন, বহিরঙ্গ ব্যক্তি কেহই প্রবেশাধিকার পাইত না।

ব্রহ্মচারী প্রত্যহই শ্রীবাসকে বলিতেন, শেষে একদিন শ্রীবাস তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, বলিলেন, তোমাকে ত ভাল লোক বলিয়াই জানি, তুমি—

"ব্রহ্মচর্য্য ফলাহারে গোঙাইলা কাল॥
কোন পাপ নাহি জানি শরীরে তোমার।
তোমার আছয়ে দেখিবারে অধিকার॥"

তবে প্রভুর আদেশ নাই, অতএব তুমি সঙ্গোপনে থাকিবে। যথাকালে শ্রীবাসঅঙ্গনে কীর্ত্তনানন্দ হইতেছে, সঙ্গীত ধ্বনি উঠিয়াছে—

"কৃষ্ণরাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু মধুর নৃত্য করিতেছেন, তথায়—

"হরিবোল হরিবোল হরিবোল ভাই।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥"

এই আনন্দের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া উঠিতেছেন—"কই আজ যে আর তেমন সুখ হইতেছে না? কেন এমন ঘটিতেছে?" তারপরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কেহ কি আসিয়াছে এই বাড়ীর ভিতরে?"

তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বিনীতভাবে বলিতেছেন—

"প্রভো, পাষণ্ড কেহ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তবে একটি সদাচারী ব্রাহ্মণ, অন্নাহার করেন না, তিনি সদা পয়োপানে জীবন ধারণ করেন—বড়ই শ্রদ্ধা করিয়া নিভৃতে বসিয়া শ্রীকীর্ত্তন দর্শন করিতেছেন।"

শ্রীবাসের বাক্যে প্রভু বলিতেছেন—"তাই বল; আজ কীর্ত্তনে সেই জন্যই সুখ হইতেছে না। হায় হায়, দুগ্ধপানে নাকি ভক্তি হয়! পণ্ডিত এ কেমন ভ্রম, দুগ্ধপানে বা কঠোর আচরণে ভক্তি হয় না।" বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইলেন ও আবেশভরে কহিলেন—

"পয়পানে কেহ মোরে কভু নাহি পায়॥
চণ্ডালেও মোহর শরণ যদি লয়।
সেহো মোর, মুই তার জানিও নিশ্চয়॥"

অতএব শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা—

"তাপত্রয় বিষানলে অহর্নিশি হিয়া জ্বলে
দেহ সদা হয় অচেতন॥
রিপু বশেন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়
কায়মনে লওরে শরণ॥"

অতএব—

"গোরা দ্বিজ নটরাজে বান্ধহ হৃদয়মাঝে;
কি করিবে সংসারে শমন?
নরোত্তম দাসে কয়, গোরাসম কেহ নয়,
না ভজিতে দেন প্রেমধন॥"

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী

(পরিব্রাজক "ভুলুয়া বাবা" লিখিত।)

(২)

এই যে প্রেমের কথা বলা হইল, ইহাই সেই প্রেম, যে প্রেমের প্রভাবে মানুষ পরাৎপর পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে,—ইহাই সেই প্রেম, যে প্রেমে বিশ্ব বশীভূত হয়,—আর ইহাই সেই প্রেম, যে প্রেমের উন্মেষ হইলে মানুষ ত্রিতাপ যন্ত্রণার অবসান করিতে পারে, এবং বিনা অস্ত্রে পৃথিবী মণ্ডলে, অনন্তকালের জন্য অবাধ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে।

এই সকল লাভের প্রয়োজন কি? পরমেশ্বরকে লাভ করিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আছে। জীবের স্বভাব আনন্দ অন্বেষণ। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই আনন্দময় শ্রীবিগ্রহ। তিনি সচ্চিদানন্দময় অথবা আনন্দময়—তিনি আনন্দের সিন্ধু; আমরা সেই আনন্দ সিন্ধুর বিন্দুমাত্র। আমরা আনন্দ হইতে আসিয়াছি, তাই আবার আনন্দের দিকে যাইতে ছুটোছুটি করি; তাই আনন্দ চাই—পূর্ণানন্দ চাই। কিন্তু সে পূর্ণানন্দ কোথায়? তাহা একমাত্র সেই পরমেশ্বরে। তাই ত তাহাকে চাই। তিনি জগন্নাথ, আমি এই জগৎছাড়া নহি সুতরাং তিনি আমারও নাথ, তাই তাঁহার সেবাধিকার চাই—তাই তাঁহার সন্তোষের জন্য জগজ্জীবের কিঙ্কর সাজি। তাই তাঁহার প্রাপ্তির জন্য ব্রত করি, দান করি, যজ্ঞ করি, তপস্যা করি, নাম সঙ্কীর্ত্তন করি, সাধুসঙ্গ করি—এবং সাধুসঙ্গে বসিয়া তাঁহার গুণানুবাদ ও লীলাকীর্ত্তন করি। তিনি মুক্তিদাতা, তাই মুক্তি চাই না, সেই মুক্তিদাতাকেই চাই। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে হৃদয়ে ধরিয়া এই ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিতে পারি?

যাঁহার শীতলতায় মলয়ানীল শীতল, যাঁহার শীতলতায় প্রভাতের তৃণশির-শোভিত শিশিরবিন্দু শীতল, আমি শীতল হইবার আশায় তাঁহাকে চাই। যাঁহার শীতলতায় চন্দন শীতল, সরোবর-শোভন সুকোমল কমলদল শীতল, যমুনার জলদ বর্ণাভ জলধারা শীতল, তাঁহাকে আমার হৃদয়ের নাথ করিয়া আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিতে চাই। যাঁহার শীতলতায় ঐ অশ্বত্থের

ছায়া শীতল, ঐ শশধরের কিরণ শীতল, আমি সেই শীতলতার সিন্ধু মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার দেখিতে চাই, আমার হৃদয়ের দাবানল নির্ব্বাপিত হয় কি না? একবার দেখিতে চাই, আমার জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ম্মাকর্ম্মাম্বিত উৎকট ফলময় জীবনের নিত্যজ্বালা জুড়ায় কি না!

অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর নিজ শক্তিবলেই সৃজন, পালন ও লয় করিয়া থাকেন। যে শক্তিবলে আপনি আনন্দময় হইয়া চরাচর জগৎকে আনন্দিত করিতেছেন তাহার নাম আনন্দদায়িনী শক্তি—অথবা মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা-রাণী—শ্রীবৃন্দাবনধামের সেই আহ্লাদিনী ঠাকুরাণী। আনন্দ চাই, তাই সেই আনন্দদায়িনীর উপাসনা করিতে যাই। শুধু কি আমি একাই যাই? তাহা নহে, যে আনন্দ চায়, সে-ই যায়। তিনি বিশ্ব ভরিয়া অনন্ত মূর্ত্তিতে আনন্দের আধার হস্তে ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি আনন্দ ফল বিতরণের কল্পতরু। কেহ অর্থ, কেহ প্রভুত্ব, কেহ আচার্য্য, কেহ বিহার্য্য, আনন্দের আশায় প্রার্থনা করিতেছে, আর আমার আনন্দদায়িনী তাহাই তাহাকে প্রদান করিতেছেন। তাঁহার নামের অন্ত নাই, ভাবের অন্ত নাই, রূপের অন্ত নাই, রসেরও অন্ত নাই। তিনি একাই প্রকৃতি, একাই পুরুষ। তিনি আপনার মায়ায় আপনি বিভোর। আপনি শিব, আপনি জীব—আপনার সোহাগে, অনন্ত অনুরাগে আপনি আবদ্ধ হইয়া কখনও রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন। তিনিই আনন্দময়, তিনিই আনন্দময়ী। অথবা তিনিই রাধা, তিনিই কৃষ্ণ।

এখন কোন্ মন্ত্রে, কোন সাধনায়, সেই সর্ব্বলোক শীতলকারী সর্ব্বরস-সিন্ধু মহারাসরসিকেশ্বরকে আমার দীনহীনের ক্ষুদ্রগৃহে উপস্থিত করাইতে পারি, তাহারই অনুসন্ধান আমার অবশ্য করণীয়, এবং তাহারই উপদেশ আমার অবশ্য গ্রহনীয়।

সে উপদেশ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের করুণা প্রদীপ্ত। তাঁহারই শ্রীচরণ কমলের প্রভায় অপরূপ কান্তি-সমন্বিত, অজ্ঞানান্ধকার নাশক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর অপূর্ব্ব লেখনী,—ললিত কোমল কবিতার সমুজ্জ্বল ছন্দে, প্রকাশ করিয়াছেন—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম বীজ কাম গায়ত্রী যাহার সাধন॥"

এইবার সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু সংশয় নাশ করিয়া ভক্তি বিশ্বাসের

সঙ্গে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকার না পাইলে সাধনায় প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন ? কাম-বীজ কি, কাম-গায়ত্রী কি, কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাধনা করিতে হয়, সে সাধনার ক্রম কি, জপ কি, তপস্যা কি, পুরশ্চরণ কি, হোম কি, অভিষেক কি ইত্যাদি তত্ত্ব কে শিখাইবে ? এইবার আমার অনুসন্ধানের প্রয়োজন আসিল। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে অনুসন্ধানের প্রণালী বলিয়া দিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

তাহা হইলে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকটে যাইতে হইবে,—প্রণামাদি দ্বারা, সেবাদি দ্বারা, অগ্রে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে, পরে তিনি সন্তুষ্ট হইলে যথোপযুক্ত সাধনতত্ত্ব শিখাইয়া দিবেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ লীলার রসতত্ত্ব তখন উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। পরম পুরুষের সঙ্গে পরমা প্রকৃতির রাস রসতত্ত্ব তখন অনুভূত হইবে। অতএব যিনি সেই কামবীজ কাম-গায়ত্রীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে বাসনা করেন, অথবা নিরন্তর কামক্রীড়ারত ধীর ললিত শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব অনুভব করিতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে তত্ত্ব-দর্শী নিষ্কিঞ্চন সাধকের শরণাগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কৃষ্ণের স্বভাব হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত ॥"

এই কামক্রীড়া বা আদিরস-তত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, ও রাজর্ষি জনকের ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষ রায় রামানন্দের আলোচ্য বিষয় ছিল। তেমন ত্যাগী, তেমন যোগী, তেমন মেধাবী, তেমন পণ্ডিত, তেমন প্রেমিক এবং তেমন সরস না হইলে, তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় অন্যের নিকট কিরূপে অনুভবনীয় বা আদরণীয় হইতে পারে ? খনির কণক তুলিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যশালী সওদাগরই উৎসাহী হইয়া কর্ম্মরত হয়, খাদ মিশ্রিত কণক দরিদ্রের বিত্তাপহারী, লোভী, চোর তস্করে তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। চোর তস্করেও কণক চায় কিন্তু কণকের আধার খনির গর্ভে প্রবেশ করিতে চায় না। সেইরূপ আনন্দ-লোভী মায়াবদ্ধ মানবও আনন্দ চায়, কিন্তু পূর্ণানন্দের খনির দিকে না তাকাইয়া, ক্ষণস্থায়ী আনন্দের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রণয়-মাধুরীর মনোরম মূর্ত্তি, করুণার সিন্ধু পতিত-পাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু এবার প্রেমাশ্রুর সিন্ধু নয়নে বান্ধিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আনন্দ-প্রয়াসী অথচ পথহারা মানুষকে আনন্দের যথার্থ পথ প্রদর্শন করাইবার জন্য, সংসার সুখের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে পাহাড়ে পর্ব্বতে, প্রান্তরে জঙ্গলে, নগরে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, সেই প্রেমাশ্রু ধারায় ভূতল ভাসাইয়া, সমস্ত জীবগণকে পরমানন্দময় পুরুষের সেবার আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার মাধুর্য্য প্রেমাশ্রু-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া, নীরস প্রাণহীন জগতের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন;—আর ভাবিয়াছিলেন, যদি আবার নীরস হৃদয় সরস হয়,—আবার জীবনহীন প্রাণ বিশ্বপ্রেমের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়,—আবার কামুকের দল প্রেমিক হইয়া, হিংসা নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া, পরম ধর্ম্ম পরসেবায় নিযুক্ত হয়, এবং আবার সরস প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, প্রশান্ত সাগরের তীরবর্ত্তী বালুকারাশি একত্রীকৃত ও দৃঢ়ীভূত হইয়া, সুকঠিন প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয়। আবার তাহাদের বিজয় বৈজয়ন্তী হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে উড্ডীয়মান হইয়া, দূর দূরতম সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদকারী বৈদেশিক অর্ণবজান সমূহের নয়নে, বিস্ময়ের তরঙ্গ উৎপন্ন করে।

যাঁহারা সেই পতিত-পাবনের প্রেমাশ্রুপাত দর্শন করিয়া, জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই করুণাসিন্ধুর করুণার আহ্বান যাঁহাদের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়াছিল, যাঁহাদের হৃদয় শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলার সুমধুর সঙ্গীতরসে বিগলিত হইয়াছিল, তাঁহারা আপন আপন ভাবে বিভোর হইয়া প্রেমের হস্ত প্রসারিত করিয়া, সকলকেই সেই পরমানন্দের পথ-প্রদর্শকের অনুগত হইতে সবিনয়ে সম্বোধন করিয়াছেন।

যদি আনন্দ চাও, তবে এস, ঐ আনন্দের অবতার নিত্যানন্দময় শ্রীচৈতন্যের সমীপবর্ত্তী হই, প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষিত হই; 'জীবে দয়া' এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি; আর সেই পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির পিরীতির প্রকৃতি জগৎ ভরিয়া দর্শন করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করি। আর এমন মধুর শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলা যিনি যাচিয়া যাচিয়া দুয়ারে দুয়ারে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া বৈষ্ণবগণের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র নরহরি ঠাকুরের সুরে সুর মিশাইয়া, গাইতে থাকি—

"যদি গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত,
কেমনে ধরিত দে!
রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা
জগতে জানাইত কে?
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার,
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কার।
গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল হইয়া মন।
এ ভবসাগরে এমন দয়াল,
না দেখি যে একজন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া,
কেমনে ধরিনু দে,
নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে॥"

সত্যই ত যদি গৌর না হইত, আমার মত অভাজন, অকর্ম্মা অলসের গতি কি হইত? আমার মত সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় নিঃসহায় দুর্ভাগার উপায় কোথায় হইত? হা গৌর বলিয়া, গৌর ভক্তের দুয়ারে দাঁড়াইয়া, ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। নিঃসম্বল হইয়া পর্ব্বতে প্রান্তরে সুদুর্গম পথে, হৃদয়ের বল সংগ্রহ করিয়া থাকি। বিপন্ন হইয়া দুর্ভাগ্যের কষাঘাতে ছিন্ন চর্ম্ম হইয়া, হা গৌর বলিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকি। সুতরাং গৌর আমার অসময়ের সুহৃদ; গৌর আমার অকূলের কাণ্ডারী। গৌর নাম আমার সাধনের মহামন্ত্র, বক্ষে ধরিবার রক্ষা কবচ। এমন অধম তারণ পতিত পাবন গৌরের আবির্ভাব না ঘটিলে এই দেহ ধারণ সত্যই ত এবার অসম্ভব হইত!

যিনি যে ধনের ধনি তাঁহার নিকটে গমন করিলে, তাঁহার শরণাগত হইলে, সেই ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ লীলারসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডার, ঐ নদীয়া গগনের পূর্ণ সুধাকর শ্রীচৈতন্যদেব। যদি বৃন্দাবন লীলার আনন্দ কাননে প্রবেশ বাসনা থাকে, তাহা হইলে চল, অগ্রে ঐ শরণাগত পালকের সুপবিত্র চরণ ধূলি অঞ্জলি পূরিয়া মস্তকে মাখিয়া দেহ মন পবিত্রীকৃত করি।

ঐ পূর্ণ প্রেমাবতারের নামে প্রেমে পূর্ণাভিষিক্ত হই, এবং তাঁহার সকরুণ কটাক্ষ যদি একতিলের জন্যও লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে সেই আনন্দময় রস-সিন্ধুনীরে নিমজ্জিত হইতে আর কোন বিঘ্ন ঘটিবে না, সেই নিত্য প্রেমের নিত্যানন্দময় কাননে প্রবেশ করিতে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

"জয় হরে গৌরাঙ্গ" বলিয়া যে নাচিতে শিখিয়াছে, শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলায় সে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। লীলা মাধুর্য্য কেবল তাহার জন্য—লীলা রসামৃত পদাবলি কেবল তাহার জন্য ;—ভাবরাজ্যের তত্ত্ব প্রকাশক আলোক লহরী কেবল তাহার জন্য। আর জগতে রহিয়া, জগৎ ছাড়া ভাবে বিভোর হইয়া, দিব্যভাবের প্রভুত্ব কেবল তাহার জন্য।

যে বুঝিয়াছে, সে মজিয়াছে। সেই পরাৎপর পরম পুরুষ আপন প্রকৃতির সহিত নিরন্তর কামময় এবং সেই কামের লীলায় এই সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের স্রোত নিরন্তর সংবাহিত হইতেছে। তাই জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে যে দিকেই তাকাই সেই দিকেই দেখি, সেই কিশোর কিশোরীর অনুপম প্রেমের অপূর্ব্ব আভাস। ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে; পশু পক্ষী, মানব দানব, দেবতা গন্ধর্ব্ব পর্য্যন্ত, সেই প্রেমের ছায়ামাত্র লইয়া প্রেমের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, অকপট প্রেমের সাধনায় উদ্বুদ্ধ। যে বুঝিয়াছে, সে দিব্য জ্ঞানে দেখিতেছে,—সেই যমুনা পুলিন যেখানে সেখানে ;—সেই গোপীবল্লভের সঙ্গে গোপীগণের উল্লাস নৃত্য যেখানে সেখানে। সে দেখিতেছে আর সেই অবাঙ্মনসোগোচরকে গোচর করিতেছে। সে মায়া-মোহের অন্ধকার রাশি হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, সে এই মিথ্যা জগতে সত্য কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে,—সে প্রতিক্ষণ প্রাক্ত জীব-দেহে সেই পরাৎপরের লীলা বিলাস প্রতীক্ষণ করিতেছে ; এবং "জীবে দয়া ধর্ম্ম" তাহার মজ্জাগত হইয়াছে।

তাহার শত্রু নাই, মিত্র নাই নিকেতনের স্থিরতা নাই। তাহার জয় নাই, পরাজয় নাই, লাভ নাই, অলাভ নাই। তাহার সুখ নাই, দুঃখ নাই, মান নাই, অপমান নাই। তাহার সন্দেহ নাই, সংশয় নাই। সে এক অনির্ব্বচনীয় অনুপম ভাবে বিভোর হইয়া ভ্রাম্যমান,—এক অনুপম কান্তিতে কান্তিময় হইয়া দৃশ্যমান,—সে ভবসিন্ধুর উচ্চ তীরস্থ উচ্চ গিরিশিখরে উঠিয়া দূরদূরস্থ উর্ম্মি-মালার উন্নতি পতন দর্শন করিতে দণ্ডায়মান,। তাহার মন, তাহার ভাব, কেবল তাহার মত যে হইয়াছে তাহারই বোধগম্য।

কলিকাল আসিয়াছে, জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ; সে পরিবর্ত্তনে সত্যের

অপলাপ, ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। সত্যের সত্যতা এখন অসভ্যতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখন সত্যের অঙ্গে মিথ্যার পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া, নিজ নিজ জাতীয় বা স্বকীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, লোক-প্রতারক বিস্ময়কর মূর্ত্তি গঠিত করা হইতেছে। এখন ইতিহাস সত্যের আশ্রয়ে লিখিত হয় না। পলাশীর যুদ্ধ বর্ণন সময়ে এখন আর ক্লাইব উমীচাঁদকে ঠকাইতে ওয়াটসনের নাম জাল করে না, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় মোহন লাল আর উৎসন্ন প্রায় বৃটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে কামানের মুখ বন্ধ করে না। কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি কি ধর্ম্মনীতি, সর্ব্বত্র এখন সে-ই তত ধীশক্তিমান, যে যত মিথ্যাবাদী। এখন যে যত সত্যবাদী, ন্যায়ানুগামী, সে তত লোকাপ-কারী অপরাধী। এখন যাহা স্বাভাবিক, তাহাকে অস্বাভাবিক না করিলে আর মনের মত সুন্দর করা হয় না। তাই কাজ অপেক্ষা সাজের মূল্য বেশী, অন্তর অপেক্ষা বাহিরের আদর বেশী, এবং মানুষ অপেক্ষা অমানুষের পসার বেশী।

ভগবান শ্রীগোবিন্দ গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ গঠন করিয়াছিলেন। এখন জাতিভেদ, অর্থ ও উচ্চ পদ লইয়া নির্দ্ধারিত হয়। এখন যে যজ্ঞ, জপ, তপস্যা লইয়া নিষ্কিঞ্চন ভাবে জীবন যাপন করে, সে সম্ভ্রান্তের সভায় অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া বহিষ্কৃত হয়; আর যে, যেকোন উপায়ে ঐশ্বর্য্যশালী হয়, সম্ভ্রান্তের সভায় তাহারই উচ্চাসন প্রাপ্তব্য। এখন সকল উকিল এক জাতি, সকল ডেপুটী এক জাতি, সকল জজ এক জাতি এবং সকল কেরাণী একজাতি। এখন পদে যে যত বড়, সে তত ব্রাহ্মণ, পদের জোর যাহার যত কম, সে তত শূদ্র। অতএব জাতিভেদে এখন আর গুণকর্ম্ম নাই।

বাহিরে কেন? প্রকৃতির প্রকৃতিও এখন বিপরীত হইয়াছে। পূর্ব্বে বৃদ্ধকালে চুল পাকিত, এখন যৌবনেই চুলে পাক ধরে; পূর্ব্বে বার্দ্ধক্যে দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হইত, এখন শৈশবেই চসমার প্রয়োজন হয়, পূর্ব্বে সন্তান জননীর স্তন্য পান করিত, এখন সন্তান গোয়ালিনী মার্কা কৌটার দুগ্ধ পান করে। পূর্ব্বে সন্তান মার কোলে প্রতিপালিত হইত, এখন ঝির কোলে প্রতিপালিত হয়। প্রকৃতির এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সুতরাং মনের কেন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না? অনুরাগের সাধনার কেন বিরাগ দৃষ্টি গোচর হইবে না? তাই সত্য এখন অশ্লীলতা, সত্য এখন মত্ততা এবং সত্য এখন বর্ব্বরতা। তাই কিশোর কিশোরীর সে প্রেম সত্য এবং স্বাভাবিক,—যে প্রেমে যে অনুরাগে সভ্যাসভ্য

সকলেই উন্মত্ত, সে অনুরাগের পূর্ণ অভিব্যক্তির ইতিহাস এখন অশ্লীল বলিয়া উপেক্ষণীয়।

তাহা হউক না কেন। লবণাক্ত সমুদ্রের মধ্যেও স্বচ্ছ সলিলের ধারা থাকে, অগ্নিময় মরু ভূমির মধ্যেও উর্ব্বর ভূমিখণ্ড থাকে। এত মিথ্যার, এত প্রতারণার মধ্যেও সত্য-প্রিয়, সত্য পক্ষপাতী সাধক নিশ্চয়ই আছেন। যাঁহারা স্বভাবের সত্য দর্শন করিয়া আনন্দিত হন,—যাঁহারা সেই পরম পুরুষের অবতার লীলার কীর্ত্তন শ্রবণে জীবনকে কৃতার্থ বোধ করেন,—যাঁহারা শ্রীশ্রীগোবিন্দ লীলায় বীরত্ব, ধীরত্ব ও মধুরত্বের আলোচনাকেই প্রধান সাধনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সরস পদাবলী তাঁহাদের জন্য। যাঁহারা হা গোবিন্দ বলিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করেন, অনুরাগের কীর্ত্তন তাঁহাদের জন্য। জগতের নশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাঁহারা সমাজের বেষ্টনী ভঙ্গ করিয়াছেন, এবং জঞ্জাল জাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রণয় মাধুরীর লীলারসাস্বাদন তাঁহাদের জন্য। অলমিতি। *

গয়াপ্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ

(২)

জগতের মাতা শচীদেবী সম্মুখে বসিয়া পুত্রকে ভোজন করাইতেছেন, আর পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহ মধ্য হইতে দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন করিয়া অনন্ত সুখসাগরে ভাসিতেছেন। মাতা পুত্রে তখন কথা আরম্ভ হইয়াছে।

---

* পরিব্রাজক "ভুলুয়াবাবার" পরিচয় বোধহয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। শিক্ষিত সমাজ "ভুলুয়াবাবার সহিত বহুদিন হইতেই পরিচিত। শ্রীশ্রী কালীকুণ্ডলিনী, শ্রীশ্রী ব্রহ্মহরিদাস ঠাকুর, শ্রীশ্রী হরিবোল ঠাকুর, শ্রী সঙ্কীর্ত্তনতরঙ্গিণী ও সদ্ভাব তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই সকলের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন। সম্প্রতি শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের লীলা বর্ণনাকরিয়া ইনি শ্রীশ্রী ব্রজমাধুরী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পদগুলি আলোচনা করিলে মনে হয় বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণের পদাবলী পাঠকরিতেছি। পদগুলির কবিত্ব ও রচনাকৌশল এবং ভাবমাধুর্য্য আস্বাদনের বিষয়। এই প্রবন্ধটী আমরা তাঁহার উক্ত ব্রজমাধুরীর আভাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। স্থানাভাবে পদাবলীর নমুনা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। আগামীবারে ২।১টী পদ ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল। (ভঃ সঃ)।

মা বলিতেছেন, বাবা, আজ কি পুঁথি পড়াইলে, আর কাহার কাহার সহিতই বা কোন্দল করিলে? প্রভু বলিলেন—মা, আজ পরমসত্য কৃষ্ণ নাম পাঠ ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম। মা, যাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক তাঁহারাই সত্য, সেই শাস্ত্রই শাস্ত্র যাহাতে কৃষ্ণ ভক্তির বর্ণনা আছে, অন্য যে শাস্ত্র তাহা পাষণ্ডের জন্য। জৈমিনী ভারতে অশ্বমেধ পর্ব্বে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"যস্মিন শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥"

আরও বলিলেন,—

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎপথে চলে ॥"

কপিলদেব নিজ জননী দেবহুতির নিকট যে সমস্ত তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন তিনিও তখন তাহা শচীর নিকট বিবৃত করিতে বসিলেন। মা, কৃষ্ণ ভক্তির প্রভাব যে কত তাহা শোন। কৃষ্ণ সেবকের কখনও বিনাশ নাই। কালচক্রও তাহাকে দেখিয়া ভীত হয়। জীব মাতৃগর্ভে থাকিয়া কত যন্ত্রণা ভোগ করে কিন্তু যে কৃষ্ণের সেবক, তাহাকে তাহার কিছুই জানিতে হয় না। কৃষ্ণ জগতের পিতৃতুল্য, তাঁহাকে না ভজনা করিলে পিতৃদ্রোহী হইতে হয়, পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্মান্তরেও যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার নাই। মা, বিবেচনা করিয়া দেখ, কৃষ্ণ না ভজিলে জীব কত দুঃখ পায়। পুনঃ পুনঃ গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সে যন্ত্রণা কত ভীষণ। জননী কটু, অম্ল বা লবণ খাইলে তাহা উদরস্থ সন্তানে স্পৃষ্ট হইয়া তাহাকে যাতনায় মূর্চ্ছিত করে। কখনও বা গর্ভস্থ কৃমিকুল তাহার গাত্র মাংস কাটিয়া কাটিয়া খাইতে থাকে। সে সব যন্ত্রণা দূর করিবার তাহার শক্তি কোথায়? তাহার ত তখন নড়িবারও ক্ষমতা থাকে না! নিশ্চষ্ট ভাবে ক্ষুদ্র পঞ্জরের মধ্যে পড়িয়া থাকে। কর্ম্মফল ভুগিতে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কোন কোন পাপাত্মার জন্মই হয় না; গর্ভ হইতে গর্ভান্তরে অনবরত ভ্রমণ করিতে হয়। মা, আবার জীবতত্ত্ব শুন, গর্ভমধ্যে সাতমাসে তাহার জ্ঞান জন্মে, তখন তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আইসে, সে আবার এক অকথ্য যাতনা। তাহার তখন ঘন ঘন শ্বাস আরম্ভ হয় এবং অতি দুঃখে কৃষ্ণের স্তব করিতে থাকে—হে জগৎজীবন কৃষ্ণ, তুমি আমার প্রাণনাথ তুমি আমাকে

রক্ষা কর। জ্ঞান হীন জীব তোমা ব্যতীত আর কাহার নিকট তাহদের দুঃখ নিবেদন করিবে? প্রভু! যে বন্দী করে সেই ত আবার নিষ্কৃতি দেয়; যে সহজেই মৃত তাহ'র উপর আবার মায়া জাল বিস্তার কেন? প্রভু! মিথ্যা ধন ও পুত্রাদি লইয়া জীবন যাপন করিয়াছি, তোমার শিব-বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত অমূল্য পাদপদ্ম দিনেকের তরেও স্মরণ করি নাই। কত অধর্ম্মই না করিয়া পুত্রকলত্রদিগকে পালন করিয়াছি তাহারা এখন কোথায়? এখন আমি কৃত পাপের কি ঘোর প্রায়শ্চিত্তই না ভোগ করিতেছি। হে দয়াময়, অসময়ের বন্ধু তুমিই এখন আমাকে এ বিপদ হইতে ত্রাণ কর। হে কৃষ্ণ! তোমার চরণই যে সত্য তাহা আমি এখন বেশ বুঝিতেছি। সুতরাং হে দেব, আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি আমাকে রক্ষা কর। তুমি ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান, আমি তোমাকে ভুলিয়া মত্ত চিত্তে অসৎপথে বিচরণ করিয়াছি। অতএব,—

"উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলাঙ এবে কৃপা কর মহাশয়॥
এই কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি।
যেথানে সেথানে কেনে জন্মিয়া না মরি॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণব জনের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥"

তাহাপেক্ষা গর্ভবাস জনিত এই যে অতীব দুঃখ ইহাও ভাল, যদি তোমার স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরিত থাকে। যেখানে জন্মিলে তোমার পাদপদ্ম স্মরণ পথে উদিত হয় না, হে প্রভু! এই কর যেন তথায় আমার জন্ম না হয়। এখন বুঝিতেছি স্বীয় কর্ম্মফলে আমি এই মত দুঃখ কোটি কোটি জন্ম ভোগ করিয়াছি। কিন্তু হে দেব, যদি তোমার কথা না ভুলি তাহা হইলে সে দুঃখ, সে বিপদ জন্ম জন্ম আমার থাকুক ইহাই আমি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি।

"হেন কর এবে কৃষ্ণ দাস্য পদ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়া॥

বারেক করহ যদি এ দুঃখেতে পার।
তবে তোমা বই প্রভু না গাইমু আর ॥"

গর্ভবাস জনিত যাতনা যে জীব এইরূপে কৃষ্ণ স্মৃতির প্রভাবে ভুলিয়া থাকে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এইরূপ স্তব প্রভাবে তাহাকে আর গর্ভবাস জনিত যাতনা সহিতে হয় না। কালে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। মা! আরও শোন, জন্ম মাত্রেই জীব জ্ঞান শূন্য হয়। মূর্চ্ছিত হইয়া কখন কাঁদে, কখন হাসে তাহার কিছু স্থির থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে হইলে মায়া ফাঁদ ছেদন করিতে হইবে। ভাগ্যবান যেই সেই এই মায়ার হাত এড়াইয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে পারে।

এইরূপ নানা মতে প্রভু জননীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। শয়নে জাগরণে ভ্রমণে ভোজনে কোন কালেই শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ব্যতীত তাঁহার আর অন্য চিন্তা ছিল না। ভক্তগণ এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইতেছেন, আবার ভাবিতেছেন যে, না জানি ইহার শরীরে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রই বা আবির্ভূত হইলেন! অথবা সাধু সঙ্গ বা পূর্ব্বজন্মের সংস্কারে ইনি এই ভাব পাইয়াছেন? যাহা হউক সকলেই বড় আনন্দিত হইলেন যে পাষণ্ডীগণের এবার আর রক্ষা নাই।

মহাপ্রভু এদিকে জগৎময় শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছেন আর শ্রীবদনে অনবরত কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে।

"যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি ভাসে ॥"

পরদিন প্রাতঃকালে ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থে আসিয়া সমবেত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও পূর্ব্ব অভ্যাস মত তাঁহাদিগকে পাঠ দিতে বসিলেন। পাঠ দিতে যাইতেই কিন্তু তাঁহার ভাব আসিল তিনি বিহ্বল হইলেন, কৃষ্ণ কথা ব্যতীত তাঁহার মুখে আর কিছু আসিল না।

"সমাম্নায় সিদ্ধবর্ণ বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥
শিষ্য বলে বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে।
প্রভু বলে কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের কারণে ॥

শিষ্য বলে পণ্ডিত উচিত ব্যখ্যা কর।
প্রভু বলে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মর॥
কৃষ্ণের ভজন কহ সম্যক আম্নায়।
আদি অন্ত মধ্য কৃষ্ণ ভজন বুঝায়॥

প্রভুর এই সমস্ত অপরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া শিষ্যগণ হাসিতে লাগিলেন। অনুমান করিলেন তাঁহাদের নবীন অধ্যাপকের বায়ু রোগ জন্মিয়া থাকিবে। তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন? প্রভু বলিলেন, কেন আমিত ঠিক শাস্ত্র মতই ব্যাখ্যা করিতেছি। আচ্ছা, তোমরা যদি ভাল বুঝিয়া না থাক তাহা হইলে বৈকালে আসিয়া সমবেত হইও, আমি আরও ভাল করিয়া বুঝাইব। নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া তাঁহারা পুঁথিতে ডোর দিয়া গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে খট্‌কা লাগিয়াছে—পণ্ডিতের ব্যবহার যেন কি রকম ঠেকিতেছে। সকলে পরামর্শ করিয়া ঠাকুরের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গমন করিলেন। বলিলেন, নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বে ভাল ছিলেন, কিন্তু এখন যেন অন্য রকম দেখিতেছি। তাঁহার সমস্ত কথাই হরি কথায় পূর্ণ। গয়া হইতে আসিয়া অবধি কৃষ্ণ কথা ব্যতীত তাঁহার শ্রীমুখে আর কিছুই স্ফুরিত হইতেছে না। কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হয়।

"প্রতি শব্দে ধাতু সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥
এবে তাঁর বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি সব বলহ পণ্ডিত॥"

আহা! দেবতারাও যাঁহার চরিত্র বুঝিতে অক্ষম, সামান্য মানবে তাঁহা কিরূপে ধারণা করিবে। উপাধ্যায় শিরোমণি পণ্ডিত গঙ্গাদাস পড়ুয়াদের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন ভাল, ভাল; এখন তোমরা যাও, আমি তাহাকে বৈকালে ডাকাইয়া ভালরূপে বুঝাইয়া দিব যাহাতে তিনি ইহার পর হইতে মনোযোগ দিয়া তোমাদিগকে অধ্যয়ন করান। সেই সময় তোমরাও তাঁহার সহিত আসিও, তোমাদের সাক্ষাতেই সমস্ত বলিয়া দিব।

ছাত্রগণ ইহাতে অতীব আনন্দিত হইয়া গমন করিলেন এবং যথাকালে বিশ্বম্ভরকে সমভিব্যাহারে লইয়া গুরু গঙ্গাদাসের টোলে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বম্ভর গুরুকে দেখিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার পদধুলি শিরে লইলেন। বিদ্যাসর্ব্বস্ব পণ্ডিত তাঁহাকে বিদ্যালাভ হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—বলিলেন, বাবা বিশ্বম্ভর, ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অধ্যাপক হওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। পরম পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তোমার মাতামহ, মিশ্র পুরন্দর জগন্নাথ তোমার পিতা, এ দুই কুলের কেহই মূর্খ নয়। তুমিও পরম পণ্ডিত বিখ্যাত টীকাকার। অধ্যয়ন করান ত্যাগ করিলেই কি ভক্ত হয়? তাহা হইলে তোমার পিতা, পিতামহ মাতামহ কি ভক্ত ছিলেন না? বাপু, ও সমস্ত ছেলেমানুষি বুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া অধ্যাপনা করাও। নতুবা লোকে সৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া কিরূপে বুঝিবে? পণ্ডিত বলিয়াই বা কিরূপে চিনিবে? যাও, আমার দিব্য, যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করিয়া ভাল মতে অধ্যাপনা করাইবে। প্রভু বলিলেন, দেব! আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে নবদ্বীপে আমার সহিত পারিবে এমন কাহাকেও দেখি না। আমি অতঃপর যেরূপ ভাবে সূত্র ব্যাখ্যা করিব, আসুক দেখি কে তাহা খণ্ডন করিতে পারে। গুরু তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যের এই তেজোদীপ্ত বাক্যগুলি শুনিয়া বড়ই সুখ পাইলেন।

"গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতী পতি শিষ্য যার॥
আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য।
যার শিষ্য চতুর্দ্দশ ভুবন আরাধ্য॥"

তারকা বেষ্টিত পূর্ণ শশধর-প্রতীম প্রভু বিশ্বম্ভর ছাত্রগণ সঙ্গে চলিলেন। যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র বান্ধা ভুবনমোহন রূপ, নবীন বয়স, যে দেখিতেছে সেই মোহিত হইতেছে। অদ্ভুত ক্ষমতাবলে, প্রভু সূত্রের যুগপৎ খণ্ডন ও স্থাপন করিতেছেন। গঙ্গাদর্শনগামী অধ্যাপকগণ এই বিচিত্র অধ্যাপকের বিচিত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া একেবারে মোহিত হইতেছেন। তর্ক বিতর্ক করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আদৌ নাই। প্রভু সেদিন আবেগ ভরে সূত্র অর্থ করিয়া যাইতেছেন। রাত্র যে চারিদণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা আর কাহারও হুঁস নাই। এই অবস্থায় তিনি এক নাগরিকের দুয়ারে গিয়া বসিলেন। ইনি

একজন ভাগ্যবান ভক্ত, নাম রত্নগর্ভ আচার্য্য। প্রভুর পিতার সহিত তাঁহার একই গ্রামে জন্ম হয়।

"ভাগবতে পরম আদর দ্বিজবর।
ভাগবত শ্লোক পড়ে করিয়া আদর॥"

তথাহি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে।

শ্যামং হিরণ্য পরিধিং বনমাল্যবর্হ—
ধাতু প্রবাল নটবেশ মনুব্রতং মে।
বিন্যস্ত হস্ত মিতরেন ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলাল কপোল মুখাব্জহাসম্॥

বড়ই নিবিষ্ট চিত্তে ভক্তিযোগের এই শ্লোকগুলি তিনি পাঠ করিতেছিলেন। প্রভুর কর্ণে যেমনি ইহা আসিয়া প্রবিষ্ট হইল তিনি অমনি প্রবল প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ছাত্রগণ বিস্মিত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহ্য দৃষ্টি পাইয়া প্রভু বোল বোল বলিতে বলিতে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আর মাঝে মাঝে বলিতেছেন—তোমরা সকলে হরিবোল হরিবোল বল। সেই অশ্রু কম্প পুলকাদি পরিশোভিত ভাবময় তনুখানি সকলেরই পরম চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল। বিপ্র রত্নগর্ভ প্রভুর এই মহা ভক্তিভাব দেখিয়া রঙ্গভরে আরও শ্লোক পড়িয়া যাইতে লাগিলেন তাঁহার এই ভক্তিভাবে ভক্তিযোগের পঠন শুনিয়া প্রভু বড়ই তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন। স্বয়ং প্রেমদেবতার আলিঙ্গন পাইয়া বিপ্রবর প্রেমে পূর্ণ হইলেন। আর প্রভুর চরণ দু'খানি ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে শ্লোক পড়িতে লাগিলেন, প্রভুও অমনি হুঙ্কার করিয়া বোল বোল বলিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া সকলের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া দিব্য ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, যে সমস্ত নগরবাসী তখন সেই পথ দিয়া গমনাগমন করিতেছিলেন তাঁহারা দেবতার এই সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রেম ভরে প্রণিপাত করিতেছিলেন। প্রভুও ঘন ঘন মূর্চ্ছিত হইয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছিলেন। প্রভুর অতি প্রিয় গদাধর এ দৃশ্য দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি রত্নগর্ভকে আর শ্লোক পড়িতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া সকলেই উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বাহ্য পাইয়া লজ্জিত ভাবে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম?" পড়ুয়ারা বলিলেন,

"দেব আপনিই ধন্য, আমাদের কি ক্ষমতা আছে, আপনাকে আমরা আর কি বলিব ?" প্রভু তখন সকলকে লইয়া গঙ্গা দর্শন করিতে গমন করিলেন। সকলে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া গঙ্গা প্রণাম করিয়া তাহার জল শিরে লইলেন। পূর্ব্বে যেরূপ যমুনার তীরে বসিয়া শ্রীনন্দের নন্দন গোপিকাগণের সহিত আনন্দ করিতেন, শচীনন্দন শ্রীগৌরহরিও সেইরূপ ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতক্ষণ কাটিলে তিনি সকলকে বিদায় দিয়া গৃহে গমন করিলেন।

গৃহে শচীমাতা বিবিধ ব্যঞ্জন বাঁধিয়া পুত্রের পথ চাহিয়া আকুলভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রটীর কিন্তু কোন দিকেই নজর ছিল না। কোনরূপে ভোজন কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন।

নিশি প্রভাত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে পড়ুয়াগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। প্রভুও সত্বরে গঙ্গাস্নান করিয়া তাঁহাদিগকে পাঠ দিতে গমন করিলেন। কিন্তু পুস্তক হস্তে লইয়াই আবার পূর্ব্ব মত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অধ্যাপনা করিতে গিয়া কৃষ্ণ কথা ব্যতীত মুখে যে আর কিছুই আইসে না। তিনি প্রতি শব্দ হইতেই কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"পড়ুয়া সকলে বলে ধাতু সংজ্ঞাকার।
প্রভু বলে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিনাম যার॥
ধাতু সূত্র বাখানি শুনহ ভাইগণ।
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন॥

এই যে সমস্ত প্রবল প্রতাপশালী রাজগণ রহিয়াছেন—যাঁহাদের দিব্য কলেবর গন্ধ চন্দনে সুবাসিত ও বহুমূল্য অলঙ্কারে পরিশোভিত—তাঁহাদের দেহের ধাতু—দেহের শক্তি—যখন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে, তখন তাঁহাদের সে সৌন্দর্য্য সে বিলাসিতা কোথায় থাকে ? ইহা অতি সত্য কথা। আমরা এক স্থানে পড়িয়াছিলাম,—

"শক্তি শূন্য হ'লে শব শক্তিযুক্ত শিব।
শক্তিই পরম বস্তু শক্তি ভজ জীব॥"

এ সম্বন্ধে প্রভু আরও বলিতেছেন,—

"ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহ ভস্ম হয় কারে এড়েন পুতিয়া॥

সর্ব্ব দেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহা সনে কর স্নেহ তাহানে সে ভক্তি॥
ভ্রমবসে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥"

তিনি বলিতে লাগিলেন দেখ, এখন যাকে আমরা মান্য করি, দেখিলে প্রণাম করি—যখন তাহায় ধাতু অর্থাৎ প্রাণ যায় তখন আহাকে স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হয়। পুত্র যে বাপের স্নেহকোলে লালিত, ধাতু শূন্য হইলে সেই পিতার মুখে সে অগ্নি প্রদান করিয়া থাকে, কৃষ্ণভক্তি স্বরূপিণী—ধাতু জীবমাত্রেরই বল্লভ তুল্য। এ সমস্ত কথা অতীব সত্য। যাহার শক্তি আছে সে খণ্ডন করুক।

"এ মত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
অহর্নিশি শ্রীকৃষ্ণ চরণ কর ধ্যান॥"

আবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ কথা বলিয়া যাইতেছেন। ছাত্রগণও উপস্থিত সকলে তাঁহার বদনারবিন্দ ও পুলকিত শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না যে, তাঁতে এবং তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণে তফাৎ কি? এইরূপ কত কথায় তিনি যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের গুণ বিবৃত করিয়া যাইতেছেন তাহা আর কি বলিব। তিনি বলিতেছেন,—

"যাবৎ আছয়ে জীব দেহেতে আসক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥"

প্রিয় পাঠকগণ, ভাইসব, দয়াল প্রভু এই মলিন জীবের জন্য কত চেষ্টা, কত আর্ত্তিই না দেখাইয়াছেন, এ কাতরতা দেখিয়া প্রাণ যে বিদীর্ণ হইয়া যায়। আহা! স্বীয় ভুবন মঙ্গল হরিনাম জীবের কণ্ঠে আরোপিত করিতে প্রভুর আজ কি যে প্রয়াস। আমরা কত না হতভাগ্য যে, প্রভুর এই করুণ কণ্ঠ আজিও আমাদের কঠোর চিত্ত দ্রবীভূত করিতে পারিল না। জানিনা এ পাপ মলিন-চিত্ত কতদিন তোমায় ঐ স্নেহ শীতল আহ্বান ধ্বনি উপেক্ষা করিয়া থাকিবে?

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

আঁধারে

নিবিয়া গিয়াছে সাঁঝের প্রদীপ
জ্বলে জ্বলে ধীরে ধীরে।
তাহে হৃদয় দুয়ার বন্ধ
প্রভু হে আমি অন্ধ
এসো হে দয়াল ফিরিয়া যেওনা
আঁধারে ফেলিয়া মোরে।
নিবিয়া গিয়াছে সাঁঝের প্রদীপ
জ্বলে জ্বলে ধীরে ধীরে॥
অচেনা তবুও চেনা
অজানা তবুও জানা
ডাকি নাই কভু তবুও ভরসা
ডাকিলেই পাব ফিরে।
এস হে দয়াল, ফিরিয়া যেওনা
আঁধারে ফেলিয়া মোরে॥
তুমি ত আমার তরে
কাঁদিতেছ ঘুরে ঘুরে
তবু যাব নাক' কাছে এ কেমন ধারা
তাই বুঝি আছ দূরে?
অভিমান কেন? বুঝিব কি তব
অপার করুণা ওরে!
প্রাণের ঠাকুর! বড় দীন আমি।
যেওনা যেওনা স'রে!

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধ বাহুল্যের দরুন প্রতিবাদ পত্র ও সমালোচনা বর্ত্তমান সংখ্যায় দেওয়া হইল না, আগামী মাসে সেগুলি যাইবে। পত্র প্রেরকগণ ক্ষমা করিবেন। (ভঃ সঃ)

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

(২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল)

প্রার্থনা।

"হৃদয় নিভৃতরঙ্গে বর্ত্তসে দীনবন্ধো!
ত্বমিহ সুখনিবাসঃ সচ্চিদানন্দসিন্ধু॥
নিরবধি বিনিমগ্না দুঃখসংসার সিন্ধৌ।
অহমহহ কৃপালো বঞ্চিত প্রেমবিন্দৌ॥"

হে দীনজন বান্ধব! সকল শাস্ত্র, সকল সাধক ও সকল সম্প্রদায়ই তোমাকে একবাক্যে নিত্য সত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দময় প্রেমসিন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। সকলের নিকটই শুনিতে পাই, তোমাতে দুঃখ, শোক, ভাবনা, হতাশ কিছুই নাই। আবার তুমি যে সর্ব্বজীব-জীবন তাহাও শুনি। আমি যেমনই হইনা তুমি যদি সর্ব্বজীব-জীবন হও তাহা হইলে আমার হৃদয়েও ত তোমার অবস্থান নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু তাহাই যদি হয় তবে এমন প্রেমময় আনন্দঘন মূর্ত্তি হৃদয়ে বিরাজিত থাকিতে আমি আনন্দ পাইনা কেন? প্রেমে মাতিয়া কি সুখ তাহা অনুভবও করিতে পারি না কেন? নিরন্তর হা হতাশ করিয়া দুঃখের দারুণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত হই কেন? জীবনে কি একবারও এমন শুভ মুহূর্ত্ত পাইব না যে, প্রেমে মাতিয়া তোমার আনন্দময় ভাবে বিভোর হইয়া সকল ভুলিয়া তোমার হইয়া যাইব!

বুঝিয়াছি তোমার কৃপা না হইলে হৃদয়বিহারী যে তুমি তোমাকেও আমার মত জানিতে, ভাবার মত ভাবিতে, দেখার মত দেখিতে পারিনা

যায় না। হে কৃপাময়! আমাকে একবার কৃপাকর আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

বেশ বুঝিতেছি যে, যেমন যেমন কার্য্য করিয়াছি ও যেমন যেমন প্রার্থনা করিয়াছি সেইরূপই ফল পাইয়াছি ও পাইতেছি। কিন্তু তখন না বুঝিলেও এখন ভুগিয়া ভুগিয়া বেশ বুঝিতেছি যে, যেভাবে জীবন যাইতেছে এভাবে গেলে কোটী কোটী জন্মেও তোমাকে পাইব না। তাই বলি তুমি নিজগুণে দয়া করিয়া আমার এই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিয়া তোমার ভাবে মাতাইয়া দাও। আর ইহাও করিও যেন নিজ কর্ম্মলব্ধ তোমার আদিষ্ট সংসারক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে করিতে তোমার ভাবছাড়া না হই। তোমাতে বিশ্বাস হারাইয়া, তোমার মঙ্গলময় আদেশ পালন না করিয়া, তোমাকে ভাল না বাসিয়াই আমার এত দুঃখ, এত অভাব, এত যন্ত্রণা।

জীবের দুঃখে কাতর হইয়া, তোমাবৈমুখী জীবের উদ্ধারের জন্যই ত তুমি যুগে যুগে নানা ভাবে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক জীবের মঙ্গল সাধন করিয়াথাক, আজ আমি তোমার সেই অপার করুণা স্মরণ করিয়াই তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি। দয়াময়। এই মৃতপ্রায় দীনের হৃদয়ে তোমার অমৃত ময় ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিয়া দাও; আমি সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ পথে রাখিয়া তোমার মঙ্গলময় আদেশবাণী পালন করিতে যত্নবান হই। নাথ! তোমাতে বিশ্বাস হারাইয়াই ত হিংস্র জন্তুর ন্যায় পরস্পর বিবাদ, পরস্পর পরস্পরের ক্ষতি, অবমাননা প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমার বিশ্বাস নাই, ভালবাসা নাই, কেবল আত্মেন্দ্রিয় পরিপোষণেই ব্যস্ত; আজ তোমার নিকট আমার কাতর প্রার্থনা তুমি কৃপা করিয়া আমার অসৎ ভাব দূর করিয়া আমাকে সৎ ভাবে ভাবিত করাও। আমি হিংসা, নিন্দা, বিবাদ, বিসম্বাদ ভুলিয়া সর্ব্বজীবে তোমার অধিষ্ঠান বুঝিয়া, তোমার গুণ স্মরণ করিয়া তোমার ভুবনমঙ্গল নাম গানে মাতিয়া জীবনজনম ধন্য করি। দীনবন্ধু দীনে দয়া কর।

বিশ্বরূপের সঙ্গীত। (১৬)

৩০।—গুণ গাও গাও সবে জয় দাও (ওভাই) আমার নিতাই সুন্দরে।
(সেযে) অনন্ত শ্রীধর প্রেমমূর্তিধর প্রেমময় যার অন্তরে॥
(প্রভু আমার) অনন্ত শীর্ষ করিয়া বিস্তার যুগ যুগান্ত ধ'রে।
কত সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সেবিছে নিজ নাথ বিশ্বম্ভরে॥
(বেদ) আগমনিগম পুরাণ তন্ত্র এইত মহিমা ফুকারে।
(ওসে) যুগে যুগে হয় লীলার সহায় ভূভারহরণ অবতারে॥
(সেযে) মূল সঙ্কর্ষণ ত্রেতায় লক্ষণ বলভদ্র রূপ দ্বাপরে।
জীব উদ্ধারিতে এ ঘোর কলিতে নিত্যানন্দ নাম ধরে॥
(আমার) সৎ স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ মত্ত গৌর-প্রেম ভরে।
(ভায়ের প্রেমে মাতা নিতাই, যুগে যুগে কল্পে কল্পে)
গৌর বলিতে ঠউর হারায় মাতায় বিশ্ব সংসারে॥
শ্রীগুরু স্বরূপ নিত্যানন্দ বেড়ায় জীবের দ্বারে দ্বারে।
(নাম-মন্ত্র দিয়ে সদা ফিরে, কলিহত জীবের দ্বারে দ্বারে)
এ বিশ্বরূপের কাণ্ডারী সেযে তরিতে এভব দুস্তরে॥

———•———

৩১।—তুম্‌তো পরমদয়ালা গৌর গোপালা হো।
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শচীকো দুলালা হো॥
যব্‌ছে প্রকট ভয়ো তুম্ জগমে,
দূর কিয়ে সব দুঃখ তাপ ক্ষণমে,
কর্ দিয়ে সব্‌কে হরিনামে মাতোয়ালা হো॥
(নামে মাতোয়ালা হো প্রেমে মাতোয়ালা হো)
ধ্যানধরত সব সুর নর মুনিগণ,
কো কর্‌ছ্যাকে লীলাগুণ বর্ণন,
নিয়াৰী ন্যায় তুম্‌রি উবো চরিত নিরালাহো॥
কলিমল পাবন হে দুঃখহারী,
প্রভুজী ন্যায়তো শরণ তুঁহারী
(দাস) বিশ্বরূপকে কোই নেই গতি দেনে ওয়ালাহো॥

সম্পাদক

তুলসীদাস

(১)

তুলসীদাস উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। তুলসীদাসের সঙ্গী ও বন্ধু বেণীমাধব দাস তাঁহার জীবন কাহিনী লিখিয়াছেন। শিবসিংহও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব জানা যায় না। তুলসীদাসের নিজের হাতের লেখা 'রামচরিতমানস' ও একখানি সালিসীর দলিল আছে।

তাঁহার সম্বন্ধে বহু রকমের আখ্যায়িকা প্রচলিত; তাহাদের মধ্যে কতক গুলিকে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যুক্তপ্রদেশ বান্দার অন্তর্গত রাজাপুরে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তুলসীদাস 'সরযূরিয়া' ব্রাহ্মণ— পরাশর গোত্র। পিতার নাম আত্মারাম, মাতার নাম হুলসী। তাঁহার নাম ছিল রামবোলা। তিনি একস্থানে বলিয়াছিলেন, জন্মের পরই পিতামাতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। কারণ তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেরূপ সময়ে জন্মাইলে লোকে জাতককে 'অভুক্তমূল' বলিয়া থাকে। ঐ সময়ে জন্মাইলে পিতামাতার রিষ্টি হয়। আট বছর পর্য্যন্ত তাহার মুখ না দেখাই উচিত। পরিত্যক্ত হওয়ার পর রামবোলাকে এক ভবঘুরে সাধু গ্রহণ করেন। তুলসীপত্র দ্বারা বালকের প্রথম কৃত্য হয়, আর তিনিই রামবোলার নাম রাখেন তুলসীদাস। আজ পর্য্যন্ত এই নামেই ইনি পরিচিত। সাধুর সঙ্গে সম্ভবতঃ তাঁহার গুরু নরহরি দাস ছিলেন।

নরহরির কাছে তিনি উত্তরভারত ভ্রমণকালে রামচন্দ্র সম্বন্ধে গল্প শোনেন। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞতা বশতঃই হউক, বা নিতান্ত অজ্ঞতাবশতঃই হউক, তিনি কিছুতেই রামচরিত বুঝিতে পারেন না। শেষে শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার ইচ্ছা হয়, হিন্দী ভাষায় তিনি রামায়ণ লেখেন। তারপর তিনি গৃহস্থ হন, বিবাহ করেন, রত্নাবলী নাম্নী কোনও বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। রত্নাবলী দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা। তার এক ছেলে হয়—নাম তারক, তারক বাল্যকালেই মারিয়া যায়। তিনি এতই পত্নীগত হইয়া পড়েন যে, কিছুতেই তাহার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। তুলসীর স্ত্রী ইহাতে মাঝে মাঝে বড় লজ্জা অনুভব করিত। এই জন্য হঠাৎ একদিন না বলিয়া সে বাপের বাড়ী

চলিয়া যায়। তুলসী বাড়ী আসিয়া তাহাকে না পাইয়া তাহার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া সেখানে চলিয়া যান। স্ত্রী তাহাতে আরও লজ্জিত হয়, আরও অপমান বোধ করে, এবং স্বামীকে এই জন্য অত্যন্ত তিরস্কার করে। এই ঘটনায় তুলসীদাসের চৈতন্য হয়, তাইতে তিনি সংসার-বিরাগী হইয়া পড়েন। এই ঘটনার কিছু কাল পরে একবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, কিন্তু তিনি আর তাঁহাকে চিনিতেও পারেন না। প্রথমতঃ অযোধ্যায়, পরে বারাণসীতে, তারপর সমগ্র উত্তরভারতে তিনি রামচরিত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ এই মত-প্রচারে তিনি কিছু কিছু বাধা পান। কিন্তু তাঁহার পবিত্র জীবন ও মনোহর ব্যক্তিত্বে তিনি ক্রমশঃ জয় লাভ করেন। এমন কি শৈব মতের প্রধান কেন্দ্র বারাণসীতে তিনি প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁহার কবিত্বের জন্য তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। অম্বেরের রাজা মানসিংহ পর্য্যন্ত ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের শিষ্যত্ব। আব্দুর-রহিম খানখান তাঁহার অন্যতম শিষ্য। ১৫৫৬ হইতে ১৬১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ইঁহার শিষ্য হন। বারাণসীর বিখ্যাত ধনী জমিদার টোডর মল আকবরের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। এই টোডর মল তুলসীদাসের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। টোডর মলের মৃত্যুর পর তিনি একটী মর্ম্মস্পর্শী কবিতা লেখেন। টোডরমলের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তুলসী দাসই মীমাংসার জন্য মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হন। তুলসীদাস এই সালিসীর দলিল নিজ হস্তে লেখেন। সংবৎ ১৬৬৯ (খৃষ্টাব্দ ১৬১২) এই দলিলের সময়, এই দলিল এখনও বর্ত্তমান। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং ইহা আট বৎসর স্থায়ী হয়। সম্ভবতঃ কবি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কারণ হনুমান বাহুক নামক তাঁহার একখানি ক্ষুদ্রগ্রন্থে তাঁহার এই রোগের কথা জানিতে পারা যায়। সাময়িক আরোগ্য লাভের পর আবার তাঁহার এই রোগের উপক্রম হয়, এবং তিনি ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে দেহত্যাগ করেন।

কুড়িখানিরও অধিক গ্রন্থ, এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র কবিতা তুলসী দাসের লেখা বলিয়া জানা যায়। ছোট বই—(১) রাম ললা নহছু ( ) বৈরাগ্য-সন্দীপনী (৩) বারোমাই রামায়ণ (৪) জানকী-মঙ্গল (৫) পার্ব্বতীমঙ্গল (৬ রামাজ্ঞা। বড় বই—(১) কৃষ্ণ-গীতাবলী (২) বিনয়-পত্রিকা

(৩) গীতাবলী (৪) কবিত্তাবলী (৫) দোঁহাবলী (৬) রামচরিত-মানস।

তুলসী দাস স্মার্ত্ত বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু বৈরাগীরা যেমন শৈবদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, রামভক্ত তুলসীদাস তেমন ছিলেন না। অযোধ্যায় বাসকালে বৈরাগী, বৈষ্ণবদের সঙ্গে থাকিয়া রামচরিতমানসের তিন সর্গ লেখেন। বেনারসে বসিয়া তিনি উহা শেষ করেন। পঞ্চম ও সপ্তম সর্গ ছাড়া আর সবটাই তিনি রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন। বিষ্ণুর অন্যতম অবতার কৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি সপ্তম সর্গে লিখিয়াছেন। অষ্টম সর্গে তিনি পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তুলসীদাস শিবকেও বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, এবং তাঁহাকে পরম দয়ালু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্রের তুল্য করিয়া বর্ণনা করেন নাই। শিবপার্ব্বতীর অনুরোধে রামচরিত প্রকাশ করেন।

তুলসীরচিত পুস্তকের সাধারণ বিবরণ

(১) রামললা নহচ্ছু—রামচন্দ্রের নখচ্ছেদন, এটী উপনয়নের বিবরণ। এখনও অযোদ্ধা ও বেহারে এই উৎসব হয়, আর এই পদ্য গ্রাম্য রীতিতে গীত হয়।

(২) বৈরাগ্য-সন্দীপনী—পবিত্রতা সম্বন্ধে পুস্তক। বৈরাগ্য বা ইন্দ্রিয় দমন সম্বন্ধে পুস্তক। ইহার সুললিত রচনাও বেশ মনোজ্ঞ।

(৩) বারোয়াই রামায়ণ—ইহা সংক্ষিপ্ত রামচরিত; গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। কেহ কেহ এই বই খানির আলোচনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(৪) জানকী-মঙ্গল ও (৫) পার্ব্বতী-মঙ্গল—রামচন্দ্রের সহিত জানকীর বিবাহ ও শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ। পার্ব্বতী-মঙ্গল ১৬৩ সংবৎ বা ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

(৬) রামাজ্ঞা—সাতটী অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কথা, সর্ব্ব সমেত ২৪৩ শ্লোক। যাত্রাকালের শুভাশুভ লক্ষণও ইহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা ১৫৫৫ সংবতে বা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

(৭) কৃষ্ণ-গীতাবলী—ইহা ব্রজভাষায় লিখিত। ইহাতে অতি সুন্দর সুন্দর কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কথায় শীলতার অভাব বলিয়া আলোচিত হয়, তাহা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(৮) বিনয়-পত্রিকা—দেবতার কাছে নিবেদন করিবার জন্যই বইখানি লেখা। দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ইহাতে দেখান হইয়াছে।

এই বিনয়-পত্রিকা সম্বন্ধে সুন্দর একটী আখ্যায়িকা আছে। অত্যাচার করিয়া ভয় দেখাইয়া তুলসীকে যখন বিপন্ন করা হয়, তখন পরম দয়ালু ভগবান্ রামচন্দ্রের নিকট তিনি আবেদন করেন। প্রার্থনাদি একে একে অনেক দেবতারও উদ্দেশে লিখিত। ভগবানের প্রহরী স্বরূপ ছোট ছোট দেবতার জন্যও বহু প্রার্থনা আছে। শেষে রামচন্দ্র নিজে স্বাক্ষর করিয়া কি ভাবে আবেদন গ্রাহ্য করেন তাহা লেখা হইয়াছে।

বিনয়-পত্রিকা কবির একখানি প্রশংসাযোগ্য পুস্তক বটে, কিন্তু শব্দগুলি এত কঠিন যে ইহা বুঝিতে পারা দুরূহ। তবু ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাস জানিতে হইলে এই পুস্তকখানি সকলের পাঠ করা উচিত। পুস্তকখানি স্বীকারোক্তি বটে, তবে নিষ্ঠাবান্ বিশ্বাসীর স্বীকারোক্তি।

(৯) গীতাবলী—ভগবানে অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যই এই সঙ্গীতাবলী রচিত। ব্রজ ভাষায় তিনি সঙ্গীত লিখিয়াছেন। সৌন্দর্য্যে ও মিষ্টতায় বিনয়-পত্রিকার চেয়ে ভাল। রামচন্দ্রের সমগ্র আখ্যায়িকা সুন্দর ভাবে ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে রামচন্দ্র ও তাহার ভ্রাতৃগণের বাল্যকালের ইতিহাসও বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) কবিতাবলী—কবিতাবলী আবার অন্য রকমের। চারণের মত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের গুণগাথা লিখিয়াছেন। অযোধ্যার ভাষার সঙ্গে ব্রজ-ভাষা মিশ্রিত করিয়া এই বই লেখা হইয়াছে। বীর-রসের কবিতা, ভাষা ও ভাব তদনুযায়ী। লঙ্কাদগ্ধাদি ব্যাপার প্রভৃতি ভাল করিয়া লেখা হইয়াছে। এগুলি কবিতা সংগ্রহ মাত্র। উহাদের সহিত নির্ব্বাচিত বিষয়ের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ইহার সম্পাদন ১৬১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই হইয়াছে। হনুমান বাহুক উহারই অংশবিশেষ, তাহা হইতে তুলসীদাসের লেখা প্লেগের কথা জানিতে পারা যায়।

(১১) দোহাবলী—অনেকে মনে করেন, তুলসীদাসের নামে অন্য লোক উহা লিখিয়াছেন। এ কথা ভুল।

(১২) রামচরিত-মানস—তুলসীকৃত রামায়ণ বলিয়া এই পুস্তকখানি প্রচারিত। সম্ভবতঃ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ৪৩ বৎসর বয়সে এই পুস্তকখানির লেখা আরম্ভ হয়। উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক এই রামচরিতমানসের শ্লোকাদি আগ্রহ

সহকারে আবৃত্তি করে। এমন কি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও ইহার প্রভাব কিছু কিছু ঢুকিয়াছে।

এই গ্রন্থে রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই ঘটনা বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ হইতে লেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া অধ্যাত্ম রামায়ণ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অংশ) ভুষণ্ডী রামায়ণ, বশিষ্ঠ সংহিতা ও প্রসন্নরাঘব গ্রন্থ হইতে ঘটনা সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

একটী গল্প উত্তরভারতে প্রচলিত আছে যে, বাল্মীকি রামায়ণ লিখিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দেখান। শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে স্বাক্ষর করেন। হনুমান আর একখানি রামায়ণ লেখেন ও শ্রীরামচন্দ্রকে দেখান। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলেন, আমি বাল্মীকির রামায়ণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছি, তোমার রামায়ণে আর স্বাক্ষর করিতে পারিব না। তুমি তোমার রামায়ণ বাল্মীকিকে দেখাও। হনুমান বাল্মীকিকে রামায়ণ দেখাইলে বাল্মীকি নিজের নাম ডুবিবার ভয়ে হনুমানকে উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে বলেন। হনুমান উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া বলেন, পুনর্জ্জন্মে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া পুনরায় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন। তুলসীদাসই সেই হনুমান। তিনি বাল্মীকির কীর্ত্তি ধ্বংস করিলেন।

অবশ্য রামচরিতমানসের নাম সুবিদিত এবং তাহার সুনামও যথেষ্ট। কাব্যখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য, বীরচরিত যথাযথ ভাবেই চিত্রিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভারতী ধর্ম্মের ইতিহাসে তুলসীদাসের মত কবির ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ধারণা ও আলোচনার মূল্য যথেষ্ট। রামানন্দ হইতে সাত জনের পর তুলসীদাস। তুলসী ভক্তিমার্গের নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধক। মানুষ স্বভাবতঃ পাপী, এবং ভক্তি লাভ করিয়াই মানুষ পুণ্যের অধিকারী ও মুক্তিলাভের যোগ্য হয়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোনও সম্প্রদায়ের লোক নন, এবং কোনও সম্প্রদায়ও তিনি সৃষ্টি করেন নাই। তিনি রামভক্ত হইলেও অন্য দেবতাকেও তিনি অমান্য করেন নাই। তিনি ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিতেন। আবার উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্মও তিনি স্বীকার করিতেন। ব্রহ্ম ও আত্মার সম্বন্ধের অভাবকে তিনি মায়া বলিয়াছেন, বেদান্তের মায়াকে তিনি অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার সময়ে সমগ্র উত্তরভারতে তিনি তাঁহার অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তুলসীদাসের প্রভাব এখনও উত্তরভারতে অসামান্য।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গয়া প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ (৩)

বাহ্য হারাইয়া প্রভু কৃষ্ণ কথা বলিয়া যাইতেছেন। ক্রমশঃ দুই প্রহর বেলা হইয়া গেল, পড়ুয়াগণ প্রভু-মুখনিঃসৃত এই অমিয় পান করিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য এবং তাঁহারা নিশ্চিতই কৃষ্ণের দাস। কারণ স্বয়ং গৌর ভগবান যাঁহাদের অধ্যাপক, তাঁহারা কি কখনও সাধারণ ব্যক্তি হইতে পারেন? ক্রমশঃ শ্রীগৌরাঙ্গের সংজ্ঞা হইল, তিনি তখন লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন—"আজ আবার কেমন করিয়া ধাতু সূত্র ব্যাখ্যা করিলাম?" তাহাতে ছাত্রগণ বলিলেন—"আপনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন তাহাই সত্য, কাহার সাধ্য তাহা অন্যথা করিতে পারে? বিশেষতঃ কাল আপনি যখন রত্নগর্ভ আচার্য্যের শ্লোক পাঠ শুনিয়া প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন তখন আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। চৈতন্য লাভ করিয়া এত কম্প হইয়াছিল যে আমরা কেহই তখন আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। আর এত চক্ষুজল পড়িয়াছিল যেন সাক্ষাৎ গঙ্গা দেবীর আবির্ভাব হইল মনে করিয়াছিলাম। লালা ঘর্ম্ম ধূলায় ব্যাপৃত সে অপূর্ব্ব ভাবময় শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিল প্রহ্লাদ, শুক অথবা স্বয়ং নারায়ণেরই আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারপর আপনার এখনকার এই সমস্ত ব্যাখ্যা ইহাও অপূর্ব্ব। এই যে এক দিন আমাদিগকে পাঠ দিয়া গেলেন তাহাতেই বুঝিতেছি অশেষ শব্দার্থই আপনার জ্ঞাত আছে। আর প্রত্যেক কথাতেই আপনি অশেষ মঙ্গলাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ নামই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" তখন ঠাকুর পড়ুয়াগণের বাক্যে তুষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "ভাই সব যাহা বলিলে সত্য, কিন্তু আমার এ সমস্ত কথা অপর লোকের নিকট বলিবার যোগ্য নয়,—

"প্রভু বলে ভাই সব কহিলা সু-সত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখ ভাই সেই বলে সর্ব্বথায়॥
যত শুন শ্রবণে সকল কৃষ্ণ নাম।
সকল ভুবন দেখ গোবিন্দের ধাম॥"

আর তোমাদিগের নিকট আজ হইতে আমি পরিহার মাগি। তোমাদিগকে আর আমি পাঠ দিতে পারিব না। তোমাদের যে অধ্যাপকের নিকট ইচ্ছা গমন করিয়া পাঠ গ্রহণ কর। কারণ সত্য কহিতেছি, কৃষ্ণ বিনা অন্য কথা আমার মুখে আর স্ফুরিত হইতেছে না। এই বলিয়া মহাপ্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে পুস্তকে ডোর দিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন ঠাকুর, আপনার স্থানে যত পড়িয়াছি তাহাই আমাদের হৃদয়ে থাকুক, অন্য স্থানে পড়িবার আমাদের আর ইচ্ছা নাই। ইহাতে শচীনন্দন শিষ্যগণকে কোলে লইয়া সাশ্রু-নেত্রে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—

"দিবসেক আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হবে তো সবার অভিলাষ॥"

তোমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণগত প্রাণ হও। তোমরা যাহা পড়িয়াছ তাহাই যথেষ্ট, আর পড়িতে হইবে না।

"কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।"

এই স্থানে গ্রন্থকর্ত্তা কবি বৃন্দাবনদাস যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা বড়ই মধুর। তিনি বলিতেছেন,—

"সে বিদ্যা বিলাস দেখিলে যে যে জন।
তারেও দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
সে বিদ্যা বিলাস মোর রহুক হৃদয়॥
পড়াইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিও চিহ্ন আছে সর্ব্ব নদীয়ায়॥"

তাহার পর মহাপ্রভু দিশা দেখাইয়া হাতে তালি দিয়া শিষ্যগণকে সঙ্কীর্ত্তন শিখাইলেন,—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

প্রথমে আপনি মাঝে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন আর ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া গাহিতেছেন। ক্রমে প্রভুর আবেশ জন্মিল, তখন তিনি গড়াগড়ি দিতেছেন আর বোল বোল বলিয়া চতুর্দ্দিকে আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন।

সেত যেমন তেমন আছাড় নয়—যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইবার মত হইতেছে। আর এত গণ্ডগোল হইল যে, তাহাতে নদীয়ার যাবতীয় লোক এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কখন হইয়াছিল বলিয়া লোক শোনে নাই; ভক্ত, অভক্ত সকলে মিলিয়াই বলিল নারদাদিরও দুর্লভ যে প্রেম তাহাই আজ আমরা দেখিলাম। ক্রমশঃ বিশ্বম্ভরের বাহ্য ফিরিয়া আসিল। এই ভক্তি-তরঙ্গে পড়িয়া ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিল। আর এই রূপেই,—

"আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ॥"

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

পন্থা

মানবগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন যে, ধর্ম্মের পথই প্রকৃত পথ, আর যিনি শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, সুখ ও শান্তি অক্ষুণ্ণভাবে তাঁহারই চিত্তক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কথা সত্য বটে কিন্তু শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা ত বড় সোজা কথা নহে? শাস্ত্রে দেখিতে পাই অনেক বিধি নিষেধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত মানিয়া কঠোর সাধনায় ভগবানকে প্রসন্ন করিতে হইবে। আমরা শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ, কলির জীব। সেই শক্তি ও সাধনা লাভের যোগ্যতা আমাদের কোথায়?

সংসার মরুভূমি মাঝে ভ্রাম্যমান বিষয় বিষে জর্জ্জরিত জীব, শান্তির আশায় দাবদগ্ধ কুরঙ্গের মত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। হায়! এই শান্তি লাভ করিবার সোজাপথটীর সন্ধান আমরা কোথায় পাইব?

পণ্ডিতের দেশ ভারতবর্ষে সকলেই দর্শনশাস্ত্র লইয়া ব্যস্ত। দর্শনও ছয়টী, সকলেই আবার ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখাইয়া লোককে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন, সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির কথা, চতুর্ব্বিংশতি তত্ব, ত্রিবিধদুঃখ এবং কত ভাষ্য ও কত ব্যাখ্যার কথা শুনিলাম। কিন্তু যখনই শুনিলাম,

দস্যু রত্নাকরের দেহে বল্মীকের স্তূপ জন্মিয়া তাঁহাকে বাল্মিকী মুনিতে পরিণত করিয়াছিল অর্থাৎ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ রাখিতে পারিলে তবেই ভগবানের সাক্ষাৎকার মিলিবে, তখনই যে সমস্ত আশালতা উন্মূলিত হইয়া কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি মহা মুনিবৃন্দের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর বেদান্ত—ব্রহ্মবাদ লইয়া উপস্থিত, মধ্বাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহা মহা মনীষিগণ অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি শুনাইতে বসিলেন। কিন্তু কই? এ সমস্তেও ত প্রাণের পিপাসা মিটেনা।

সৃষ্টি-মীমাংসা, পুরুষ প্রকৃতির বিষয় ন্যায়ের কূটতর্ক প্রভৃতি লইয়া দেশের সুধীবৃন্দ ব্যতিব্যস্ত, অপর দিকে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি অগণিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া লোক সমুদয় সুখান্বেষণে পাগলের মত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। শক্তির উপাসকগণ আবার পশ্বাচারে ও বামাচারে বিভক্ত হইয়া—বলিদান, পঞ্চ মকার প্রভৃতি আচরণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মোটকথা দেশের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। কেবল শুষ্ক তর্ক, ঘৃণ্য ব্যভিচার ও বিপজ্জনক বিনাশিতার অবাধ রাজত্ব চলিতেছে। ইহাই ত প্রকৃত দুর্দ্দিন। এমনই দিনে দেশ প্রকৃত যাহা চায় সেই শান্তির পথ দেখাইতে—সেই গোলকের জ্যোতি ভারতের এক প্রধান নগরে স্নিগ্ধ, সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিলেন।

তখন বসন্তকাল, প্রকৃতির চারুঅঙ্গ নূতন পল্লব ও প্রকৃষ্ট প্রসূন অলঙ্কৃত, দক্ষিণ অনিল, কলকণ্ঠ বিহগের সঙ্গীত মানবপ্রাণে আনন্দস্রোত বহাইয়া দিতেছে। সে দিন পূর্ণিমা তিথি, পূর্ণকলা শশধর যেন এক নবীন মূর্ত্তিতেই সেদিন ভারতগগনে সমুদিত হইয়াছেন। ক্রমে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইল। নবদ্বীপের অগণিত লোক সুমধুর হরিধ্বনি করিতে করিতে সুরধুনী নীরে অবগাহন করিতে যাইতেছেন, এ হেন মধুর সময়ে শুভ-হরিধ্বনির মধ্যে মহাভাগ্যবতী শচীদেবী এক পরম সুন্দর শিশু প্রসব করিলেন। 'হরিনাম মূর্ত্তি' আবাল বৃদ্ধ নর নারীর কণ্ঠে হরিধ্বনি প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়া জন্ম-মুহূর্ত্তেই তাহাদের দ্বারা সুমধুর হরিনাম উচ্চারণ করাইয়া লইলেন। উপলক্ষ্য হইলেন চন্দ্রদেব। মহাজনগণ বলিয়াছেন, ধরাধামে অকলঙ্ক চাঁদের উদয় দর্শনেই সেদিন কলঙ্কীচাঁদ রাহুগ্রস্ত হইয়া অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়াছিলেন।

ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গদেব। ইনিই মানবকে শান্তির পথ দেখাইলেন। কালে ইনি ন্যায় দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহে অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র নবদ্বীপ তখন পাণ্ডিত্য স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। চারিদিকেই কেবল শাস্ত্র কোলাহল, আর সেই নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক, গর্ব্বিত অধ্যাপক ও পড়ুয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যেই পবিত্র জাহ্নবীতীরে মৃত মধুর খোল করতালের ধ্বনির সহিত নিমাইপণ্ডিতের দলে সুমধুর 'হরে কৃষ্ণ' ধ্বনি উত্থিত হইয়া নদীয়ার গগন পবন মত্ত হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে সেই সুমধুর হরিনাম প্রেমে নবদ্বীপ ভাসিয়া 'শান্তিপুরে ঢেউ' লাগিল—আসমুদ্র হিমাচল ধন্য হইয়া গেল। অগণিত নর নারী সেই পরশমণির সন্ধান পাইয়া প্রেমের পরশে সোণা হইয়া গেল। ধন্য সেই প্রেমদাতা শিরোমণি নদীয়ার অকলঙ্কচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

আমাদের ন্যায় মূর্খ ও দুর্ব্বল জীব বড়ই সহজ ও সুন্দর পথের সন্ধান পাইয়াছে। *এ পথে কোন প্রকার কঠোরতা নাই, কোন প্রকার কৃচ্ছ্র* সাধন করিতে হইবে না। কেবল সেই দয়াল নিতাই ও নিমাই প্রদত্ত এই নাম মন্ত্র জপ করিলেই চলিবে,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই দ্বাত্রিংশদক্ষরময় ষোড়শ নামাত্মক শ্রীহরি নামার্থই আমাদিগের আস্বাদনের বিষয়। এই মহামহিমাময় মহামন্ত্র কলিযুগের পাবনকারী তারক-ব্রহ্ম নাম রূপে গীত ও ব্যবহৃত হইতেছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী,—

'হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

এই নামরূপ মূর্ত্তিমান প্রেমের সাধনায় জীব অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হয়। এই প্রেম হইতেই শান্তি। যাঁহার হৃদয়ে যতটুকু প্রেম, তিনি ততটুকু শান্তি লাভ করিয়া থাকেন—তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যও ততটুকু পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রেমের আয়তন বৃদ্ধি করাই আমাদের একমাত্র কামনা হওয়া উচিত।

আমাদের দয়াল নিতাই গৌর—সেই প্রেমদাতা শিরোমণি অভিন্ন ভ্রাতৃ-যুগলই এই প্রেম সাধনায় সিদ্ধ হইতে মানব মণ্ডলীকে উপদেশ দিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, আপনারাও আচরিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন। অন্য কোন ধর্ম্মে এমনটী আর দেখা যায় না। প্রেমের সাধনায় বিস্মৃতি জন্মিয়া মানবের আমিত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। একমাত্র প্রেমিক ভক্তই সমগ্র বিশ্বের অমৃতত্বের অধিকারী হইয়া তৃপ্ত হইতে পারেন। প্রেমই মানবকে শান্তি দান করিয়া পূর্ণানন্দের অধিকারী করিয়া দেয়।

দয়াল নিত্যানন্দের বাণী ক্ষীরধারার মতই প্রতিনিয়ত এই দাব-দগ্ধ সংসারে ঝরিয়া পড়িতেছে,—

"ভজ গ�ৌরাঙ্গ স্মর গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম,
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ।"

আসুন, শতে সহস্রে মিলিয়া আমরা অমৃত সাধনায় সিদ্ধ হইবার চেষ্টা করি, দারুণ কলিযুগে দুর্ব্বল জীবের ইহাই প্রকৃত "পন্থা।"

বৈষ্ণব দাসানুদাস।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

বন্ধুবিরোধ

[কালনা হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পল্লীবাসীতে "শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" এবং "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকার বিরোধ লইয়া বেশ সুযুক্তিপূর্ণ একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী একটু স্থিরচিত্তে উভয় পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়কেই আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উভয় পত্রিকার সম্পাদকই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধেয় এবং বৈষ্ণবসমাজের হিতকামী। সাধারণের অবগতির জন্য আমাদের পল্লীবাসীর প্রবন্ধটী নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। যথার্থই গৃহবিবাদ করিয়া সম্প্রদায়ের অহিতসাধনে আর অগ্রসর হওয়া আমরা ভাল বলিয়া মনেকরি না। ভঃ সঃ।]

"বৈষ্ণব সমাজের সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মীর

সংখ্যা কম। যে কয়জন কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের সূচনা দেখিলেই তাই শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ছিল বটে একদিন, যেদিন নিজ নিজ ইষ্টমতের গৌরব বাড়াইবার জন্য আচার্য্যগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বাদী নিরাশ করিবার জন্য —অপ-সিদ্ধান্ত প্রচার বন্ধ করিবার জন্য —অপকর্ম্ম গ্রহণ হইতে জীবকে নিস্তার করিবার জন্য তাঁহারা বাহ্যদৃষ্টিতে খুবই বিরোধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মত লইয়াই ঝগড়া হইয়াছিল, ব্যক্তিত্ব লইয়া কখনও টানাটানি হয় নাই।

সময়ের গতি এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ এখন বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজের দিকে তাকাইয়া আছে। শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীপুরী, শ্রীবারাণসী প্রভৃতি পবিত্র তীর্থে আবার বৈষ্ণব আচার্য্যগণকে প্রেমধর্ম্ম প্রচা-রের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। এই তিন কেন্দ্র হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের পবিত্র বাণী একদিন নিখিল ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিল। সে আজ চারিশত বৎসরের কথা। অনেক দিন হইয়া গেল। মুমুক্ষু ভারত আজ আবার বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার সহিত আহ্বান করিতেছে। এ সময় কর্ম্মীদের ভিতর বিরোধ তুলিলে, সমস্ত উচ্চ আশাই ভাসিয়া যাইবে।

"শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" এখন শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মাসিক মুখপত্র। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সাধু বাসনা হইতেই কেমন করিয়া যে কাশীমবাজারে সেবক ভূমিষ্ঠ হইল, আমরা তাহা জানি। স্বর্গীয় ললিত বাবু ও পরে শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হাত হইতে কেমন করিয়া শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় সেবক আসিয়া পঁহুছিয়াছে, সে কথাও অনেকেই জানেন। সেবকের দ্বারা সম্প্রদায়ের কোনই উপকার হয় নাই, এমন কথা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। এই পত্রে কিছু পূর্ব্বে রাসলীলা সম্বন্ধে এক ভিন্ন সাম্প্রদায়িকের লেখায় সুদীর্ঘ কটাক্ষ বাহির হয়। তারপর "শ্রীল রূপ-সনাতন" সম্বন্ধেও মাথুর শ্রীযুক্ত রামাচরণ বাবুর এক প্রবন্ধে তাঁহাদের পূর্ব্বজীবনের কতক পরিচয় প্রকাশ পায়। তাহাতেই কিন্তু সম্প্রদায়ে এক বিরোধের সূচনা হইয়াছে।

বিরোধ কে বাধাইলেন জানি না। তবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের সহিত ইহাদের যে কথা কাটাকাটি চলিয়াছে, এইটাই প্রত্যক্ষ অপ্রিয় সত্য। গোস্বামীমহাশয় আজ বৎসরাধিক কাল "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" নামে এক খানি মাসিক পত্র চালাইতেছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নানা

কথাই তাহাতে আলোচনা হইতেছে। ইনি নবদ্বীপে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থাদি প্রচারে এবং সমাজের গ্লানি দূরীকরণে প্রয়াস পাইতেছেন শুনিয়াছি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেমন বহুভাষাবিদ্ ধার্ম্মিক বৈষ্ণব, গোস্বামী মহাশয়ও তেমনি বহুগ্রন্থপ্রণেতা পরম বৈষ্ণব। আবার যাঁহার লেখা লইয়া এত গোলযোগ, সেই রামচরণ বাবুও পরম গৌর ভক্ত। নব প্রচারিত "মাধুকরী" পত্রিকা তাঁহারই অদম্য উদ্যমের ফল। ইহাঁদের মধ্যে যে পরস্পর মনোমালিন্য কেমন করিয়া স্থান পাইতে পারে, তাহা কি কখনও ধারণায় আসে? কিন্তু "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক" ও "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" উভয় পত্রেরই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি,—ব্যাপার অধিক দূর গড়াইতে দিলে, সম্প্রদায়ের অকল্যাণ অনিবার্য্য।

বৈষ্ণবের বড় দুর্দ্দিন, তাই এখন যথার্থ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য কমিয়াছে। সে অভিমানশূন্য ভাব এখন কোথায়? আমরা "প্রতিষ্ঠা শূকরী—বিষ্ঠা" বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন, প্রতিষ্ঠার বাসনা আমাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি বিদ্যাভূষণ মহাশয় আর কি গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগকে কখনই আমরা এ শ্রেণীর বলিয়া মনে করিতে পারি না। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে উভয়েই আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। নিজের বলিতে ত তাঁহাদের কিছুই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মপ্রচার যখন উভয়েরই প্রাণগত চেষ্টা তখন কথার মারপ্যাঁচ তিলকে তাল করিয়া তোলা কখনই শোভন নহে। শ্রীরাসলীলা প্রবন্ধের ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া প্রতিবাদ করিলেই হইল। শ্রীরূপসনাতন সম্বন্ধে কোন উক্তি আপত্তিজনক হইলে তাহা পরিহার করিয়া লইলেই হইল। যাহা আমাদের ঘরের কথা, তাহা আমরা ইষ্টগোষ্ঠীতে মিটাইয়া লইব। বৈষ্ণব সমাজে এখন কর্ম্মী চাই। যে কয়জন এই বিশাল সমাজের সেবায় নিরত, তাঁহারা একযোগে কার্য্য করিলেই আমরা সুখী হইব। সময়ের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গৃহ-বিবাদে শক্তির অপব্যয় করিবার আর কাহারও অধিকার নাই। অশান্ত জীবজগৎ আজ বঙ্গের বৈষ্ণব আচার্য্যগণের দিকে শান্তি পাইবার আশায় চাহিয়া আছে। এ সময় আমরা যেন আর নিজেদের ভিতর কল্পিত অশান্তির সৃষ্টি না করি। শ্রীগৌর ভগবান আমাদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করুন।"

(পল্লীবাণী)

প্রেরিত পত্র।

মান্যবরেষু

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন মিদং, মহাশয় আপনার প্রেরিত মাসিক-পত্রিকাগুলি (ভাদ্র হইতে পৌষ পর্য্যন্ত) পাইয়াছি। পৌষ মাসের পত্রিকায় "ভক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। লেখক ঐ প্রবন্ধে হৃদয়কে বৃন্দাবন, ভক্তিকে রাধা, শুভেচ্ছাকে শ্রীকৃষ্ণ, কুবাসনাকে কুটিলা প্রভৃতি বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাটীকে রূপক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে সুবিখ্যাত পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের একটী বর্ণনা মনে পড়িল—

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধাসতী॥
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
(আমায়) ধর ধর জনার্দ্দন, পাপভার গোবর্দ্ধন
কামাদি ছয় কংস চরে ধ্বংস কর হে সম্প্রতি,—
বাজায়ে কৃপাবাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি
তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠে আমার পুরাও ইষ্ট এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা কূলে আশাবংশী বটমূলে
স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি;—
যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দি আছি ব্রজধামে
(এই) জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি॥"

এরূপ সঙ্গীত রচনা করিলেও উহার প্রথম ও শেষাংশে দাশরথি রায় লীলা মানিয়াছেন এবং এক সময় তাঁহার অমৃতময় কণ্ঠে ব্রজলীলা গাহিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন।

সে যাহা হউক, উক্ত লেখকের ঐরূপ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য কিন্তু মহৎ বলিয়াই বোধ হয়; কেননা, তিনি ব্রজলীলার দোহাই দিয়া কুলোকের বীভৎস

কাণ্ডগুলি দূর করিতে ইচ্ছুক, লীলাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে লীলার নামে কুৎসিৎ ক্রিয়াও সমাজ হইতে দূর হইবে ইহাই বোধ হয় তাঁহার আশা, অথবা তিনি লীলার 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যারই পক্ষপাতী। যাহাই হউক লীলা যে কখনই মিথ্যা নহে ইহা আমাদেরও ধারণা। কেননা হিন্দুশাস্ত্রের মুকুটমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থগুলি এবং সিদ্ধমহাত্মাগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, লীলা নিত্য সত্য। তাহার উপর আবার সেই সর্ব্ব-গুণখানি, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন লীলা দর্শন ও সম্ভোগ করিয়া ও করাইয়া সপ্রমান করিয়া গিয়াছেন যে, লীলা নিত্য ও সত্য।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, লীলা বড়ই দুর্লভবস্তু, কুৎসিৎ কার্য্যদ্বারা ইহা লাভ করা ত দূরের কথা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও যদি কাহারও অন্তরে এক বিন্দু বিষয় রস থাকে তবে তাহারও এ বস্তুতে অধিকার হইতেই পারে না। ধীর-বুদ্ধি লীলাপিপাসু বৈষ্ণবগণ ইহা জানেন এবং সেই জন্যই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ, নরোত্তম প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রভুর পার্ষদ হইয়াও লোক শিক্ষার্থ অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পথের কাঙ্গাল হইয়াছিলেন এবং আরও কত মহাপুরুষ একবিন্দু লীলারসের আশায় সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া দারুণ শীতাতপ প্রভৃতি ক্লেশ সহ্য করিয়া হৃদয়ে দাবানল জ্বালিয়া "হা নিতাই গৌরাঙ্গ" "হা রাধারাণী" বলিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে দিন যাপন করিতে-ছেন। যদি কেহ ভাগ্যদোষে এ তত্ত্ব না জানিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে এ কথা জানাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া উচিত কিন্তু তা বলিয়া নিত্য ও সত্য লীলাকে মিথ্যা বলা উচিত নয়। একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, লীলা যেমন ব্রহ্মাণ্ডে হয় তেমনি মনুষ্য হৃদয়েও হয়, তাহা ত হইবেই, কারণ দেহ যে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। তা বলিয়া লীলার যৌগিক ব্যাখ্যা করিয়া মূল লীলা উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অমান্য করা হয়। আর এক কথা এই—আমাদের মনে হয় ভক্তমাত্রেই এক প্রকার লীলা বাদী, যেহেতু মুসলমান ভক্তগণ মহম্মদের, খ্রীষ্টান ভক্তগণ খৃষ্টের বৌদ্ধ ভক্তগণ বুদ্ধদেবের, রামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণ রামকৃষ্ণদেবের ও অন্যান্য ভক্তগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতার লীলা মানেন। সুতরাং কোনও ভক্ত বলিতে পারেন না যে "আমার প্রভুর লীলাটী সত্য, তোমার লীলাটি মিথ্যা।" কেন না তাহা হইলে হয়ত তিনিও ঠিক বিপরীত উত্তরই পাইবেন।

আর এক কথা, লীলাই ধার্ম্মিকের প্রাণস্বরূপ, উহা না থাকিলে স্মরণ মনন ও রসাস্বাদন হয় না।

শেষ কথা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি সমস্তই বাদ দেন তবে তিনি ধর্ম্ম জগতে থাকিবেন কি লইয়া? অন্ততঃ তাঁর একটী গুরু চাই। এখন যদি বলা যায় গু—অন্ধকার আর রু—দূর করা, অতএব গুরু অর্থে অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান যাহাতে দূর হয় তাহা অর্থাৎ জ্ঞান। তাহা হইলে এই 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি গুরুরও অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িবেন অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি লীলা মানিয়া শূন্যে অবস্থান পরিত্যাগ করিবেন ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। *

নিবেদনমিতি—বশংবদ

শ্রীশিবকৃষ্ণ রায়।

প্রেরিত পত্রের উত্তর।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত ভক্তি সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু—

গত মাসের "ভক্তিতে" মল্লিখিত "ভক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের নীচে যে ফুটনোট করা হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে আপনার যে পত্র পাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতেছি।

মূল লীলাকে অস্বীকার করিলেই বা রূপক বলিয়া আমরা উড়াইয়া দিলেই মূললীলা উড়িয়া যাইবে না। আমিও তাহা উড়াইয়া দিই নাই, এবং আমার মতও তাহা নহে। বৈষ্ণব সমাজের পত্রিকাতে আমার সামান্য ২।৪টী লেখার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাহারাই বলিবেন, আমি তাহা পারি না। লীলা—লীলা—উহা নিত্য, সত্য, শাশ্বত ও সনাতন।—যাহা

"কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

---

* প্রবন্ধলেখক মহাশয় বিশেষ অসুস্থ সেই জন্য তিনি বিস্তৃতভাবে কিছু লিখিতে পারিলেন না একটু সুস্থ হইয়াই তঁাহার বক্তব্য তিনি পাঠকগণকে জানাইবেন এইরূপ আশা দিয়াছেন। সংক্ষেপে তিনি এই পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এতৎসহ আমরা মুদ্রিত করিলাম। ভঃ সঃ

সেই নরশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান সাধক বা তাঁহার চিরবাঞ্ছিত প্রাণারাম লীলামাধুরী সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই। কারণ আমি জানি আমি তাহার অধিকারী নহি। সে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও চিরনবীন মাধুর্য্য যাঁহার দৃষ্টিকে সুন্দর ও দিব্যোজ্জ্বল করিয়াছেন, ব্রজনাথ রাসবিহারী ও ব্রজনারী যাঁহাকে দয়া করিয়াছেন তিনিই তাহা জানেন ও তিনিই তাহা বলিবেন।

আমার কথা স্বতন্ত্র। বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও আস্তিক্য বুদ্ধিবিরাজিতযুগে যে বস্তুটীর অভাবে আমাদের সকল প্রকার ধর্ম্ম সাধনা বিরাট ব্যর্থতা ও ভণ্ডামীতে পরিণত হইতেছে, সেই ভক্তি জিনিষটাই আজ আমাদের একান্ত কাম্য। ইহাই আমার প্রথম ও শেষ কথা। দুর্নীতিপরায়ণ কুক্রিয়াশক্ত হৃদয় ভক্তির আবাস স্থল নহে। বিশেষতঃ ধর্ম্মের নামে যখন মানুষ আত্মপ্রতারণা করিয়া কুক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে, নিত্যশুদ্ধা ভক্তি তখন সেখান হইতে সহস্র যোজন দূরে সরিয়া দাঁড়ান এবং এই ভণ্ডামী অপেক্ষা মানুষের ভীষণ সর্ব্বনাশ আর কিছুই হইতে পারে না। বড় বড় আলোচনা দার্শনিক সূক্ষ্ম মীমাংসা আজ শুনিতে চাহি না—বুঝিতেও চাহি না। অতি কঠোর তৃষিত সংসার—বড়ই শুষ্ক, বড়ই প্রাণহীন—একান্তভাবেই ঈশ্বর বিমুখ। তাই আজ এই শুষ্ক মরুভূমিতে মানুষ নাম ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাই প্রবল আস্তিক্য বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকের প্রতি ভক্তি—শুধু ভক্তি—একনিষ্ঠা ভক্তি। যাহাতে হৃদয় জুড়াইয়া যাইবে, মরুভূমে বারিসঞ্চার হইবে, চির অর্গলাবদ্ধ প্রাণের দুয়ার স্বতঃই উন্মুক্ত হইবে। বিশ্বের সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দই সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিবে। পাপ, ব্যভিচার, এবং বিশেষ করিয়া ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার এই প্রেমভক্তির সর্ব্বপ্রধান প্রবল পরিপন্থী। বলিতে বুক সত্যই ফাটিয়া যায় যে, প্রেম ভক্তির যিনি অবতার, শুষ্ক অহমিকাপূর্ণ নিরীশ্বরবাদ পূর্ণপ্রায় দেশে যিনি প্রেমভক্তির মন্দাকিনী বহাইয়া দিয়া জগতকে অমৃত পরিবেশনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামে আজ স্থানে স্থানে বিশেষ পল্লী অঞ্চলে ব্যভিচার ও পাপের যে স্রোত বহিতেছে, তাহাতে ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, ভক্তি, প্রেম, ভগবান লীলা সবই ভাসিয়া যাইতেছে। কাজেই ব্যভিচার স্রোত দমন করা আজ আমাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। নতুবা কোন প্রতিষ্ঠানেরই কোন সার্থকতা নাই; তাহাই আমার লক্ষ্য। তাহার জন্য অনেক সময় অনেক জিনিষ বাদও দিতে হইবে, অনেক বিষয় অনেক রকম রূপান্তর করিয়াও উপস্থিত করিতে হইবে

অধিকারী ভেদেই শিক্ষা বিভাগ। নতুবা সাধকের নিকট চির বিমোহন যুগল লীলা ও বৃন্দাবন চিরদিনই নিত্য ও সত্য।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বা রূপকের সেখানে কোন স্থানই নাই। একবার জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি বৃন্দাবন লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বই লিখিয়া প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে উপহার দেন। গোস্বামী প্রভু পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন।" গ্রন্থকার উত্তর করিলেন "আজ্ঞে, ও সব ত আর কিছু সত্যি নয়, তাই—" প্রভুপাদ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "সত্যি নয়। আমি যে দেখতে পাই, সে কি মিথ্যা—বেরো এখান থেকে।" তাই যিনি সত্যদ্রষ্টা—তাঁর নিকটই লীলা সত্য এবং নিত্য। নতুবা কলুষিত আচার পরায়ণ হইয়া, কলুষ কালিমায় হৃদয় ভরিয়া যে সে সেই নিত্যধামের নিত্যলীলার দ্রষ্টা বা বক্তা, বা অনুকারী হইতে পারে না। আজ আমরা শুধু আজন্ম আত্মপাপ স্মরণ করিয়া দুই চক্ষু তাঁরই করুণা বারিতে ভরিয়া লইয়া ভক্তি লাভ করিবার জন্য কাতর করুণ কণ্ঠে শুধু ডাকিব "দয়াকর প্রভু,—দয়াকর—

"সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া
পাপ পঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।
যত্র যত্রাহি জাতোঽস্মি স্ত্রীষু পুরুষেষুবা
তত্র তত্রাচলা ভক্তি স্ত্রাহি মাং মধুসূদন॥"

ভবদীয়
শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু

শ্রীরসিকানন্দ দেব

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তীযুগে, যে সকল মহাত্মার পুণ্যপ্রভাব প্রেমভক্তির উদ্দাম স্রোত, উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীশ্যামানন্দ অন্যতম। এই শ্যামানন্দের অদ্ভুত কীর্ত্তিমান ভক্ত রসিকানন্দের সম্বন্ধে, আজ আমরা সামান্য কিছু আলোচনা করিব। রসিকানন্দ রাজার পুত্র ছিলেন। ইঁহার পিতা অচ্যুতানন্দ দেব উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী রয়নি নগরের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম ভবানী দেবী, ইঁহারা শিষ্ট করণ বংশীয়। ১৪৮৫ শকাব্দার কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে রসিকানন্দের

জন্ম হয়। ইঁহারা দুই ভ্রাতা, শ্রীরসিকানন্দ ও শ্রীমুরারি। দুই ভ্রাতাই পরম ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে, আকাশ বাণীতে ইহারা শ্যামানন্দকে আপনাদের গুরু বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। রসিকানন্দ তদীয় গুরুদেবের একজন অতি প্রধান ও প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তিপ্রভাবে, উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং বিশাল উৎকল ভূমি, প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাঁহার অকথ্য প্রেমোন্মত্ততা দৃষ্টে, আপামর সাধারণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বোধ করি একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তদীয় গুরু শ্যামানন্দের গৌরভ অমন সুবিমলভাবে বিকসিত হইয়াছিল, প্রধানতঃ রসিকানন্দের ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে।

এই সময় বহুসংখ্যক মুসলমান, রসিকানন্দের প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তৎকালীন দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ঐ স্থানে একটী বন্য হস্তীর উপদ্রব, তত্রত্য অধিবাসীগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাদশাহের প্রতিনিধির ষড়যন্ত্র, রসিকানন্দ বন্যহস্তীর সম্মুখীন হইলে, হস্তী নতজানু হইয়া শুণ্ড দ্বারা পদধুলি মস্তকে গ্রহণ করিল। রসিকানন্দ ঐ সময় হস্তীর কর্ণে সুধামাখা হরিনাম প্রদান করিয়া তাহাকে অরণ্যে আপন স্থানে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। হরিভক্তের স্পর্শলাভে—পরম অশান্ত, বন্যহস্তীও তাহাই করিয়াছিল। রাজ প্রতিনিধি, লোকমুখে রসিকানন্দের এই অপূর্ব্ব প্রভাবের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সংবাদ দিল্লীতে প্রেরিত হইলে সম্রাট পুত্র শাহ সুজা, ২০টী বন্যহস্তী পাঠাইয়া তাঁহাকে নূতন ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য হরিপ্রেমে বলীয়ান ভক্তবর রসিকানন্দ এ পরীক্ষায়ও অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। রসিকানন্দের অপূর্ব্ব প্রতাপ, ক্রমশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার গুণে মানুষ ত দূরের কথা বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়াছিল, তাঁহার সুবিমল চরিত্র প্রভাবে আকৃষ্ট উড়িষ্যার তাবত নরনারী তদীয় চরণে মস্তক নত করিয়াছিল। পরম রসিক রসিকানন্দের হরি-প্রেম-রস বাদর প্লাবনে যুগপৎ রাজা ও ভিখারী, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, হিন্দু ও মুসলমান, শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নবীন আলোকে আসিয়া আপনাদের বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে সমগ্র উৎকলবাসীর চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সুবিমল

প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া ১৫৭৬ শকাব্দার আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা দিবসে মহাপ্রাণ রসিকানন্দ রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হইয়া যান। তাঁহাকে আর বহির্গত হইতে না দেখিয়া ভক্তগণ মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন, একটী সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প গোপীনাথের চরণপ্রান্তে বিরাজ করিতেছে। ভক্তগণ পরম ভক্তিভরে সেই পুষ্পটী গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধি স্থানের নিকট, উহা মহা সমারোহে সমাহিত করিয়া, উহার উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই মন্দির অদ্যাপিও বিরাজিত আছে।

"শ্রীরসিকানন্দের চরিত্রের অন্ত নাই।
প্রভু শ্যামানন্দ গুণে বিহ্বল সদাই॥
শ্রীশ্যামানন্দের গুণে কেবা না মোহিত।
বিবিধ প্রকার করি গায় সে চরিত।"

অতঃপর আমরা তাঁহার লীলা-মাহাত্ম্যসূচক দুইটী পদ উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১)

"জয় জয় রসিক মুরারি।
করুণাময় কলি কলুষ বিভঞ্জন, নিরমল গুণগণ জনমনহারী॥
প্রবল প্রতাপ, পূজ্য পরমাদ্ভুত, ভক্তি প্রকাশক, সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম হেমসম উজ্জ্বল, ঝলকত অতিশয় ললিত শরীর॥
শ্যামানন্দ চরণচিত চিহ্নণ, অনুখণ সঙ্কীর্ত্তন রস পান।
যাকর সব রস, গৌরচন্দ্র বিনু, কি কহব সপনে না জানয়ে আন॥
অপরূপ কীর্ত্তি, জসত ত্রিজগত মধি, কবিবর কাব্য বিদিত অনুপাম।
নিপট উদার, চরিত চারু কছু, সমুঝি না শকতি পতিত ঘনশ্যাম॥"

(২)

"ধরিব কেমনে প্রাণ ধরিব কেমনে।
দিবসে আঁধার হইল শ্রীমুরারি বিনে॥
হরি গুরু বৈষ্ণব সেবায় হইল বাদ।
আর কি রসিকানন্দ পুরাইবে সাধ॥
একে যে রসিকানন্দ রসের তরঙ্গ।
বাসল রসিকানন্দ ক্ষীরচোরা সঙ্গ॥
কান্দিতে কান্দিতে হিয়া বিদরে হুতাশে।
দশদিক শূন্য হইল শ্যামপ্রিয়া ভাসে॥"

এই পদ রচয়িত্রী শ্যামপ্রিয়া দেবী শ্রীমৎ রসিকানন্দের সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি প্রভু রসিকানন্দ শক্তি দেন ভবিষ্যতে তাঁহার অমল চরিতসুধা পূর্ণভাবে আস্বাদ করিতে চেষ্টা করিব।

দীন—শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

আলোচনা ও চয়ন

সহযোগী "পল্লীবাসী" সংবাদ দিতেছেন যে, "শ্রীপাঠ বাঘনা পাড়ার গোস্বামী বংশেরও অনেকের নামের পূর্ব্বে "মহাপ্রভুপাদ" শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। সময়ের যেরূপ হাওয়া তাহাতে ক্রমশঃ ইহা সংক্রামক হইয়া উঠিতে পারে।" "পল্লীবাসীর" এ অনুমান এখনই অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। যিনি যাহা নন, জগতের সমক্ষে তাঁহাকে তাহা হইয়া প্রকট হওয়াই যে আজকাল কার একটা রীতি হইয়া উঠিয়াছে। আমরা প্রাচীন মহাত্মাগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এটীকে কালের প্রভাব বলিয়াই মানিয়া লই। সর্ব্ব প্রথম এই "মহাপ্রভুপাদ" শব্দ ব্যবহার করিতে আমরা প্রসিদ্ধ ভাগবত-ব্যাখ্যাতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়াছি বলিয়াই মনে হয়। তাহা হইতেই যেন এটী ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইচ্ছাময়ের যে কি ইচ্ছা তাহা তিনিই জানেন। হায় হায়! "প্রতিষ্ঠা শূকরী—বিষ্ঠা" বলিয়া আমরা যতই কেন উপদেশ দি না, দু'টো কথা মুখস্ত করিয়া বক্তৃতার চোটে আকাশ পাতাল যতই ফাটাই না প্রতিষ্ঠার বাসনা যে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় বসিয়া গিয়াছে। এ সময় গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে না হারাইয়া সকলেরই সম্প্রদায়ের হিত সাধনে যত্নবান হওয়া উচিত।

* * *

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রসরকার মহাশয়ের "ব্রহ্মদর্শন" নামক পুস্তকের সমালোচনার শেষাংশে "বীরভূমি" বলিয়া ছিলেন—"বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে কেন কিছু বলেন নাই, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর।" এই অংশ পড়িয়া কেহ কেহ নাকি জানিতে চাহিয়াছেন সেই সিদ্ধান্ত কি? উত্তরে বীরভূমি লিখিয়াছেন—"যাঁহারা একথা বলেন তাঁহারা সমালোচিত গ্রন্থখানি পড়িলেও পারিতেন, যাহা হউক আমরা সংক্ষেপে তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিতেছি। ধর্ম্ম শিক্ষার দুইটী বিভিন্ন প্রণালী হইতে পারে। প্রথম প্রণালীতে প্রথমেই ঈশ্বরকে মানিয়া লইতে হয়, ইহাই প্রচলিত প্রণালী। মানব শিক্ষার অধিকাংশ প্রণালীই এইরূপ। বুদ্ধদেব আর এক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি "শিক্ষার্থীকে বলিলেন, চরিত্র নির্ম্মলকর, বাসনা প্রবৃত্তি দমন কর, জ্ঞান ও চিন্তা মার্জ্জিত কর। সম্ভবতঃ তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, হৃদয় নির্ম্মল হইলে আপনা হইতেই ব্রহ্মদর্শন হইবে, তখন আর তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ঈশ্বর আছেন, বা ঈশ্বর মানিয়া লও। তখন আর চিন্তা বা কল্পনার স্থান থাকিবে না, তর্ক যুক্তির প্রয়োজন হইবে না, অষ্টাঙ্গ সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত, প্রবৃত্তি দমন এবং বাসনা-নির্ব্বাণ হইলে সেই নির্ম্মল চিত্তে ঈশ্বর সত্তা আপনিই প্রকাশিত হইবে। * * Creed of Bnddha নামক পুস্তকে এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।"

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[২২শ বর্ষ, ৮ম, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩০, বৈশাখ ১৩৩১ সাল]

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব

"দেখত বেকত গৌরচন্দ্র, বেঢ়ল ভকত নখত বৃন্দ,
অখিল ভুবন উজোরকারী কুন্দকনক কাঁতিয়া।
অগতি পতিতকুমুদ-বন্ধু, হেরি উছল রসকি সিন্ধু,
হৃদয়কুহর-তিমিরহারী, উদিত দিনহুঁ রাতিয়া॥"
নাহিক তাহাতে অমাপ্রতিপদ, নাহিক কলঙ্ক অকলঙ্ক চাঁদ,
তাই লুকাইল জড়-বিধু আজ, আজু অম্বরে ঢাকিয়া॥
সুধাকর-কর লুকাল বলিয়া, প্রেম অমিয়া বিশ্বে বিতরিয়া,
আনন্দে ভরিলা জগজন হিয়া, নামামৃতে মত্ত করিয়া॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাংস্য আর হরিধ্বনি, দুকুলে আকুল কৈল সুরধুনী,
গৌড় নরনারী হরিত দুরিত, ভাগীরথী স্নাত হইয়া॥
উর্দ্ধ অষ্টমীর ঘোর অন্ধকারে, কৈলা রাসলীলা পূর্ণিমা-বাসরে,
তারি পরিশিষ্ট দেখাল এবারে পূর্ণিমায় অমা রচিয়া॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা মধুময়ী রাতি, নব কিশলয়ে মনোজ্ঞা প্রকৃতি,
নব-ফুল-হাসি মলয় সমীরে, সেবিল পরাণ বঁধুয়া॥
সুপ্রসিদ্ধ যত বিবুধমণ্ডলী, বিভার ছটায় ভারত উজলি,
নদীয়া আকাশে যেন তারাবলী, তার মাঝে গোরা বিধুয়া॥

এস বিশ্ববাসী ভাই ভাই মিলি,
নিত্যানন্দ পথে এস সবে চলি,
সুমধুর গৌর-লীলা আস্বাদিয়া,
আনন্দের উৎস ধরিব পরাণে,
সে চাঁদ কিরণে করি কোলাকুলি,
অনিত্যের মোহ ভুলিয়া।
হৃদয় নির্ম্মল উজ্জ্বল করিয়া,
নর জন্ম ধন্য করিয়া॥

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি,এল

প্রাণের কথা

গৌরচে।—

(আর) মানে না যে মোর মন ;
পাব কি না পাব, দরশন তব,
বল তুমি প্রাণধন॥
আশার আশায় কতকাল র'ব (ওহে) দয়াময় ভগবন্!
কাহারে সুধাই কোথা গেলে পাই (তব) সুশীতল শ্রীচরণ॥
যত দিন যায় তত বাড়ে আশা পাব তব দরশন।
কোটী জনমে দেখা যদি পাই (তোমার) পদযুগ অতুলন॥
(আমার) তাহাতেই সুখ সিদ্ধি সাধনার পরিতৃপ্ত হবে মন।
কখন ত পাব দরশন তব বল বল প্রাণধন।
এই আশাটুকু দাও দয়াময়। মুঞি বড় অভাজন।
সকল ভুলিয়া সঁপেছি চরণে সবখানি প্রাণ মন॥
দিবেনা কি দেখা যুগ যুগান্তরে (ওহে) গৌর ভগবন্!
(আর) মানে না যে মোর মন॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিঃ—

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে॥"

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ পৃথক দুইজন। কিন্তু কি প্রকার? ইহার সমীচীন উত্তর কি?

উত্তর—ধীরভাবে উত্তরালোচনা করিতে গেলে, প্রশ্নটির সহিত আরও মনে হয় যে, যদি গোপীনাথ ও যদুনাথ একজন না হইবেন তবে মথুরাগামী কৃষ্ণেরজন্য গোপীকার এত বিরহোন্মাদ কেন? যদি "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" কথাটি অন্বর্থে মাত্র ব্যবহৃত হয়, তবে—

"শ্বাসোল্লাসৈরথ তরলিতস্থুলনালীকমালঃ
কুর্ব্বন্ পূর্ণ নয়ন পয়সাং চক্রবালৈঃ প্রণালীঃ।
স্মারং স্মারং প্রণয়নিবিড়াং বল্লবীকেলিলক্ষ্মীং
দীর্ঘোৎকণ্ঠাজটিল হৃদয়স্তত্র চিত্রায়িতোঽভূৎ ॥"

ইত্যাদি পদ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীই বা কেন মথুরায় প্রাসাদ শীরোস্থ শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ বৃন্দাবন স্মরণাদি বর্ণন করিবেন? আর কেনই বা শ্রীমতী রাধারাণী দূতীকে বলিবেন—

"বন্ধুরে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা ॥
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তোমা বিনু দগধে যেন দাবানল বন ॥
নহে ত কহয়ে যেন এ দুখ এড়াই।
সোঙরিয়া চাঁদমুখ তবে মরি যাই ॥
জ্ঞানদাস কহে দুখ না কর ভাবন।
নিচয়ে মিলিব জান তোমার প্রাণধন ॥" (পদকল্পতরু।

আর দূতীই বা কেন মথুরায় গিয়া যদুপতিকে বলিবেন যে—

"মাধব কি কহব বিরহ বিষাদ!
তিলে এক তুহুঁ বিনে যো কহে যুগশত
তাহে কি এতহুঁ পরমাদ ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধায়ল,
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ।

কত উনমাদ মোহ বিহি যাওত,
কত পরবোধব কেহ॥
দশমী দশায়ে আছয়ে এক ঔষধ
শ্রবণে কহয়ে তুয়া নাম।
শুনইতে তবহি নয়ন ফেরি আওত;
সো দুখ কি কহব হাম॥
কত কত বেরি তোহে সম্বাদিনু
কৈছন তুয়া আশোয়াস?
না বুঝিয়ে রীত, ভীত রহুঁ অন্তরে
কহতহি বলরাম দাস॥" (পদকল্পতরু।)

অতএব "ব্রজছাড়ি কৃষ্ণ কভু না জান কাহাতে" কথাটি "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য" কথাটির মত অনুধাবনীয়। ইহার অর্থ ব্রজ অর্থাৎ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া ব্রজের কৃষ্ণ অন্য কোথায়ও যান না, একেবারেই কোথাও যান না এ অর্থ নহে।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ "গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর" শ্রীরাস ও নিকুঞ্জাদি ক্রীড়া বিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্য অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য চতুষ্টয়ে বিরাজিত থাকেন। আরও—

"যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব মাধুর্য্যের ধূর্য্য।
ব্রজ গোপী সনে তার বাঢ়য়ে মাধুর্য্য॥"

তাই "প্রেম্না প্রিয়াধিক্য" অর্থাৎ মহাভাব দ্বারা, ব্রজস্থা তৎপ্রিয়া গণের সর্ব্বোৎকর্ষ সূচক তাহাদের সহিত বিলসিত থাকা অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য চতুষ্টয়ের একটি। ঐ চারিটির একটি ছাড়িলেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য খণ্ডিত হয়! এবং ঐ গুলি পূর্ণ মাধুর্য্যের ধাম ছাড়া অন্যত্র থাকে না। কাজেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটে বা অপ্রকটে সততই ব্রজে থাকিতে হয়।

পরিবারবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন দুই প্রকার (১) বাহেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া (২) অন্তরেন্দ্রিয় মনের বিষয়ীভূত হইয়া। প্রথম প্রকারের মিলনে প্রাপ্তি-অভিমান; দ্বিতীয় প্রকারে বিরহ-অভিমান। এই দুই রস পরস্পরের পরিপোষক। সেইজন্য প্রাপ্তিকালেও প্রেমবৈচিত্ত জনিত বিরহ এবং বিরহ কালেও নিকুঞ্জাদি লীলার ধ্যান ধারণাবেশে মিলন। প্রকট লীলায় লোক দৃষ্টপ্রকাশে মথুরায় যান এবং বাহেন্দ্রিয়ের অদৃশ্য প্রকাশান্তরে ব্রজে থাকেন।

ভ্রান্তি ও বিরহ পরস্পর পরিপোষক,—পরিপোষক কি না সুখসংবর্দ্ধক। বহির্ম্মিলনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখ—সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে। কান্তের সুদূর প্রবাস জনিত সুদীর্ঘ বিরহের প্রতীতি ব্যতীত সেইটি হয় না, এবং প্রোষিত ভর্ত্তৃকা নায়িকোচিত বিরহাবস্থা ব্যতীত মোহনাখ্য মহাভাবের উদয় হয় না। উক্ত ভাবেই প্রেমের পরম মহিমা, শ্রীমদ্ভাগবতীয় ভ্রমর গীতার দশটি শ্লোক তাহার প্রমাণ। যদি প্রশ্ন হয় যে, মোহন মহাভাব তীব্র জ্বালাময়, রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ তাহা উৎপাদন করেন কেন? তাহার উত্তরে এই বলাযায় যে,

"বাহিরে বিষ-জ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত।"

এই সত্যটি মোহন মহাভাবেই পরিস্ফুট হয়।

এই মোহন স্বভাব জনিত শ্রীরাধাঠাকুরাণীর প্রেমের প্রকর্ষ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে গৌরব অনুভব ও যে কৃতার্থতা তাহা অন্য কিছুতেই হয় না, এই রসনির্য্যাস গোলকে নাই, কারণ সেখানে সুদূর প্রবাস নাই। সুতরাং ইহার আস্বাদন প্রকটাবতারের এক প্রধান কার্য্য। প্রকট ব্রজলীলায় ব্রজে লুকাইয়া থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইহা আস্বাদন করেন। তদবস্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে দেখা দিলে রসই থাকে না। সেই জন্য প্রোষিত ভর্ত্তৃকার সহিত প্রচ্ছন্ন লীলা। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"ব্রজবধূ তোমা সনে ক্রীড়া করি রাত্রি দিনে
তাহা তুমি মানো সবে স্ফূর্ত্তি।"

এমনি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাতেও গম্ভীরায় লুকাইয়া—

"শ্রীরাধার ভাব যথা উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মগ্ন প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥"

"কৃষ্ণোঽন্যো যদু সম্ভূত" কথার এ অর্থ নহে যে, যদুবংশ সম্ভূত কৃষ্ণ নন্দনন্দন হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। জন্মলীলার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই উক্তি বটে। একই সময় একই কৃষ্ণ মথুরায় ও গোকুলে জন্মলীলা প্রকট করেন; গোকুলে স্বয়ংরূপে, মথুরায় বিলাসরূপে। রূপ দুইটী হইলেও স্বরূপে অভিন্ন। স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলে শ্লোকে 'কৃষ্ণোঽন্য' স্থলে 'কৃষ্ণাদন্য' প্রয়োগ হইত। জন্মলীলার পর বিলাস রূপটী স্বয়ংরূপে মিশিয়া যায় তদবস্থায়ই গোকুললীলা। এবং তদনন্তর ঐ মিলিত রূপেই মথুরা ও দ্বারকায় গমন। অতএব প্রকট লীলায় নন্দনন্দনই ব্রজের বাহিরে যান। কেবল চারিটি অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ব্রজে নিজের অতিন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্বয়ংরূপে

রাখিয়া যাইতে হয়। বাহিরে গিয়া যে সকল ভক্তের বা পরিকরের সহিত লীলান্বিত হন, তাঁহাদের ভাবের অনুরূপ বেশ ও অভিমান ধারণ করেন। এইজন্য মথুরা ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয় বেশ—ক্ষত্রিয়াভিমান এবং প্রয়োজনানুরূপ—ঐশ্বর্য্যের সেবায় বা উপাসক-ভক্তের বাসনা পূরণার্থ কখন কখন চতুর্ভুজাদি ঐশ্বর্য্য প্রকটন। তথাপি যখনই ব্রজ পরিকরের কথা প্রাণে জাগে, তখনই গোপ অভিমান আসিয়া পড়ে ও ব্রজ বিরহে কাতর হন। এ আর অধিক কি? কুরুক্ষেত্রে তো শ্রীরাধার সহিত দ্বারকানাথের সম্ভোগ বিলাস পর্য্যন্তই হইয়াছিল। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।"

তবে বেশের, ভাবের ও স্থানের পার্থক্য হেতু সুখটী তেমন হয় না।

শ্রীল ভক্তি সম্পাদক মহাশয় যে প্রশ্ন প্রেরণ করিয়াছেন, উহা শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটক আলোচনা সম্বন্ধীয় উক্তি সম্পর্কে। প্রশ্নোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য, একই উপাসনা বিষয়ক গ্রন্থে ব্রজলীলা ও পুরলীলার বর্ণনা একত্রে করা হইলে, দুই ধামের দুই স্বতন্ত্র লীলা এক হইয়া যায়। ফলতঃ একেবারেই শ্রীকৃষ্ণ (নন্দনন্দন) ব্রজ হইতে বাহির হন না। শ্রীমহাপ্রভুর উক্তির এই তাৎপর্য্য হইলে, শ্রীললিত মাধব রচনা দ্বারা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘিতই হইয়াছে বলিতে হয়, কিন্তু তাহা কখন সম্ভব নহে।

বৃন্দারণ্যবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বাবাজী মহাশয় কার্ত্তিক সংখ্যা "সোণার গৌরাঙ্গ" পত্রে জন্মলীলা প্রসঙ্গে যে আলোচনা করিয়াছেন, বাবাজী মহাশয়ের সে অভিপ্রায়ানুসারে উত্তরটী লিখিত হইল।

এই যে সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্ন, ইহা নূতন নহে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এক সময় শ্রীল প্রেমানন্দ দাস চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদীয় মানশিক্ষা হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমার উক্তি সমাপ্ত করিলাম।

"ওরে মন! কেনে ভুল সংসার ভাবিতে!
শ্রীনন্দ নন্দন হরি গেলা কি না মধুপুরী,
সন্দেহ নারিহ ঘুচাইতে।
যদি বল নন্দাত্মজ সে কেনে ছাড়িবে ব্রজ,
কখন না যায় অন্য স্থানে।

যে হৈতে অক্রূর আইল কৃষ্ণচন্দ্রে নিয়া গেল।
কে আর রহিবে বৃন্দাবনে ?
রাধিকার প্রাণনাথ সর্ব্বদা গোপীর সাথ,
যদি বল বিহারে ব্রজেতে।
তবে কেনে গোপীগণ বিরহে ব্যাকুল মন,
দূতী পাঠাইলা মথুরাতে ॥
কৃষ্ণ যে উদ্ধব দ্বারে প্রবোধিলা গোপীকারে,
মহিষীর দলে সদা কাঁপে।
রাধিকা স্মরণ করি নেত্র অশ্রুজলে ভরি,
ক্ষণে মূর্চ্ছা বিরহ সন্তাপে ॥
কুরুক্ষেত্রে দুই জনে যাঁর যে আছিল মনে,
সব দুঃখ নিবারণ কৈল।
জানিয়া রাধার মর্ম্ম বুঝাইলা নিজ ধর্ম্ম,
কৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রতীত হইল ॥
কালিন্দী কর্ণিকা শ্যাম অভেদ একই ধাম
কেন ইথে ভিন্ন ভেদ কর।
যাহা কৃষ্ণ তাহা ব্রজ সদা এই ভাবে ভজ।
যদি ভাই মোর বোল ধর ॥
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী এবে নবদ্বীপে আসি
রাধা ভাব কান্তি অঙ্গিকারি।
নিজে করি আস্বাদন শিখাইল ভক্তগণ
বিস্তার করিল জগভরি ॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবনে কহ কহ তবে কেনে
ছাড়া কি সে মথুরা নগর ?
প্রেমানন্দ কহে মন রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন
এক ঠাঁই শ্রীগৌর সুন্দর ॥"

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১৭)

৩২।—(তাই) বড় সাধ হয় মনে মহাপ্রভুর গুণে
মহা সঙ্কীর্ত্তনে মেতে যাই।
যদি গাই প্রাণারাম শ্রীগৌরাঙ্গ নাম
(বুঝি) ত্রিতাপে বিরাম তবেই পাই॥
গৌরাঙ্গ আমার সহজে করুণ,
পতিতের লাগি আরো শতগুণ,
দুখিতের হরে দুঃখ নিদারুণ—
কলির পীড়ন হ'তে সদাই :-
যে গৌরাঙ্গ নাম লয় নিরন্তর,
কি করিবে তারে শমন কিঙ্কর,
পেয়েছি অভয় শুনিয়া বিস্তর—
সাধু শাস্ত্র গুরু সদনে তাই
গৌরাঙ্গ নামের উচ্চ সিংহনাদ,
শুনি পাপ কলি গণে পরমাদ,
গৌর-নাম মন্ত্র সর্ব্বসার তন্ত্র—
এ মায়া-চক্রান্ত ভেদিতে ভাই :—
গৌরাঙ্গ জীবের অদিনে বান্ধব,
পাপি তাপি দীন দুঃখির বৈভব,
তরিতে দুস্তর কলি-ভবার্ণব—
গোরা বিনে আর গতি নাই॥
গৌরাঙ্গ জীবের সর্ব্ব সাধ্যসার,
সর্ব্বতত্ত্ব ময় সর্ব্ব সারাৎসার,
(সেযে) ভক্তের আরাধ্য প্রেমিকের বাধ্য—
ভাবুকের (সদা) সুখদাই :—
যুগল উজ্জ্বল রস রত্ন খনি,
তার সার সত্ত্বা গোরা গুণমণি,
গায় বিশ্বরূপ একাধারে মানি—
রাইরূপে কানু, কানু অঙ্গে রাই॥

সম্পাদক

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম।

"অনন্ত চৈতন্য কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খেয়ে তারে করি টানাটানি॥"

বামনের চাঁদ ধরিবার মত এবং পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের মত আমার সাধ হইয়াছে অনন্তের মত বিস্তৃত শ্রীগৌরাঙ্গ কথা আলোচনা করিয়া চিত্ত শুদ্ধি করিব। শ্রীগৌরাঙ্গের শেষ জীবন, মহা বিরহের প্রেম-চিত্র—অশ্রু-জলের অফুরন্ত উৎস। রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর সেই লীলায় নিত্য সহচর। সেই মহা বিরহের প্রেম-চিত্র স্মরণ করিয়া আমাদের চণ্ডীদাসের সেই শ্রীমতী রাধিকার পূর্ব্বরাগের পদটী মনে পড়িতেছে,—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি॥
নিজ করোপর রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥
হেন কালে তথা আইল ললিতা
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া বেথিত হইয়া
তুলিয়া লইলা করে॥
নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
"আজু কেনে ধনি হ'য়েছ এমনি
কহবা কি লাগি শুনি॥
আজনম সুখে হাস বিধুমুখে
কভু না হেরিয়ে আন।

আজু কেন বল কাঁদিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ॥
চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে কৈলে অগেয়ান।"
চণ্ডীদাস কহে বেজে ছ হৃদয়ে
শ্যামের পিরীতি বাণ॥

শ্রীমতীর ললিতা ও বিশাখা যেমন মর্ম্মসখী সেইরূপ নীলাচলে গম্ভীরা-গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ উঘাড়িয়া কৃষ্ণ কথা আলাপন কালীন অবিরল অশ্রু-জলের সান্ত্বনাকারী ও ভাবগ্রাহী মর্ম্মসখা রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর। এই রায় রামানন্দের স্বর্গ-মন্দাকিনীর ন্যায় পবিত্র ও সুধামাখা জীবনী আলোচনা করিয়া আজ আমরা অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। কৃপাময় পাঠকগণ শক্তি সঞ্চার করুন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া যখন অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব, পরম লোভনীয় এবং জীবের একমাত্র কাম্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব অবগত হইয়া মোহিত হইয়া ছিলেন তখন তাঁহার হৃদয় কন্দরে একটী মহতী বাসনার উদয় হইয়াছিল যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ন্যায় এই অদ্ভুত প্রেমসিন্ধুর সহিত যদি বিদ্যা-নগরাধিপতি প্রেম প্রবাহিনীবৎ শ্রীল রায় রামানন্দের মিলন ঘটে তাহা হইলে সে মিলন যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলনের ন্যায়ই মনোরম হইবে। বিশেষতঃ বেদান্তাদি শুষ্ক জ্ঞান-চর্চ্চায় কালাতিপাত করায় এবং প্রেম-তত্ত্বে তাঁহার অধিকার না থাকায় তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তৃপ্ত করিতে পারেন নাই। তাই প্রভু যখন দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের অভিলাষ জানাইলেন তখন সার্ব্বভৌম বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান।

আমরা শুনিয়াছি প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডিদাসের সহিত যদি শ্রীগৌরাঙ্গের মিলন হইত তাহা হইলে যে কিরূপ মধুময় হইত তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। কারণ—

"চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।"

এই সকল শ্রীগ্রন্থ প্রভৃতিই যে মহাপ্রভুর মহাবিরহী জীবনের একমাত্র

অবলম্বন ছিল। প্রভুর এই অন্যতম মর্ম্মী রায় রামানন্দের ন্যায় ভক্তের সহিত তাঁহার মিলন কাহিনীই বোধ হয় ধর্ম্ম জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান আখ্যায়িকা। আমরা সেই সুমধুর মিলন কথাই এইবার বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথামত বিদ্যানগরে আসিয়াছেন। তিনি প্রসন্ন সলিলা গোদাবরি জলে স্নান করিয়া ঘাটের অদূরে বসিয়া নাম জপ করিতেছেন। সেই নবীন সন্ন্যাসীর আত্মহারা প্রাণের "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে" এই মধুমাখা নামের সুধামাধুরী, তাঁহার কনক-কান্তির দশদিক আলোকিত প্রভা, আয়ত নেত্রের সুধাক্ষরিত দৃষ্টি, তাবৎ নর-নারীর চিত্তে এক প্রলয় প্লাবন বহাইয়া দিতেছিল। অহো! মানুষের কণ্ঠ যে এত মধুর হইতে পারে এবং অঙ্গকান্তি যে দেবতার ন্যায় হইতে পারে তাহা যে তাহারা কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। তাই তাহারা প্রভুকে দেখিয়া ভাবিতেছে, কে এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ?

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যাপার শুনুন। তিনি ঘাটে আসিয়া স্নান করিবার পূর্ব্বে, তত্রত্য নর-নারীর চিত্তকে ব্রজভাবে বিভাবিত করিবার জন্যই বোধ করি এক অনির্ব্বচনীয় প্রেম-তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছিলেন। গোদাবরী তীরে কুসুমিত উপবন দেখিয়া তাঁহার প্রেম-বিহ্বল চিত্তে শ্রীবৃন্দাবনের মধুময়ী স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল ;—

> "গোদাবরী দেখি হল যমুনা স্মরণ।
> তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥
> সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য গান।
> গোদাবরী পার হৈয়া তাহা কৈলা স্নান ॥" (চৈঃ চঃ)

ঘাটের অদূরে বসিয়া মহাপ্রভু নাম জপে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। আর চিত্রার্পিতের ন্যায় শত শত ব্যক্তি তাঁহাকে ঘেরিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব মাধুরি নিরীক্ষণ করিতেছে। এমন সময়ে ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দ আসিয়া ছিন্ন মূল দ্রুমের ন্যায় তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন আমি বুঝিতেছি "তুমি সেই রামানন্দ রায়।" রামানন্দ বিনীত ভাবে বলিলেন "এই শূদ্রাধম আপনার অধম দাসই বটে।" তখন মহাপ্রভু সানন্দে রামানন্দকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজই এই অমৃতোপম

ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং এই প্রবন্ধের বহু স্থানে আমরা তাঁহার শ্রীগ্রন্থ হইতে স্থান বিশেষ দেখিয়া দেখিয়া উদ্ধৃত করিব।

"তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহে আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্ গদ্ কৃষ্ণবর্ণ॥"

রামানন্দ রায় ইতিপূর্ব্বে কখনও মহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু প্রথম দর্শনেই সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী তাঁহার সমগ্র হৃদয় ধরিয়া আকর্ষণ করিল। তিনি চির অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্তির ন্যায় সাদরে তাঁহাকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইলেন। হৃদয়ের আবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন॥
তোমা মিলিবারে মোর হেথা আগমন।
ভাল হইল অনায়াসে পাইল দর্শন॥"

রামরায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই আনন্দিত হইয়াছিলেন। আবার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া বলিলেন—"তিনি আমাকে তাঁহার দাস বলিয়াই মনে করেন, যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার কৃপায় আজ আমার মনুষ্য জন্ম সফল করিতে আপনার আগমন হইয়াছে। আপনি আমার ন্যায় অস্পৃশ্য বিষয়ীকে স্পর্শ করিয়া ধন্য করিলেন, ইহাতে বুঝিলাম আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনি যে স্বয়ং নারায়ণ ইহা বুঝিবার আরও একটি কারণ দেখিতেছি। আমার সহিত ব্রাহ্মণাদি নানা জাতীয় লোক আসিয়াছে।* যাহারা কখনও হরি নাম মুখে আনে নাই, ভক্তির

---

* বিপুল বিদ্যানগর সাম্রাজ্যের অধিপতি রাজা রামানন্দ রায় অতীব আড়ম্বরের সহিতই গোদাবরী নদীতে স্নান করিতে আসিতেন যথা——

"হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥

বার্ত্তা কোন দিন অবগত ছিল না তাহারাও আজ আপনার প্রভাবে কৃষ্ণ প্রেমে আকুল হইতেছে এই সমস্ত দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি আপনি সাধারণ মনুষ্য নহেন।

বিনয়ের খনি শ্রীগৌরাঙ্গ দেব অমনি বলিয়া উঠিলেন—"না না রামরায় তাহা নহে, তুমি শ্রীকৃষ্ণের একজন শ্রেষ্ঠভক্ত তোমার অকথ্য-প্রেম হইতেই তাবৎ লোকের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে দ্রবীভূত হইয়াছে। আমার কথা কি বলিতেছ? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমি কোন দিনই প্রেম ভক্তির ধার ধারিনা, আমিও আজ তোমাকে স্পর্শ করিয়াই কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হইয়া যাইবার মত হইয়াছি। এখন বুঝিতেছি আমার কঠিন চিত্ত দ্রবীভূত করিবার জন্ম সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃপা করিয়া আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন,—

"আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ভাসি॥
এই জানি—কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥

এইরূপে উভয়ে উভয়ের স্তুতি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহাকে বৈষ্ণব দেখিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন এবং রামরায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিবার আমার বড়ই সাধ, আবার যেন তোমার দর্শন পাই।"

সেই মধু-মূরতির মধুমাখা কথাগুলি শুনিয়া রামরায় একেবারে গলিয়া গেলেন; তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন "প্রভু তুমি দয়াময়, দয়া

তার সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈলা তেঁহো স্নান তর্পণ॥"

* *

"রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
সূর্য্য শত সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন॥
দেখিয়া তাহার মনে হইল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥"

করিয়া যখন এ অধমকে দর্শন দিয়াছ তখন কিছু দিন এস্থানে অবস্থান করিয়া আমার দুষ্ট চিত্ত শোধন করিয়া দিয়া যাও।" এই কথা বলিয়া রামরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অতিকষ্টে গমন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সেই প্রেমোজ্জ্বল, শত চাঁদ বাটা ঝলমল শ্রীমূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রামরায় গৃহে ফিরিয়া গেলেন আর কাঙালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষার্থ সেই ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করিলেন। সহৃদয় পাঠকগণ! এখন আপনারা চিন্তা করুন এই বৈরাগ্যের পূর্ণ আদর্শ এবং প্রচ্ছন্নাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত অতুল বৈভবশালী রাজা রামরায়ের প্রথম মিলন কিরূপ অদ্ভুত হইয়াছিল!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামরায় যখন গোদাবরী নদী-জলে স্নান করিতে আসিতেন তখন বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে এবং শত শত বাদক বাদ্য বাজাইয়া তাঁহার অনুগমন করিত। সেই পরম গম্ভীর রাজা রামানন্দ এই অপূর্ব্ব-দর্শন সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিয়া অতীব বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে যখন স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার সকল প্রকাশিত হইয়া পড়িল তখন ব্রাহ্মণগণ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—

"দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন?
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত, হইলা অস্থির।"

আজ পুণ্যতোয়া গোদাবরী তটে যে অপূর্ব্ব প্রেম-তরঙ্গ উত্থিত হইল রাজার সঙ্গী বহিরঙ্গ বিপ্রগণ তদ্দর্শনে যে চমৎকৃত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কারণ প্রেমের নিগূঢ় ও বিচিত্র ক্রিয়া এতাদৃশ লোকের একেবারে অজ্ঞাত ছিল। ইহাদের হৃদয় ক্ষেত্র প্রেমামৃত বর্ষণোপযোগী প্রস্তুত ছিলনা বলিয়াই বোধহয় মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ উপলক্ষ করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং গোপনে রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাধন সিদ্ধ চিত্তে, অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম অর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন মহারাজা প্রতাপ রুদ্র উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।. ইনি অপ্রতিহত প্রভাবে ৩৬ বৎসর কাল যাবত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইহার বিশাল রাজ্যের সীমা সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ছিল। রাজাধিরাজ প্রতাপ রুদ্র একদিকে যেমন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিস্বামী ছিলেন অপর দিকে আবার তিনি মহাপ্রভুর একজন অনুরাগী ভক্ত এবং তদীয় ৬৪ মোহান্তের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম অসাধারণ ছিল, মহাপ্রভুর কৃপালাভের জন্য তিনি বলিতেছেন,—

"প্রভু কৃপা বিনে মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী ॥

এবং তাঁহার উৎসাহেই কবি কর্ণপূরের গ্রন্থ সমূহ রচিত হইয়াছিল। রামানন্দ রায় এই মহারাজার অধীন রাজা, মন্ত্রণাদাতা এবং প্রিয় পাত্র ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে কুট রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য রাজধানীতে গমন করিতে হইত। তিনি স্বয়ং মহাপ্রভুর নিকট আপনাকে রাজসেবী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।—

"কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥"

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে আমরা এই রামানন্দ রায়ের বাল্য চরিত্র, শিক্ষা, বিবাহ, রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় ঘটনা কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। সম্ভবতঃ ১৩০০ শকের শেষভাগে কটক অঞ্চলে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জাতীতে কায়স্থ ছিলেন তবে তাঁহার জাতীয় উপাধি জানা যায় না। কেবল মাত্র তিনি বৈষ্ণব সুলভ বিনয়ের বশে মহাপ্রভুর নিকট আপনাকে হীন শূদ্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। উপরের পয়ারেই তাহা দৃষ্ট হয়। অন্যত্র উক্ত আছে,—

"এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি সূর্য্য সম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥"

মহাপ্রভু রায় রামানন্দ দ্বারা প্রেমভক্তি তত্ত্ব জগতে প্রকটিত করিয়াছেন এবং ভক্তের মাহাত্ম্য বাড়াইতেও তিনি অতিশয় নিপুন ছিলেন। ভক্তের মাহাত্ম্য জগদ্বাসীকে জানাইবার যখনই যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তখন

তখন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। একদিন বল্লভভট্টের নিকট কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—

"রামানন্দ রায় মহা ভাগবত প্রধান।
তেঁহো জানাইল, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগ মার্গে প্রেম ভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্ত আশ্রয় যাহার॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান যুক্ত কেবলভাব আর।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে না পাইল ব্রজেন্দ্র কুমার॥
শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন॥
"মোর সখা, মোর পুত্র" এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুকব্যাস করে যারে প্রশংসন॥
ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে কেবলভাব প্রধান॥
এসব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
অনর্গল রস বেত্তা,—প্রেম সুখানন্দ॥"

আমরা রায় মহাশয়ের ব্যক্তি গত ঐতিহাসিক পরিচয় বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু তাঁহার গভীর প্রেম-রসতত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় শ্রীচরিতামৃত হইতে জানিতে পারি। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥
* * *
মহা প্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি প্রেম সীমা॥"
* * *
গৃহস্থ হইয়া রায় নহে ষড়্‌বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥"

এই সন্ন্যাসী স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ। যিনি—

"ভক্তি-তত্ত্ব প্রেমে কহে রায়ে করি বক্তা।"

রস, অনর্গল-রস এবং সেই অনর্গল-রস-বেত্তা" রামরায়ের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিবার শক্তি আমাদের কোথায়?

রামানন্দ সমস্ত দিবস অতীব উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া নিশীথে সেই বিপ্রগৃহে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নবীন সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইলেন। তিনি প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলে প্রভু আদরে তাঁহাকে তুলিয়া বক্ষে ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া উভয়ে উপবেশন করিলে ধর্ম্ম কথা আরম্ভ হইল।

এই যে রামরায়-কথিত ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ ইহা জগতের ধর্ম্মশাস্ত্রের এক অভিনব অমূল্য সম্পদ। জগতের অপর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার ক্ষীণ ছায়াও বর্ত্তমান নাই। এখন মহাপ্রভুর প্রশ্ন করিবার ভঙ্গি শুনুন,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ॥
কৃপাকরি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বই কেহ ইহা নিরূপিতে নারে॥

*   *   *

সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল॥
তেঁহ কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণ কথা।
সবে রামানন্দ জানে তেঁহ নাহি হেথা॥
তোমার ঠাঁই আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥"

মহাপ্রভু বলিলেন "রামরায় তোমার তত্ত্ব কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতে আসিয়াছি এখন সাধ্য নির্ণয় সম্বন্ধে কিছু বল।" রামরায় ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে বিনীত ভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন—প্রভো! স্বধর্ম্মাচরণেই বিষ্ণু ভক্তির উদয় হয়। তাহার প্রমাণ,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ কারণম্॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারশীল পুরুষ দ্বারাই পরম পুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হয়েন। ইহা ব্যাতীত তাঁহার পরিতোষের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

প্রভু ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না বলিলেন "ইহা ধর্ম্মের বাহ্যসাধন, ইহার পরে আর কি আছে বল—।" রামরায় বলিলেন, "তাহা হইলে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণই সাধ্য সার। শাস্ত্রে আছে,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" (গীতা)

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কর, যাহা আহার কর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর তাহা সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে।

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিলেও সকামতা দোষ দূর হয় না। কেবল মাত্র কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায়। প্রভু কিন্তু ইহাও বাহ্য বলিয়া উপেক্ষা করিলেন এবং ইহার পরে যাহা আছে তাহাই বলিতে বলিলেন।

প্রভু যখন সকাম ও নিষ্কাম উভয় বিধ ধর্ম্মকেই বাহ্য ধর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষা করিলেন তখন রামরায় বলিলেন তাহা হইলে আমার মনে হয় স্বধর্ম্ম ত্যাগই সাধ্য তত্ত্ব সার। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এই শরণাপত্তি ধর্ম্মের মূলে দুঃখ দূরিভূত করিবার বাসনা আছে সুতরাং প্রভু ইহাকেও বাহ্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়া ইহারপর কহিতে বলিলেন।

তখন রামরায় দেখিলেন জ্ঞানি ভক্তের প্রসন্ন আত্মায় সুখ দুঃখের অনুভূতি নাই সুতরাং তিনি জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিই সাধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু প্রভু তাহা স্বীকার করিলেন না।

তখন রামরায় বলিলেন তাহা হইলে জ্ঞান শূন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু,—

"জ্ঞানে প্রয়াস মুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু বাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

ভাঃ ১০।১৪।৩

অর্থাৎ হে ভগবন, যাঁহারা নির্ব্বেদ ব্রহ্ম জ্ঞান প্রয়াস না পাইয়া ভক্ত-সঙ্গে বাস করেন এবং ভক্ত-মুখরিত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণে দেহমন দ্বারা—তাহাতেই জীবন অতিবাহিত করেন, হে দেব, তুমি ত্রিভুবনে অজিত হইয়াও তাঁহাদিগের দ্বারা জিত হইয়া থাক।"

প্রভু ইহা মান্য করিলেন কিন্তু ইহার পরের কথা বলিতে বলিলেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধন-তত্ত্বের প্রথম সোপান বিশুদ্ধ ভক্তি হইতেই সঞ্জাত। বৈষ্ণবধর্ম্মের—সাধনায় সাধক এইরূপে সাধ্য তত্ত্বের নিগুঢ় প্রদেশে ক্রমশঃ উপনীত হয়েন।

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রায় বলিলেন, প্রভো প্রেম ভক্তিই সর্ব্ব সাধ্য সার। ইহার পর তিনি এই স্বরচিত শ্লোক পাঠ করিলেন যথা,—

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে, জরঠা পিপাসা,
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য পেয়ে॥"

অর্থাৎ বিবিধ উপচার দ্বারা পূজা ব্যতিত ও কেবল প্রেম দ্বারাই ভক্ত-হৃদয় সুখে দ্রবীভূত হয়। যে পর্য্যন্ত বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্তই ভক্ষ্য পেয় সুখের কারণ হয়।

রামরায় পুনরায় প্রেম ভক্তির উদাহরণ স্বরূপ আর একটী শ্লোক পাঠ করিলেন উহার অর্থ,—যদি কোথাও কৃষ্ণভক্তি রস ভাবিতা মতি পাওয়া যায় তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রয় কর। লোভই উহার একমাত্র মূল্য। কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারাও এই সুদুর্ল্লভ লোভ জন্মে কিনা সন্দেহ।"

এই প্রেম ভক্তির রাজ্যে উপনীত হইলে প্রভু রামরায়ের বাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়া আরও উচ্চ মত প্রকাশ করিতে বলিলেন।

তখন রামরায় প্রেম ভক্তির প্রথম সোপান স্বরূপ দাস্য প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়া একটি শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীভগবানের দাসগণের সকল সিদ্ধিই করতলগত। এবং দাস্যপ্রেমের এই ভাব সূচক একটি শ্লোক পাঠ করিলেন যে আমি তোমার দাস হইয়া সতত তোমার চিন্তা করিয়া প্রসন্ন-চিত্ত হইয়া এবং তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া হৃদয় স্বামী করিয়া রাখিব।

প্রভু অনেক উচ্চাঙ্গের সাধনার কথা বলিয়া যাইতেছেন, প্রেমভক্তির সাধক কে কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবদ্দাস্যের জন্য আকুল হইতে হইবে। সাধক

যখন দাস্য প্রেমে সিদ্ধ হন তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ও বাহ্যতৃষ্ণার বিলোপ হইয়া যায় এবং তাহার চিত্ত মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় শ্রীভগবানের পাদপদ্মের চতুর্দ্দিকে মকরন্দের লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। প্রভুর প্রশ্নে রায় ইহার পরের অবস্থা সখ্য প্রমের কথা তুলিয়া বলিলেন;— দাস্য প্রেমে প্রভু ও ভক্তের মধ্যে প্রেমের মাখামাখি না জন্মিয়া উভয়ের মধ্যে একটু দূরত্ব রাখে তাহাতে 'তিনি' বেশ প্রীত হন না—

"আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমাবশে আমি না হই অধীন॥"

শ্রীভগবান ব্রজের রাখালগণের সহিত যে লীলা করিয়া ছিলেন তাহাই সখ্যপ্রেম। আর সেই রাখালগণের অবস্থা এইরূপ,—

"সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক" তুমি আমি সম॥"

রামরায় সখ্য প্রেমের বর্ণনা করিলে প্রভু বলিলেন ঐ সখ্য প্রেমের সাধনায় ভগবানকে লাভ করা যায় উত্তম কথা কিন্তু ইহা সাধ্যতত্ত্বের সার নহে ইহার পরে কি তাহা বল।"

তখন রামরায় বলিতেছেন ইহার পর যদি কিছু বলিতে হয় তবে তাহা বাৎসল্য প্রেম। ভাগবতকার, শিব ব্রহ্মা এমন লক্ষ্মী হইতেও নন্দ ও যশোদার ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। যেহেতু তাহারা স্বয়ং ভগবানকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যশোদার স্তন্যে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বদেব দেবী অপেক্ষা তাঁহারা ভগবান শ্রীহরির প্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

এই বাৎসল্য প্রেম, ইহা আমরা মানুষ দূরের কথা তির্য্যক প্রাণীতেও পূর্ণ মাত্রায় দেখিয়া থাকি। বাৎসল্য প্রেমের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিবার সময় আমাদের মনে "বৎসহারা গাভী" কথাটি কি স্বতঃই উদিত হয় না? তাহা ছাড়া বনের পশু পাখী কাহার অন্তঃকরণেই বা বাৎসল্য প্রেম পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত নাই? মানুষ যদি বৎসহারা গাভীর মত শ্রীকৃষ্ণকে "কৃষ্ণরে বাপরে আমার" বলিয়া ডাকিতে পারেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে সেই প্রাণ গোপালের দর্শন লাভ করা অসাধ্য হয় না। মোট কথা বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমে হৃদয় পূর্ণিত হইলেই তাঁহার ঈপ্সিত মূর্ত্তিতে দর্শন মিলিবে। ভক্ত-মালে একটি ভক্তের বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম; তিনি শ্রীকৃষ্ণের একটী বালগোপাল মূর্ত্তিকে বাৎসল্য প্রেমে ভজনা করিতেন—লালন পালন করিতেন'

নিশীথে গোপালকে বক্ষে লইয়া শয়ন করিতেন, রাত্রে বিড়াল ডাকিলে গোপাল ভীত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া শান্ত করিয়াছিলেন। লীলাময়ের লীলা বুঝা ভার। পরদিন রাত্রে আবার বিড়াল ডাকিল আবার গোপাল ভীত হইয়া তাঁহাকে জানাইল এবার ভক্তটীর দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল—তাঁহার চিত্ত হইতে বাৎসল্য ভাব দূরীভূত হইল, তিনি ভাবিলেন অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কখনও কি সামান্য বিড়াল হইতে ভয় জন্মিতে পারে? ভক্তের মনে এই ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় ভগবানেরও ভাবান্তর জন্মিল তিনি সেই দিন হইতে তাঁহার সহিত গোপাল মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া বাক্যালাপ করা বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রেমের ঘনাবস্থা বাৎসল্য-স্নেহে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন ইহা শুনিয়া শ্রীপ্রভু বলিলেন,—

"—এহোত্তম আগে কহ আর"

ইহাতে রামরায় ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের কথা তুলিয়া বলিলেন ব্রজসুন্দরীগণই মধুর ভজন প্রকটিত করিয়াছেন। এই ভজনের উপকরণ তাঁহাদের মধুর চাহনি, মধুর হাসি, হাবভাব, সম্ভাষণ এককথায় তাঁহাদের নবযৌবনের নবানুরাগের সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনার স্থান ব্রজের কুসুমিত কুঞ্জ কানন। রায় বলিতেছেন এই মধুর ভজন বা কান্তাগণের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বশীভূত হন। আর মধুর ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী গুণ সমূহের সমন্বয় হওয়ায় ইহা গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য হইয়াছে। যথা,—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে ॥"

ইহাই গোপীপ্রেম, এই গোপীপ্রেমের নিকট ভগবান ঋণী। যেহেতু তিনি গোপীদের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে অক্ষম। তিনি গোপীপ্রেমের নিকট আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই কান্তভাবই সর্ব্ব সাধ্যসার।

এক্ষণে প্রভু তৃপ্ত হইলেন তিনি বলিলেন, "জীবের সাধনার ইহাই চরম সীমা বটে। আমরা কান্তাপ্রেম একটু পরিস্ফুট ভাবে বুঝিবার জন্য এখানে চণ্ডীদাসের একটী পদ উদ্ধৃত করিব।—

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব ;
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব ॥
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ক্রটী শত হয় কোটী
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
না ঠেলিও বলে অবলা অথলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর ॥
তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি ॥

এই যে সরল প্রাণের সরল—প্রেমের বর্ণনা ইহাই শ্রীরাধার প্রেম, ইহা প্রেমতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মহাপ্রভু এই মহতী প্রেম স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এই প্রেমভাণ্ডার জগদ্বাসীর জন্য মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই পর্য্যন্তই যে সাধ্যের সীমা তাহা মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন বলিলেন,—রামানন্দ ! ইহার পরে আরও কিছু যদি প্রকাশ করিয়া বলিবার থাকে তাহা দয়া করিয়া বল।

এইবার রামরায় অতি মাত্র বিস্মিত হইলেন যেহেতু তিনি সাধন তত্ত্বের চরম সীমা বলিয়াও মহাপ্রভুর তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। রায় অনেক ভাবিয়া বলিলেন কান্তা প্রেমের মধ্যে শ্রীমতীর প্রেমই সাধ্য শিরোমণি। মহাপ্রভু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন তোমার মুখ হইতে অমৃতক্ষরণ হইতেছে কিন্তু আমার চিত্ত হইতে একটা সন্দেহ যাইতেছে না। রাধা প্রেম সাধ্য শিরোমণি—

কিন্তু রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর সহিত একান্তে মিলিত হইবার জন্য গোপীদিগের ভয়ে ইঙ্গিত করিয়া লইয়া গেলেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদিগকে ভয় করিতেছেন তখন এ প্রেম নিরপেক্ষ নহে—ইহা ভাগের প্রেম, ইহাতে দৃঢ়তা কোথায়?

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

প্রভুর বাণী

প্রশ্নোত্তর ছলে প্রভুর শ্রীমুখ হইতেও কৃষ্ণপ্রেম-রসানন্দী রায় রামানন্দ অনেক উপদেশামৃত নিঃসৃত করাইয়াছিলেন। সে সকল মধুর উপদেশামৃতের মূল্য নাই। একটি কথায় প্রভু যাহা আমার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন শত সহস্র বৎসর শাস্ত্রাধ্যয়নেও তাহা শিক্ষা হইবে না। সেই সকল কথামৃতকণা ত্রিতাপদগ্ধ জগজ্জীবের প্রাণবায়ু স্বরূপ হইয়া চিরকাল তাহাদের জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ হইবে। গৌরভক্তবৃন্দের চরণে জীবাধম লেখকের নিবেদন, তাঁহারা যেন প্রভুর উপদেশগুলি তাঁহাদের হৃদয়ফলকে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। বহু শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন নাই—বহু ধর্ম্মোপদেশকের উপদেশ শুনিবারও আবশ্যকতা নাই—শুধু মাত্র প্রভুর উপদেশ বাণীগুলি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া ভজনপথে অগ্রসর হউন, দেখিবেন কি সুখময় ফল পাইবেন, কি আনন্দে আপনার জীবন কাটিয়া যাইবে। নানা মুনির নানা মত, নানা ধর্ম্মগ্রন্থে নানা উপদেশ তাহাও আবার পরস্পর বিরোধী; কার কথা শুনিব? কাহার উপদেশ পালন করিব?

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।"

তর্কদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, শ্রুতিসকল ভিন্ন ভিন্ন, যাহাদের মত পরস্পর বিভিন্ন নহে এতাদৃশ ঋষিও নাই। কি করিয়া আপনি জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবেন? তাই বলি প্রভুর উপদেশবাণী সর্ব্বধর্ম্ম সার তত্ত্বরূপে গ্রহণ করুন আর দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হউন অবশ্যই সাধন সমরে বিজয়ী হইবেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের ধার ;
তিঁহো যে কহেন বস্তু সেই বস্তু সার।

চতুর শিরোমণি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু রায়রামানন্দের মুখ দিয়া অনেক উপদেশামৃত বর্ষণ করিয়াছেন। প্রভু প্রশ্নকর্ত্তা, রায় রামানন্দ উত্তর দাতা। রায় রামানন্দ বলেন—

"হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥"

অন্যত্র তিনি প্রভুকে বলিতেছেন—

"রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥"

এ সকল কথা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিবে—ফলও অতি উত্তম পাইবে।

"বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।"

গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সহিত প্রভুর প্রথম সাক্ষাতের পরই তাঁহার সহিত প্রভুর বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইল। রতনে রতন চিনে। প্রভু ভৃত্যে সম্পূর্ণ পরিচয় হইল। প্রভু চিরদিনই ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া আসিতেছেন। তিনি রায় রামানন্দকে কহিলেন—

"প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণ কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানে তুমি সীমা॥"

এই বলিয়া প্রভু তাহাকে বিদায় দিয়া কহিলেন—"অদ্য সন্ধ্যাকালে তুমি পুনরায় এখানে আসিবে। তোমার সহিত কৃষ্ণকথা কহিয়া প্রাণ জুড়াইব।"

রায় রামানন্দ নিজকার্য্য করিয়া যথাসময়ে প্রভুর নিকটে আসিলেন। নিভৃতে বসিয়া দুইজনে কৃষ্ণকথা আরম্ভ করিলেন, প্রভু প্রশ্নকর্ত্তা। প্রভু কহিলেন—"কোন বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।" রায় রামানন্দ কহিলেন "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।"

এখানে কৃষ্ণভক্তি বিদ্যা বলিতে কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র। বিদ্যা শব্দ শাস্ত্রেরই রূঢ়ি যথা—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংশাস্ত্রায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্ম শাস্ত্র পুরাণানি বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশঃ॥

শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত যথাযথ ভক্তিস্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, এই নিমিত্তও কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসই যথার্থ বিদ্যা।

এক্ষণে প্রভুর উপদেশটি একটু বিচার করুন। প্রভু রামানন্দ রায়কে দিয়া বলাইলেন "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর" ইহার অর্থ কি? শ্রীভগবান সর্ব্বশক্তিমান তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তিনি প্রসন্ন হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। তিনি সর্ব্ব দেবদেবীর উপর। তিনিই আমাদের নদীয়ার ব্রাহ্মণ-বালকরূপী শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ। গৌর-কৃষ্ণ-ভক্তি প্রতিপাদক ভক্তিগ্রন্থ সকল পাঠ ও শ্রবণই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা। ইহা করিলেই অন্যান্য ক্ষুদ্রতর বিদ্যাগুলি আপনা আপনিই সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিনা আয়াসে তাহারা সাধ্যায়ত্ত হইবে—অনায়াসলব্ধ হইবে। মূল বিদ্যা ভগবদ্ভক্তি আচরণ, শ্রীভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "বুদ্ধি যোগং দদামি তে"।

অতএব ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও পঠন পাঠনই প্রকৃত বিদ্যার্জ্জন। বিদ্যা যেমন অমূল্য ধন, তেমনি ভক্তিও অমূল্য ধন। এ ধন "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" বিদ্যা দান শব্দের অর্থ সকলেই জানেন, ভক্তি দান শব্দের অর্থ কি? ভক্তি কি কেহ দান করিতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ভক্তিও জীবের একটি বিদ্যা। বিদ্যা যেমন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, ভক্তিও তেমনি ভক্তের নিকট শিক্ষণীয়। বিদ্যা যেমন বিদ্বান মাত্রেই শিক্ষা দিতে পারেন, ভক্তিও তেমনি ভক্ত মাত্রেই শিক্ষা দিতে পারেন। নিজ নিজ অধিকার ও শক্তি অনুসারে শিক্ষক বা ভক্তগণ বিদ্যা বা ভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই কার্য্যে শিক্ষক ও ছাত্রের উভয়েরই উপকার। ভক্তি-বিদ্যা মহাবিদ্যা। যিনি ভক্তি-বিদ্যার পারদর্শী অন্য সকল বিদ্যা তাঁহার করায়ত্ত; সে সকল অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্যই প্রভু রামরায়ের মুখদিয়া বলাইলেন "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।" ভক্তি-বিদ্যাদাতা মহাজনগণকে শাস্ত্রে "ভূরিদা" বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহরিদাস গোস্বামী

বিশাখার কৌশল শিক্ষা*

বিশাখা কহিল রাই,
কথা না শুনিয়া কাঁদিলে কেবল
আমরা তোমার নাই।
কুম্ভীর ধরিতে সাধ,
কচ্ছপের ভয়ে চীৎকার করিলে
সার হবে অপবাদ।
সাগর লঙ্ঘিবে যে,
খাল ডিঙ্গাইতে আকাশ পাতাল
কভু না ভাবিবে সে।
সুখের সাগর শ্যাম,
সুখময় তার দরশ পরশ
সুধাময় তার নাম।
তাহাকে যদি লো পাই,
এ তিন ভুবনে এমন কি ধন
আছে, যাহা ফিরে চাই।
সর্ব্বদা উৎসাহে রহ,
এ ভব সংসার অনিত্য গণি
শ্যামপদে মন দেহ।
শুন সে পিরীতি ধারা,
চতুর বলিবি, চাতুরি খেলিবি
চলিবি চতুরা পারা।
মাধব সেবায় বাদী এ সংসার
অসুরের ভাবে ভরা।
এ সংসার রীতি, মাধব পিরীতি,
অঙ্কুরে বিনাশ করা॥
মাধব পিরীতি যে করে সে হয়
সংসারের কাছে হেয়।

---

* পরিব্রাজক ভুলুয়া বাবার রচিত শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী হইতে উদ্ধৃত।

ইন্দ্রিয়ের দাস বিষয়ের কৃমি
তাহাদের আরাধের ॥
এমন সংসার যাহা,
ধীর মুনিঋষি তাহারাও কহে
পরম বৈরী তাহা।
এ হেন বৈরীকে অন্তরে ঘৃণিয়া।
বাহিরে দেখাবি হাসি।
বৈরীকে ডাকিয়া আদর করিবি
বঁধুরে কর্কশ ভাষি ॥
বঁধুর পিরীতি গোপনে রাখিবি
বৈরীকে ভাবাবি মনে।
তাহার মতন তোর প্রিয়তম
আর নাই ত্রিভুবনে ॥
বৈরীকে আনিয়া বশে,
সুযোগ বুঝিয়া বঁধুকে লইয়া
মজিবি পিরীতি রসে।
(শেষে) বৈরীকে ধরিয়া খাটিয়া পড়িবি
বঁধুকে লইয়া শুবি ॥
বৈরীর বাকস ভাঙ্গিয়া আনিয়া
বঁধুর সেবায় দিবি ॥
বৈরীকে নিয়োগী দিঘীবানাওবি
বঁধুকে করাবি স্নান।
বৈরীর মাথায় দুধ বহাইয়া
বঁধুরে করাবি পান ॥
বৈরীর ভবনে রাঁধি কাল বোল
বঁধুকে ভোজন দিবি।
বৈরীকে ধরিয়া বঁধুর চরণ
আরাধনা করাইবি ॥

নির্ম্মম এই সংসার বৈরী *
ইহাকে ধরিয়া যে।
মাধব সেবায় নিয়োজিতে পারে
চতুর প্রেমিক সে॥
এ সব যদি না পার।
শ্যামের করুণা লাভের বাসনা
এখন হইতে ছাড়॥
আতর † না নিয়া খেয়াঘাটে যায়
কড়ি না জুটিয়া হাটে।
কৌশল না জানি পিরীতি যে করে
তাহার মরণ মাঠে॥
চতুরা বিশাখা ভাষে।
"ভুলুয়া" ভনয়ে যে বুঝে সে "জয়
রাধেশ্যাম" বলি হাসে॥

শ্রীভুলুয়া

হোলির গালি।

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিত)

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার টোলঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছেন, পাড়ার প্রাচীন বিশ্বাস মহাশয় হঠাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত। কথা নাই, বার্ত্তা নাই, আসিয়াই তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যা নয় তাই বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তো শুনিয়াই অবাক্। বিস্ময়ে বিস্ময়ে বিশ্বাস মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বাপু, আমি এমন কি অপকর্ম্ম করিয়াছি যে, তাহার জন্য তুমি আমাকে যা মুখে আসিতেছে তাই বলিয়া গালি দিতেছ?

---

* সংসার বৈরী—ভগবৎ সেবা ভুলাইয়া দেয় বলিয়া সংসারকে বৈরী বলা হয়। সুতরাং সংসারে যাহা সুখের উপকরণ তাহা কৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করিবে। সংসারেই থাকিবে সংসারী বলিয়াই পরিচিত হইবে কিন্তু অন্তরে ঈশ্বর পরায়ণ বৈরাগী হইবে।

† আতর—খেয়ার পয়সা।

উত্তরে বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—রাগ ক'রো না ঠাকুর রাগ ক'রো না; আমার অবস্থাটা আগে শোন, তারপর যাহা বলিবার হয় বলিও—দণ্ড করিবার হয় দণ্ড করিও।

এ কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি ব'লিলেন—আচ্ছা বাপু তাই হউক; তুমি বলিয়া যাও আমি শুনিতেছি।

বিশ্বাস মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন—দেখ ঠাকুর, আজ সকাল থেকেই আমার মেজাজটা কেমন খুসাখুসি রকমের হইয়া উঠে, কারণ জানি না, সকলকে গালাগালি করিবার জন্য জিহ্বা যেন নাচিয়া উঠে। কত চেষ্টা করি, কিন্তু ঠোঁটের সুড়সুড়ানি আর ভাঙ্গে না। মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলাম, গালাগালি দিই এখন কাহাকে? ভাবিলাম গিন্নীকে ডাকিয়াই না হয় দুইটা কটু কথা শুনাই কিন্তু সাহসে কুলাইল না। ভাবিলাম,—হয়তো তাহা হইলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারই বন্ধ হইবে। ছেলে পুলেরা সব আজকালের ধরণের; কি জানি কি করিয়া বসে, ভাবিয়া তাহাদিগকে গালি দিতেও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। চাকর বাকরের বাজার যেরূপ আক্রা, তাহাতে তাহাদিগকে ঘাঁটাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। মার খাইবার ভয়ে পাড়ার ছোঁড়াদের উপরও গালি চালাইতে পারা গেল না। এ অবস্থায় করা যায় কি? জানি তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, ক্ষমা করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট, তাই ঠাকুর তোমাকে গালি দিয়া বাতিক নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইলাম।

বিশ্বাস মহাশয় ব্রাহ্মণ ঠাকুরের মুখে কোপের কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া— বরং ধীরে ধীরে হাসির রাশি মুখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখ ঠাকুর, আমরা কাষ্ঠকাঠ—কায়স্থ, আমরা আপনাদের 'বাপন্ত-পিতন্ত' পুরুষ পরম্পরায় হজম করিয়া আসিতেছি, আর তুমি ঠাকুর আমার একদিনের গোটাকয়েক গালাগালি হজম করিতে পারিবে না? তোমাদের অগ্নির জোর কি এতই কমিয়া গিয়াছে?

এইবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বিশ্বাস মহাশয়কে কোল দিয়া বিদায় দিলেন।

ভাইরে, এই হোলির হুজুগে আমও এক বিষম সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছি। হোলিকা রাক্ষসীর বধের ব্যাপার লইয়া এই সময়ে গালাগালি চালাইবার চালোয়া ব্যবস্থা শাস্ত্রে ত আছেই, তা ছাড়া কি জানি কেন, এই সময়টায় দুইটা বেফুট কথা ছুটাইবার জন্য মুখও যেন চুলবুল্ করিয়া উঠে। আমারও [illegible]

তাহাই হইয়া উঠিয়াছে। অথচ চারিদিকে 'ডিফামেশন্' 'সিডিসন্' প্রভৃতি সন্ত্রাসক শব্দের যেরূপ প্রভাব, তাহাতে গালাগালি দিবার স্থলই মিলা ভার। এখন আমি গালাগালি দিই কাহাকে? ঘরে চালাইতে গেলেও ত বিশ্বাস মহাশয়ের মতই আশঙ্কা আছে? তাই আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম—নাঃ, মানুষ-টানুষ কাহাকেও গালি দিয়া কাজ নাই। পশু টশুকেও কাজ নাই; কি জানি দারবীন সাহেবের থিয়োরি ধরিয়া তারাও হয়তো ভবিষ্যতে মামলা চালাইতে পারে? গাছ পাথরকেও কাজ নাই; প্রোফেসার জগদীশ বাবুর কল্যাণে তাহাদেরও তো সজীবতার পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; তখন তাহারাও কি আমার গালিগুলা বেমালুম হজম করিয়া ফেলিবে? থাক্, এ রাজ্যের কাহাকেও গালি দিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিবার দরকার নাই। তবে গালি দেওয়া যায় কাহাকে? দাও গালি—এই প্রকৃতির রাজ্যের অতীত আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবনধামের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে।

এই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই বা গালি দিতে যাই কোন সাহসে,—তাহাও বলি। প্রথম বা প্রধান সাহস,—অর্জ্জুনের কাছে তিনি আপন মুখেই বলিয়াছেন,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"

সর্ব্বজীবে সম আমি হে কুন্তীনন্দন!

নাহি মম দ্বেষপাত্র নাহি প্রিয়জন॥

এ শ্রেণীর লোককে গালি দিলে ভয়ের কারণ কোথায়? তারপর, তিনি আবার ফায়ারপ্রুফ্, ওয়াটারপ্রুফের মত গালি-প্রুফ্ও বটেন। তবে, মথুরা বা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ষোল আনা গালিপ্রুফ্ কিনা সন্দেহ। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ছেলেবেলা হইতেই গোয়ালিনীর গালি খাইবার জন্য অলি-গলি ঘুরিয়া বেড়ান। আহা, না জানি সে গালি কতই না মিষ্ট।

শুধুই কি গালি, একবার এই হোলির সময় কি চলাচলিই না হইল, —গালির উপর গালি, শেষে চক্ষে ধূলি পর্য্যন্ত হইয়া গেল! বলিহারি ব্রজের গোপনারী। যাঁর চাতুরী চতুরাননেরও অগোচর, তাঁর চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ কি তাঁহাদের অল্প বাহাদুরী!

হইয়াছিল কি জান ভাই, এই হোলির সময়টায় বাসন্তী প্রকৃতির মোহন মূর্ত্তি সকল জায়গায় যেমন ফুটিয়া উঠে, শ্রীবৃন্দাবনে তার চেয়ে অনেক কোটি গুণে ফুটিয়া উঠে। একেই তো তথায় চিরবসন্ত। তার উপর আবার

মধুময় বসন্ত কাল। তখন সৌন্দর্য্য যেন আর ধরায় ধরে না। গাছে গাছে কচি কচি পাতা, সেই পাতার আগায় মধু ঢল-ঢল ফুল্ল ফুল্ল ফুল, ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন, তার উপর কলকণ্ঠ কোকিলের—আরও কত কি পাখীর কুজন; দেখিলে শুনিলে সুজনের মনও স্থির রাখা দায় হইয়া উঠে। মধুমাখা মাতানো বাতাস গায়ে লাগিলে তো আপনাকে আপনি হারাইয়াই ফেলিতে হয়! সে যে তখন কোন রাজ্যে যাইয়া পড়িতে হয় কে জানে? ভাগ্য-বশে যে ঐরূপ যাইয়া পড়ে, সে-ও জানিতে পারে কিনা বলা যায় না।

ভাই রে, প্রাণ যেন তখন কেমন কেমন করিতে থাকে। এই কেমন কেমন প্রাণ করাইবার মালিক হইতেছেন,—"শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।" আমাদের মনও কেমন কেমন করাইয়া দিবার ক্ষমতাও ইঁহার যথেষ্ট। আজ কিন্তু স্থানের গুণে—সময়ের গুণে ইনিও আপন হারা। আজ কি জানি কেন ইঁহার প্রাণও কেমন কেমন করিয়া উঠিল। সম-বয়স সখার সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাখী ডাকে, তিনি যেন কাহার স্বর শুনিতে পান। ফুলের গন্ধে কাহার যেন অঙ্গের গন্ধ অনুভব করেন। রাঙা রাঙা ফুলের পাপড়ীগুলিতে কাহার যেন কমনীয় ঠোঁট দু'খানি তাঁহার সম্মুখে চিত্রিত হইয়া উঠে। শীতল সুমিষ্ট বাতাসে কাহার যেন স্পর্শসুখ তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলে।

আহা, তাঁহার ফুলের বেশ, মাথায় মোহন ফুলের চুড়া, যুগল কর্ণে ফুলের কুণ্ডল, গলায় ফুলের শোভন মালা, হস্তে ফুলের অঙ্গদ বলয়, চরণেও ফুলে ঢাকা বাজন্ত ঘুঙ্গুর। মুরলীও আজ ফুলের সাজে সুন্দর সাজিয়াছে। মরি মরি, কি মধুর শোভা রে।

এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি কুঞ্জকাননে আসিয়া উপস্থিত। অন্য-মনস্ক ভাব। সখাসকল তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গান ঠাট্টা তামাসা—পশু পক্ষীর অনুকরণ শব্দ, কত কি করিতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহারা তাঁহাকে একাকী রাখিয়া এদিকে ওদিকে গা ঢাকা দিয়া রহিলেন। এমন সময় হইল কি? যাঁহার জন্য তাঁহার প্রাণ কেমন কেমন করা, সেই তিনি—শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা শ্রীমতী রাধিকা সদলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদেরও সকলের ফুলের বেশ—ফুলের অলঙ্কার। দলে দলে বনদেবীই যেন আজ ঋতুরাজ বসন্তকে দেখিতে আসিয়াছেন। আহা আহা, কিবা সুন্দর ভাই, কিবা সুন্দর।

শ্রীমতীর দলের আজ কেবল ফুলের বেশ নয়; কাহার প্রেরণায় বলা যায় না, আজ তাঁহারা আবীর কুঙ্কুম পিচকারী এবং গন্ধবারি লইয়া যেন রণসাজে আসিয়া চারিদিক্ হইতে শ্রীহরিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। প্রথমেই তাঁহারা গান ধরিলেন,—

"আজ হোলি খেল্‌বো শ্যাম তোমার সনে।
একলা পেয়েছি তোমায় কুঞ্জবনে ॥"

বলাই বাহুল্য, উল্লাসময় মহা হৈ হৈ হো হো রবের মধ্যে হোলি খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। তাঁহারা চারিদিক হইতে অজস্র গালি-বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ফাগবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা শ্যামচাঁদকে শাসাইয়া বলিলেন,—

"শুন ওহে বনমালী ভাঙ্‌বো তোমার চতুরালী ॥"

ফলে, হইলও তা-ই। একা শ্রীহরি তাঁহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না, আবীরে কুঙ্কুমে ও পীচকারির জলে তিনি লালে লাল হইয়া পড়িলেন; সেই কালো কানাই বলিয়া এখন তাঁহাকে চেনা ভার।

এমন সময় শ্রীমতী রাধিকা করিলেন কি?—তিনি শ্যামবঁধুয়ার নয়ন লক্ষ্য করিয়া এক মুষ্টি ফাগুচূর্ণ ছুড়িয়া মারিলেন। ভক্তের ইচ্ছা ভগবান্‌কে পূর্ণ করিতেই হয়। কাজে কাজেই তিনি যেন অন্ধের মত হইয়া পড়িলেন। সখীবৃন্দসহ শ্রীমতীর আনন্দের আর সীমা নাই। চট্‌পট্‌ হাততালী এবং হো হো হাসির স্বরে সেই স্থানটা মুখরিত হইয়া পড়িল। পিক্ শুক শারিকা প্রভৃতি পাখীগুলি সেই স্বরে যোগদান করিয়া আরও যেন ঘোরালো করিয়া তুলিল। ময়ুরগুলাও পুচ্ছ বিস্তারপূর্ব্বক নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে আনন্দের আর সীমা পারসীমা নাই।

শ্যামসুন্দর তখন আর করেন কি?—দুই হস্ত বিস্তার করিয়া, যাহাকে পান তাহাকেই ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীযুগল মিলন অবলোকন করাই তো সখীদের সকলেরই সাধ; তাঁহারা নানা কৌশলে আপনাদের বাঁচাইয়া শ্রীমতী রাধারাণীকেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দিকে আগু বাড়াইয়া দিলেন। শ্যাম নাগর অমনি দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সাধও মিটিল, সখীদের সাধও মিটিয়া গেল।

থা'ক থা'ক্, এ দৃশ্য এমনই থা'ক। এইবার আমার কথাটাই বলি। আমার কথাটা হইতেছে—আমি এই হোলির মরসুমে এই গোয়ালিনীর গালি-প্রিয় কৃষ্ণচন্দ্রকে দুইটা গালি দিতে চাই। বলি, ও ঠাকুর, শুনিতে বা

সহিতে রাজি আছ কি? আমি কিন্তু কংস-শিশুপালাদির মত তোমাকে গালি দিতে চাহি না, কেন না, সে গালির হয়তো তুমি হিসাব রাখিবে, না হয়তো সরস্বতী সে গালিকে গালির শ্রেণীতে যাইতেই দিবেন না—স্তুতিতেই পরিণত করিয়া ফেলিবেন। শিশুপাল তোমাকে গালি দিল "অজ্ঞ" বলিয়া। সরস্বতী তাহার ব্যাখ্যা করিলেন,—জ্ঞানাতীতি জ্ঞঃ, নাস্তি জ্ঞঃ যস্মাৎ স অজ্ঞঃ। ফলে অজ্ঞ শব্দের সরস্বতীপক্ষে ব্যাখ্যা হইল—যাঁহার চেয়ে পণ্ডিত নাই। শিশুপাল তোমায় বলিল,—বাচাল। সরস্বতী ব্যাখ্যা করিলেন,—চারি-চারিখানা বেদের যিনি বক্তা, তিনি তো 'বাচাল' বটেনই। ও ঠাকুর, এ রকম বাগ্দেবীর ব্যাখ্যায় যাহার অর্থ উল্‌টাইয়া যায়, আমি তোমাকে সে রকম গালি দিতে চাহি না। বৃন্দাবনের গোয়ালা গোয়ালিনীদের গালি—যে গালি তুমি বেদস্তুতি হইতেও মনোহর মনে কর, যাহার অর্থ পাল্‌টাইবার জন্য বাগীশ্বরীকে আর প্রয়াস পাইতে হয় না, সেই রকম গালি দিতে চাই। এতো তোমারই শ্রীমুখের কথা,—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে তাহে মোর মন॥"

এখন বল ঠাকুর, এ রকম গালি খাইতে তুমি প্রস্তুত আছ কি? জানি ঠাকুর, জানি, কোথায় বিশুদ্ধ প্রেমের খনি ব্রজের গোয়ালিনী, আর কামকিঙ্কর শিরোমণি কোথায় আমি?—তাঁহাদের মত তোমাকে গালি দিবার আমার যোগ্যতা কোথায়?

যোগ্যতা নাই বলিয়াই তো তোমার তোষামোদ করিতেছি ঠাকুর, আজ এই হোলির বাজারে যে গালি শুনিলে তুমি সন্তোষ লাভ কর, আমাকে সেই গালির বুলি শিখাইয়া দাও। না হয় তো আমাদের বাঁধা বাঁধা গদ আছে—শঠ, ধৃষ্ট, কপট, লম্পট এই শ্রেণীর ভুয়া গালি শুনিয়াই সন্তোষ লাভ কর। আরে রে নির্দ্দয়! দয়াময় তোমায় কে বলে? (বঙ্গবাসী)

শক্তি সংগঠন *

গত পৌষ সংখ্যায় আমার "ভক্তি" নামক একটি প্রবন্ধ লইয়া বৈষ্ণব সমাজের স্থানে স্থানে বেশ একটু ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং ঝড়ের কোন কারণও ঐ প্রবন্ধে আমি উপস্থিত করি নাই। ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদে কেহ কেহ বলিয়াছেন 'আমি নাকি মূল লীলাকে বাদ দিয়াছি,' মূল লীলা যে আমি বাদ দিতে পারি না সে কৈফিয়ৎ ফাল্গুনের সংখ্যায় আমি দিয়াছি; তাহাতেই যাঁহারা আমার লেখা কৃপা করিয়া পাঠ করেন তাঁহাদের নিকট বোধহয় আমি নির্দ্দোষি হইতে পারিয়াছি। প্রতিবাদ কারীরা আমার প্রবন্ধগুলি লীলা কীর্ত্তন মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। আমার প্রবন্ধ সামাজিক প্রবন্ধ। লীলা—লীলাই আছে, ভাগবত—ভাগবতই আছে, বৃন্দাবন—বৃন্দাবনই আছে। তার মধ্যে নড় চড় করিবার জন্য আমি লেখনী নিই নাই। সেইসব লীলার নামে নানাস্থলে যে সমস্ত ব্যভিচার দ্বারা আমরা বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করিতেছি সেই পতিত সমাজের সংগঠন কল্পেই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমূহ লেখা। এবং একথা সম্ভবতঃ কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, সমাজের এই সব

---

* বিগত পৌষ মাসের ভক্তিতে "ভক্তি" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গেই তাহা লইয়া কোন কোন ভক্তির পাঠক একটু সমালোচনা করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় নিজ বক্তব্য বলিতে গিয়া কোন কোন স্থলে এমনভাবের কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে কাহারও কাহারও মনে লীলা ও ধাম রূপক বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং সেইভাবেই তাহারা উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মূলপ্রবন্ধ লেখক সংক্ষেপে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাও যথাকালে ফাল্গুন মাসের ভক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিয়া প্রতিবাদকারী জানাইয়াছেন যে, "এবিষয় তাঁহার আর কোন কিছু বলিবার নাই।" বর্ত্তমান প্রবন্ধটী পূর্ব্বের লিখিত প্রবন্ধেরই বিস্তৃত উত্তর বলাযায়। লেখক মহাশয়ের সহিত আমাদেরও বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধটী এইবারেই শেষ হইল না, ইহারও পরে কিছু বলিবার রহিল সেটী আগামীবারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে। পাঠকগণ প্রবন্ধটী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ সমালোচনা না করিলেই ভাল হয়, কেননা—যে কোন বিষয়ই হউক বক্তা বা লেখক তাহার শেষ কি ভাবে করেন তাহা দেখা দরকার। আশাকরি পাঠকগণ পরের সংখ্যায় শেষটী পড়িয়া তবে তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবেন। (ভঃ সঃ)

অমনুষ্যতাকে দূর করা ধর্ম্মপ্রচারকগণের সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য।

সমাজ এবং ধর্ম্ম খুব কাছাকাছি নিকটসম্বন্ধ। এবং একটিকে ছাড়া অন্যকে উন্নতকরা যায় না। ধর্ম্ম না হইলে যেমন সমাজ পঙ্গু হইয়া যায়—তেমনি সমাজকে উন্নত করিতে না পারিলেও ধর্ম্মের কোন মূল ভিত্তি থাকে না। তাই আমার বিশ্বাস সমাজকে বাঁধন হারা এবং ভিত্তি শূন্য করিয়া ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে বৈষ্ণবের সে প্রতিষ্ঠান সত্যকারের অভাবে একেবারে বিপন্নহইয়া যাইবে। তাই আমি 'কৃষ্ণ' নামের পূর্ব্বে 'ক খ' লিখিতে বলিতেছি। আমাদের এখন সম্মুখে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে—হিন্দু সমাজের অধিক সংখ্যক লোকই বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত। ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত হস্ত এই ধর্ম্মেরদিকে প্রসারণ করিয়াছে—তাহাদের সেই হস্তধারণ পূর্ব্বক যদি আমরা প্রত্যেক সোপানের পর সোপান ঠিক ভাবে উঠাইয়া না দিতে পারি তবে তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। তাহাদের শক্তি এবং আধার না বুঝিয়া যে আমরা রসশাস্ত্র লইয়া প্রেম বিতরণ করিতে চাই সে প্রেমের পরিণতির কথা মনে হইলেও আমি শিহরিয়া উঠি। এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করার নামই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের সেই কাম ক্রোধ শূন্য বিরাট মিলনক্ষেত্র যতক্ষণ না আমরা গঠিত করিতে পারিতেছি—ততক্ষণ আমরা কিছুতেই বৈষ্ণবের কণ্টকময় পথ পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইব না।—তাই মূল লীলাকে সম্মুখে বিগ্রহের মত প্রতিষ্ঠা করতঃ আমাদের চলিতে হইবে, এবং তখন নানাদেশীয় ভাষায় নানাজাতীয় ভাবের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া লীলার প্রকৃত সমুদ্রের দিকে তাহাদিগের মন আকৃষ্ট করিতে হইবে। সেজন্য কখন কখন লীলার একটু রূপ দিতে হইবে, একটু বাড়াইতে হইবে একটু গোপন রাখিতে হইবে, একটু যোগও দিতে হইবে। তাহা না করিয়া লীলাকে একটু এদিক ওদিক করার গোঁড়ামীর জন্য যদি "শ্রীমদ্-ভাগবৎ গ্রন্থ" একজন মূর্খের দিকে একজন সাধন বিহীন লোকের দিকে ছুড়িয়া দিই তাহা হইলে বানরের গলায় মুক্তার মালাই পরান হইবে—বানরের কোন শোভাবর্দ্ধনই হইবেনা। মূল লীলা চিরকালই সত্য—কিন্তু যারা চিরকাল মিথ্যার আশ্রয়ে বাস করে—তাহাদের সত্যপথে আনিতে অনেক সময় একটু মিথ্যা প্রলোভনেরও প্রয়োজন হয়। "রোগীকে ঔষধ দিয়াই ডাক্তার বলে এক দাগেই আপনার রোগ উপশম হইবে।"

"মানুষ" মরিতেছে, তবু চিকিৎসক বলে কোন ভয় নাই ভাল হইবেন।"

এই যে মিথ্যা কথা চিকিৎসক বলিলেন ধর্ম্মজগতেও এরকম মিথ্যা——যে মিথ্যা দ্বারা সত্যের আলো আসে—সে মিথ্যা ব্যবহার করা খুব অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্বাগ্রে ভাগবত বন্ধ রাখিয়া জাতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে,—কেননা জাতি ধর্ম্মের সন্তান ধর্ম্মের প্রাণ।

বৈষ্ণবধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পরম ভক্তবৃন্দ, ভাগবতই যাঁহাদের প্রাণারাম মহাসঙ্গীত, তাঁহাদের পদে কোটী কোটী নমস্কার পূর্ব্বক নিম্নশ্রেণীর এবং পরদাররত উচ্চশ্রেণীকে (?) পথনির্দ্দেশ কল্পে প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। কোথাও যদি সেই সব ধর্ম্মপ্রাণ পরম বৈষ্ণবের প্রাণে কোন আঘাত দিই তাঁহারা ক্ষমা করিবেন এবং আমার এই সৎ উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাহায্য করিবেন।

ধর্ম্মকে আপন হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত কল্পে যদি কোন স্থানে কোন অনৈক্য হয় তাহাতে কি আসে যায়? মূল লীলা সমূহ চিরকালই সত্য, তাকে বুঝাইতে হইলে লীলার সূত্রের একটু বাদ হইলে দোষ মনে করি না। সমাজ প্রকৃত মূল লীলা বুঝিতে শিখিলে আজ এ অধঃপতন হইত না।

চিকিৎসক তিক্ত ঔষধ দেয়, কিন্তু তাহার মূল উদ্দেশ্য জীবন দান বা রোগ দূর করা। আমার মনে হয় ধর্ম্মজগতেও একটা পাঠ্য ও শ্রেণী নির্দ্দেশ আবশ্যক। ধর্ম্মজগতেও অ আ শিখার মত একটা প্রথম পাঠ আছে। সে সব দিকে আমরা মোটে কোন লক্ষ্য না করিয়া শাস্ত্র ও লীলা একেবারে হাতে তুলিয়া দিয়া মানুষকে মূর্খ করিতেছি।—তাহার ফলে কামাশক্ত, মিথ্যাবাদী, বাহ্যারম্বরেপূর্ণ বক-ধার্ম্মিকের সৃষ্টি হইয়া অসংযমী হইতেছি। এবং এই সংযমহারা হওয়ার জন্য পরম বৈষ্ণবধর্ম্মের সার ও প্রধান সাধনা অহিংসা ভুলিয়া হিংসুক হইতেছি। ফোঁটা তিলক বেশী করিয়া দিয়া দশটা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিতেছি। লোকে ধার্ম্মিক মনে করিতেছে। এক শ্রেণীর সংসারী বৈষ্ণবগণের মধ্যে এ প্রকারের লোকের অভাব নাই। বৈষ্ণবের প্রাণ এবং মর্ম্মবাণী ভাগবত প্রভৃতি চিরদিন থাকিবে ও আছে—একবর্ণ কেহ কোনদিন উঠাইতে পারিবে না। এখন দেখিতে হইবে যেসব মহাপ্রভুদের পরিশ্রমের ফলে শাস্ত্রগ্রন্থের উৎপত্তি,—তাঁহারা তাহা নিজের জন্য রচনা করেন নাই—দেশের জন্য—দশের জন্য করিয়াছেন। তাহাই যদি হয় তবে বৈষ্ণব প্রচারকগণের প্রথম

কর্ত্তব্য ঐসব শাস্ত্রের অধিকারী করিবার জন্য সহজ পথে মানুষকে আকৃষ্ট করা। তাহা না করিলে যাহা হইয়াছে তাহাই হইবে। প্রেমের নামে কাম বাজারে বিকাইবে;

বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত কাহাকেও বাদ দিয়া ধর্ম্ম সঙ্ঘ সূচনা করা সম্ভব নহে,—তাহা না করিয়া তাহাদিগকে দেশ কাল পাত্র অনুসারে শিক্ষিত করিতে হইবে। হিংসা ও কামপ্রবৃত্তি—(ধর্ম্মের নামে যাহার উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছি) তাহা একেবারে ডুবাইয়া দিতে হইবে। সহজে না হইলে আঘাতে আঘাতে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

বৈষ্ণবের কতকগুলি মাসিকপত্র আছে উহা এক এক সম্প্রদায় ভুক্ত, বৈষ্ণবশক্তি হিন্দু শক্তি এই প্রকার ক্রম বিভাগ থাকার জন্য তাহার শক্তির কোন মূল্য জগতে নাই। কাজেই পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের একটু অপমান হইলে সেই ধর্ম্মের সমস্ত জাতিকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলে—হিন্দুর তাহা ফেলেনা, নিজেরা ধর্ম্মটাকে একটা ভাষা আবরণে রাখিয়াছি বলিয়াই হিন্দুধর্ম্মের অপমান হিন্দু অবলীলাক্রমে হজম করিয়া আসিতেছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। সেই জন্য সমস্ত হিন্দু শক্তি লইয়া একটা হিন্দু জনশক্তির প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তাহাদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুইটা ভাগ থাকিবে মাত্র। কিন্তু মূলধর্ম্মের দিকে ইহার কোনপ্রকার পার্থক্য থাকিবেনা। এই বৈষ্ণব-সঙ্ঘে কয়েকজন বৈষ্ণবগুণাশ্রিত কর্ত্তা থাকিবেন। তাঁহারা সমস্ত সমাজের শাসন ভার লইবেন। এবং ধর্ম্মশিক্ষা কতকগুলী আইন থাকিবে, (অবশ্য বর্ত্তমান দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে) কতকগুলী গুরু নির্দ্দেশ থাকিবে,—এই নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহারা বৈষ্ণব সমাজ এক করিয়া শাসন করিবেন। সমস্ত চিন্তায় ও কাজে অহিংসা থাকিলে এ কার্য্য খুব কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের ভাল মন্দ শুভাশুভের দায় ঐ সঙ্ঘগ্রহণ করিবেন। না হইলে যাহারা এসব দায় গ্রহণের উপযোগী নহে তাহাদের হাত হইতে সে ভার কাড়িয়া আনা উচিত। পাড়াগায়ে নীচ জাতীয় বৈষ্ণব সমাজের নীচ জাতীয় গুরুনামধারী বদমায়েসেরা কি করেন তাহা কেহ একবার দেখিবেন কি?—পরের ঘরের স্ত্রীকে লইয়া তাহারা রাসলীলা জলকেলীর নামে—এমন সব পাপ করেন যাহা লইয়া আমরা যদি আর কোন সমালোচনা না করি—তবে সত্য সত্যই—

"হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ না রহিবে।"

এসব দৃশ্য দেখিয়া আর সহ্য হয়না, মনে হয় হা ভগবান। হে কামের দেবতা! হে কামজয়ী ঠাকুর! তোমার মুরতি কি কলুষ ভাবেই এরা গ্রহণ করিয়াছে। এদের তুমি ক্ষমা কর—প্রভু ক্ষমা কর।

এই প্রকারের গুরুর কৃপায় সাধারণ মানুষ মনে করে কৃষ্ণ ও রাধা দুইজন বদমায়েসী করিতেন কিন্তু তাঁহারা দেবতা ছিলেন তাই দোষ নাই —অতএব তাহার নাম করিয়া আমরাও যত ইচ্ছা পাপ করিতে পারি। শেষে নামও উঠিয়া গিয়াছে এখন কেবল পাপ করিতেছি।

যে সঙ্ঘের কথা আমি বলিতেছিলাম ঐ সঙ্ঘ সমাজের মধ্যে বাছা বাছা কর্ম্মী নিযুক্ত করিয়া প্রচারকার্য্যে পাঠাইবেন, প্রচারকগণ গ্রামে কাজ করিবেন—পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সমাজকে একটা নব শক্তিতে এক করিতে চেষ্টা করিবেন। সমাজের নানাস্থানে প্রকৃত ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া এক নবভাবের সৃষ্টি করিবেন। (আগামীবারে সমাপ্য) *

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু

---

* আমার প্রবন্ধ শেষ হইলে এ সম্বন্ধে অন্যান্য ভক্তগণের মত চাই। পূর্ব্বে কৃপা পূর্ব্বক কেহ সমালোচনা করিবেন না।—(লেখক)

দোল-দুর্গোৎসব।

দোলের দিন দোল গোবিন্দকে দেখিবার জন্য দরদালানে দাঁড়িয়ে দেবতার দিকে যেমন দৃষ্টিপাত ক'রেছি, অমনি কি জানি কেন হঠাৎ দুরন্ত ছেলে যেমন দামাল মেরে দৌড়ে দাদামশায়ের কাছে দৌরাত্ম্য করে, অথবা দমকা বাতাস যেমন দোর ঠেলে ঘরে ঢুকে দীপটাকে নিবিয়ে দেয়, সেই রকম 'দোল'কে দূরে ফেলে, দেহটাকে দুলিয়ে দিয়ে দুর্গোৎসবটা দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠল। ভাবলাম, মজা মন্দ নয়। দেখতে এলাম দোল; দুর্গোৎসবের দরবার ব'সে গেল। চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল। তখন দু'হাত যোড় ক'রে 'দোহাই দামোদরজীউ দেখো এই দলাদলিপ্রিয় দেবদ্বেষী দুষ্ট দুরাচারের দোষ নিওনা' বলে দুর্গোৎসবের দিকেই চল দিলাম। আবার দেবালয় স্থাপন,

দেবতা প্রতিষ্ঠা দীঘি দেওয়া দীন-দরিদ্রে দান এ সব ত ভাগ্যবানের ভাগ্যেই ঘটে। আমার সে দশা নয়, আমি দ্রবীণহীন দুঃখী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াই। দুর্গোৎসব ত দূরের কথা, চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত নাই। কিসের দরুণ যে দোলের দিনে দেবী দশভুজা দলবল সহ দেখা দিলেন, তা বুঝে ওঠা দুষ্কর, তবে তিনি দয়াময়ী, দীন-হীনে তাঁর বড়ই দয়া। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মত সেইটাই ঠিক করে নিয়ে সন্দেহ-দোলায় না দুলে 'দোল'টাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে না দিয়ে 'দুর্গোৎসবের' সঙ্গে যোগ করে বার বার বলতে লাগলাম "দোল-দুর্গোৎসব"। ছল ছল চোখে যোড়করে রোমাঞ্চিত কলেবরে ভক্তি-ভরে গদগদ চিত্তে বলতে লাগলাম "দোল-দুর্গোৎসব।" আবার শুনতে পাই প্রায় সকলেই কোন জাঁক জমকের ধুমধামের ক্রিয়াকাণ্ড হ'লেই ব'লে থাকেন এ যেন "দোল-দুর্গোৎসব।" "দোল-দুর্গোৎসব" অথবা দুর্গোৎসব দোল দুটী যেন আপন সহোদর অভেদ আত্মা। আহা 'দোল-দুর্গোৎসব' কেমন মধুর নাম। বড়ই চিত্তাকর্ষক মন-মজান প্রাণ-মাতান ভাবপ্রবণ রসনার রসবর্দ্ধক মধুর শব্দ। 'দোল-দুর্গোৎসব' সম্বন্ধে যতই আলোচনা কত্তে গেলাম প্রাণের ভিতর যেন আনন্দলহরী ভক্তির জোয়ার বইতে লাগল। আমার আমিত্ব ঘুচে গেল। আমিও যেন দোল-দুর্গোৎসবের ঠাকুর ঠাকরুণদের সঙ্গে মিশে যাবার যোগাড় হলাম।

যাক্ সে সকল কথা। যখন দোল-দুর্গোৎসব নামে নামে মিল আছে, তখন নিশ্চয়ই সকল বিষয়ে মিল আছে। তবে এক কথা,—'দুর্গোৎসব আগে' আর দোল পরে। কিন্তু সচরাচর সাধারণে 'দোল দুর্গোৎসব' ব'লে থাকেন। ভেবে দেখলে তাতে দুর্গোৎসবের মাহাত্ম্য বাড়ে বই কমে না। 'রাধাকৃষ্ণ' 'সীতারাম' বল্লে কি শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্রের সম্ভ্রম নষ্ট হয়? সেইরূপ দোল-দুর্গোৎসব শব্দেও দোল পূর্ব্বে থাকায় দুর্গোৎসবেরই দ্যুতি দীপ্তিমান হ'য়ে উঠে। আর তাতে দোলেরও গৌরব নষ্ট না হ'য়ে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায়, এখন 'দোল দুর্গোৎসবে' মিল কতকটা তাই দেখ।

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে উত্তাপিত বর্ষার বারিবর্ষণে ও প্লাবন পীড়নে পীড়িত, পৃথিবীকে সৌন্দর্য্য মালায় সুশোভিত করিতে শরৎ যেমন সহাস্য বদনে সমুপস্থিত হয়, তেমনি শরতের শোভনীয় সুদৃশ্যসমূহ শত সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিবার জন্য ও শক্তি-সাধক শক্তি সম্প্রদায়ের সাধনা সুসিদ্ধ করিবার মানসে পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি মহিমময়ী মহামায়া মা ভগবতী দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীরূপে

অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণা হন। দুর্গাসুরবিঘাতিনী দেবীদুর্গার পূজাই দুর্গোৎসব, নামে অভিহিত হয়। আবার হেমন্তের হিমে সঙ্কুচিত, শীতে ব্যথিত, বসুমতীকে যথোচিতরূপে উৎসাহিত করিবার আশায় বসন্ত আগমন করিয়া শুষ্কশীর্ণ ধরিত্রীর নষ্টশ্রী পুনরুদ্ধারে যেমন যথেষ্ট সচেষ্ট হয়, আর বসন্তের সেই শুভ উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হইতেও তাহার সুষমারাশির শ্রীবৃদ্ধি করিতে এবং বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবমণ্ডলের অভীষ্ট সুসিদ্ধির বাসনায় পরমা বৈষ্ণবী মাতা মহেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে মহীমণ্ডল মধ্যে পদার্পণ করেন। আর তাহাই দোল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব শরতের, দোল বসন্তের পার্ব্বণ।* শরৎ ঋতুর মধ্য সময় যৌবনকাল, কাজেই অভয়া দশহস্তে দশ প্রহরণ ধারিণী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি আর বসন্ত ঋতুর অন্তকাল, কাজেই কালকান্ত্য কৃতান্ত-ভয়বারণ কালীয়-দমন প্রশান্ত গম্ভীর সজল জলদ বর্ণের বিমল বিভায় বসুধাকে বিভাসিত করিয়া দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। শরতে শারদোৎসবের সময় শশধরের শৈশবাবস্থা। আর হোলিতে হুড়াহুড়ি হেরিয়া হিমাংশু হরষিত হইয়া হাসিতে হাসিতে হৃষ্টতা হটাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া হলধরানুজ হৃষীকেশকে হৃষ্টতা দেখাইতে ষোল কলায় সমুদিত হয়। শরতে যখন শারদা রূপে মা আগমন করেন—তখন লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশাদি পরিবৃত হইয়া দর্শন দেন। দোলের সময় সেই প্রকার শ্রীরাধা, ললিতা বিশখা বৃন্দা প্রভৃতি সঙ্গিনীগণ সঙ্গে লইয়া, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে নব কিশোর নটবর বেশে উদয় হন। তখন মদনরিপুর মনোমোহিনী, আর এখন স্বয়ং মদন-মোহন। গঙ্গাজল জবা বিল্বদল দিয়ে অম্বিকার পদার্চ্চনা কত্তে হয়—আর সচন্দন তুলসীপত্র দিয়ে রাধাবল্লভের রাতুল চরণ পূজা কত্তে হয়; সে সময় শোক তাপ বিস্মরণ হইয়া দ্বেষ হিংসাকে দূরে ফেলিয়া শত্রু মিত্র সকলে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, আর দোলের দিনে আবির কুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়া ফাগ ক্রীড়ার আড়াআড়ি পড়িয়া যায়।

অতএব দেখা গেল 'দোল দুর্গোৎসব' পর্ব্বটা একই প্রকারের—একজনের পূজা। প্রভেদ আকার ও বর্ণগত মাত্র। কেন না শরতের শারদা শুভদায়িনী জননীদেবী আর দোলের গোবিন্দ যোগিজনদুর্ল্লভ গোপীবল্লভ পুরুষর্ষভরূপে বিরাজিত। প্রভেদ এইখানেই। নতুবা অন্য কোন বিষয়ে পার্থক্য পরি-লক্ষিত হয় না। তবে বসন্ত সমাগমে সকলেই নবীন বেশ ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতি পুরাতন বেশ পরিত্যাগ করিয়া নবীন শোভায় সুশোভিতা। তরুলতা

নবীন পল্লবে পল্লবিত। বন উপবন সর্ব্বত্রই নবীন সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট। সুতরাং যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়—সেই ইচ্ছাময়ী তারা এই নবীন ভাব বিকাশের বাহুল্যের কালে নবীন কলেবর ধারণ না করিবেন কেন? তাই মা বাসন্তী-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাবিধৌত বিমল বিভাবরীতে নবীনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেবীমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া—দিব্য দেবদেহ ধারণ করিয়াছেন। লীলাময়ীর লীলা-রহস্য ভেদ করে, এমন জ্ঞানী জগতে অতি বিরল। যার চোখ আছে সেই দেখ্‌তে পাচ্ছে যিনি শ্যামা—তিনি শ্যাম—তিনি শিব—তিনিই রাম। যিনি দশ মহাবিদ্যা, তিনি দশ অবতার। যিনি জনক—তিনিই জননী। যিনি শরতে শারদা—তিনিই দোলে গোপীনাথ। তিনি কখন অসি ধারণ ক'রে অসুর নাশ করেন—কখনো বা হাসিতে সুধারাশি ছড়া'য়ে বাঁশীর গানে ব্রজ-গোপীর মন উদাস করেন। আহা মা! কি মনোহর মূর্ত্তি-ই না ধারণ ক'রেছ। দেখে নয়ন পবিত্র হ'ল—জন্ম সার্থক হ'ল, ভবের ভাবনা ঘুচে গেল। ভাবে বিভোর হ'য়ে 'জয় জগদম্বা' 'হরিবোল' হরিবোল' ব'লে গড়াগড়ি দিচ্চি এমন সময় শুনি অদূরে খোল করতাল বাজাইয়া বৈষ্ণবগণ গাহিতেছেন,—

কে হে তুমি বিনোদ বাঁকা, মুকুটে ময়ুর পাখা,
বক্ষে ভৃগুপদ আঁকা, ভালেতে তিলক লেখা॥
কিবা মেদুর মুদির মুরতি মধুর মোহন মুরলী অধরে,
কুঞ্চিত কুন্তল কলাপ কলিত কণ্ঠে কোকিল কুহরে,
টাট্‌কা ফোটা বন ফুলে—গেঁথে মালা পরেছ গলে,
পীত বসন কটিমূলে—জলদে বিজলী যায় দেখা॥
বদন ছাঁদে মদন কাঁদে বিষাদে হ'য়ে কাতর,
যুগল ভুজে বলয় রাজে পদে বাজে নুপুর মনোহর,
অবলাপাপী ধরিতে ফাঁদ—পেতেছ চোখে কালাচাঁদ,
মানেনা সরমের বাঁধ, মরমে বিঁধে শর চোখা॥
চটকে চিত্ত কর চুরী—চতুর চোর চূড়ামণি,
চেনা না দিলে চিন্‌তে তোমায় কে পারে হে চিন্তামণি,
বিকাইলাম আজ অবধি,—পদে তোমার হে গুণনিধি,
পার ক'র ভব-জলধি দয়া ক'রে হে প্রাণ সখা॥

শুন্‌তে পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে আমিও সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিলাম। আর শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল উপাসক সম্প্রদায়কে সবিনয়ে বলতে

লাগলাম "ভেদজ্ঞান ভুলে—অভেদভাবে ভজনা কর, ভক্তবৎসল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেনই করিবেন।" তারপর ঠাকুরটিকে বল্লাম,—দেবতা! তুমি ত কোন দলভুক্ত নও—সকল জায়গাতে ও সর্ব্ব কর্ম্মেতেই তোমার সমান দখল। তুমি বৃন্দাবনে দুপুরের রোদে ধেনু লয়ে গোঠে দৌড়াদৌড়ি কর—দয়বেশ সাজ—দ্বার রক্ষা কর, আবার দ্বারকায় রাজা হও। শুনেছি তুমি দৈত্যদল দলন ক'রেছ—বলির দর্প চূর্ণ ক'রেছ—দ্রৌপদীর লজ্জা ঢেকেছ—গুরুকে দক্ষিণা দিয়েছ। তোমার কাছে যে যা দাবী করে তুমি তার সে সব দাবী পূরণ কর। আমারও ত দিন ফুরাচ্চে—চুল পাকছে—দাঁত পড়চে—দমে পড়ে হয়দম দুষ্টামি কচ্ছি—দেরি না ক'রে দুর্ম্মতিটা দুরস্ত করে দাও। দিশে লেগে দিক্ হারিয়ে ফেলেছি—দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। দিব্য দর্শন দাও-সময় থাক্‌তে দরখাস্ত দাখিল ক'রে রাখলাম। দলিল দস্তাবেদ দাখিলা দেখাতে না পাল্লেও আমি তোমার দাসানুদাস—এটা যেন মনে থাকে! আর পা দুটি ধ'রে বলি 'চিরদিন যেন এমনি দয়া-ই থাকে—এক্ষণে দণ্ডবৎ।'

শ্রীতিনকড়ি রায়।

প্রাচীন পদ।

(দোললীলা)

ফাগুখেলত গোরা গদাধরসঙ্গে। কুঙ্কুমমারত দুহুঁ দোঁহা অঙ্গে॥
মারেপিচকারি গুলগুলাল। ফাগুমে দুহুঁ তনু লালহি লাল॥
খেলে ব্রজে জনু কানুপেয়ারী। দুহুঁবদনে ঘন হেরি হেরি॥
চৌদিকে ভকত ফাগুযোগায়। কোহিনাচত কোহি আনন্দেগায়॥
কৃষ্ণদাসক চিতে রহল শেল। হেন সুখ সময়ে জনম না ভেল॥

আলোচনা

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত :—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি বাংলা পয়ারগ্রন্থ বলিয়া যে নিতান্ত উড়াইয়া দিবার নয় একথা আজকাল আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রত্যেক পয়ারটী গভীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত-পূর্ণ। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই একথা বলিবেন। কিন্তু যাঁহারা গ্রন্থমুদ্রিত করিয়া দু'পয়সা উপায়ের চেষ্টা করেন তাঁহারা মুদ্রণটী ভুল হইল কি নির্ভুল হইল—পাঠগুলি সমীচিন হইল কি অসমীচীন হইল তাহার বড় ধার ধারেন না। যে কোন রকমে ছাপাইয়া উপরটা একটু চাকচিক্য করিয়া দিলেই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করেন। ১৫৩৭ শকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড তীরে বসিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তখন ছাপার সুবিধা ছিল না কাজেই হাতে লিখিয়া নকল করিয়া লওয়া হইত। এইভাবে পরম্পর পরম্পরের নিকট হইতে নকল করিয়া লইতে লইতে বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা ভাবিলেও চমকিত হইতে হয়। গ্রন্থকর্ত্তা কবিরাজ গোস্বামীর প্রত্যেক পয়ারের প্রত্যেক শব্দের প্রত্যেক অক্ষরটী তাঁহার ভাবের অনুরূপ পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াছে। একটীমাত্র অক্ষরের বা স্বরের এদিক ওদিক হইলেই বিষম অনর্থ হয়—একেবারে বিপরীত অর্থ হয়। শব্দশক্তির সহিত অর্থশক্তির পরস্পর সামঞ্জস্য না থাকিলে মাধুর্য্য হয় না। কবিরাজ গোস্বামীর লেখায় এই দুইটী এমনভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, কোনরূপ ভেদের আভাস মাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের একটি সংস্করণ বাহির করিতেছেন। তিনি বহু হস্তলিখিত পুঁথির সহিত পাঠ মিলাইয়া সংস্করণের বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টায় আছেন। তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে মুর্শিদাবাদ ভগীরথপুরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত ২১৮ বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে একটী অতিসুন্দর পাঠ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইয়াছি। পাঠক-গণের অবগতির জন্য আমরা নিন্মে পাঠটী দিয়া দিলাম। পাঠকগণের মধ্যে যদি কাহারও অনুসন্ধানে কোন পুঁথিতে বা কোন মুদ্রিত সংস্করণে এই পাঠের

অনুরূপ পাঠ থাকে আমাদের জানাইলে বাধিত হইব। পাঠটী অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষভাগে শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর চরিত্র বর্ণন প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ যথা ;—

"প্রসাদভাত পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হইলে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়াগন্ধে তেলঙ্গাগাভী খাইতে না পারে॥
লই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাতধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি॥
ভিতরের দড় যেই মাঝি ভাত পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায়॥"

এই শ্লোকোক্ত "লবণ দিয়া" স্থলে মুর্শিদাবাদ ভগীরথপুর হইতে প্রাপ্ত পুঁথিতে নাকি "**অলবণ**" পাঠ আছে। রঘুনাথ দাসের যেরূপ বৈরাগ্য, যেরূপ ত্যাগ তাহাতে অলবণ পাঠই যেন সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু কেবল আমাদের মনে হইলে ত কিছু হইবে না? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনেকগুলি চরিতামৃতের হাতেলেখা পুঁথি আছে শুনিয়াছি, তাঁহারা এসম্বন্ধে কি বলেন শুনিতে চাই। তারপর অনেকের ঘরে এখনও অনেক যত্নে শ্রীচরিতামৃতের হস্ত লিখিত পুঁথি দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতেছেন তাঁহারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া এবিষয়টী দেখেন তাহা হইলে বৈষ্ণব জগতের একটী মহৎ উপকার হয়।

তারপর নগেনবাবু আরও এক সুন্দর সংবাদ দিয়াছেন যে, বাজার প্রচলিত কোন সংস্করণে মধ্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত্র বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত চৌদ্দটী পংক্তি নাই। সে চৌদ্দটী পংক্তি আমরা নিয়ে দিলাম—

"একটুকি ছিলা তার করিলা ভক্ষণ।
বিহ্বলেতে প্রেমাবেশে দেখে বৃন্দাবন॥
আনন্দে বিহরে পুরী গোপীনাথ দেখি।
রাধাকৃষ্ণ নৃত্য করে গায় সব সখী॥
রাস বিলাস কেলী যমুনাপুলিনে।
প্রেমের তরঙ্গে নাহি জানে স্থানাস্থানে॥

তৃতীয় প্রহরে পুরী পাইল চেতন।
উঠিয়া প্রণাম করে সঙ্কোচিত মন॥
ঈশ্বরের কার্য্য করি হয় অপরাধ।
নিত্য এইটুকা খাইলে হবে কার্য্যবাধ॥
একদিন সবটুকা ভক্ষিলেন পুরী।
সেই প্রেমাবেশে প্রেম আবেশ আচরি॥
প্রেমে মত্তহঞাপুরী পাইল চেতন।
উঠিয়া স্মরণ করে আনন্দিত মন॥"

আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী, সাহিত্যসেবী সর্ব্বসাধারণকেই এই দুইটী বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। শুনিলাম রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন Doctor of Litarature মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত ২৯৮ বৎসরের পুঁথির পাঠের সহিত নগেন্দ্রবাবুর প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ মিলাইতেছেন। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদকে এবিষয়ে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।

আলালনাথে গৌরাঙ্গ স্মৃতিঃ—কালের গতিতে কত মহামূল্য স্মৃতি যে লোপ পাইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? যদিও আজকাল প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ সংরক্ষণ জন্য একশ্রেণীর লোক বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের অর্থবল নাই। প্রাণ থাকিলে, নিঃস্বার্থ ভাব থাকিলে অর্থের অভাব হয় না সত্য কিন্তু সে ভাবের উদ্যোগ আজকাল কচিৎ দৃষ্ট হয়। যা দু' একজন আছেন তন্মধ্যে সম্প্রতি একজন বাবাজীকে আমরা পাইয়াছি। ইনি আলালনাথে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সর্ব্বাঙ্গচিহ্ন রক্ষাকল্পে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন: নাম অধিকারী শ্রীভগবান্দাস বাবাজী।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে থাকিবার কালীন জগন্নাথের অনবসর কালে আলালনাথে গিয়া বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে—

অনবসরে জগন্নাথের না পাইয়া দর্শন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥
ভক্তসঙ্গে মহাপ্রভু তাহাই রহিলা।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে সমাচার পাইলা॥
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া॥" ইত্যাদি

আলালনাথে অবস্থান কালীন মহাপ্রভু পাঁচহাত লম্বা, তিনহাত চওড়া ও দেড় হাত উচ্চ ঘেরা-মধ্যস্থিত একটী পাথরের উপর ভক্তগণকে লইয়া বসবাস করিতেন এবং সেই পাথরের উপর শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। ভাব বিশেষে সেই প্রস্তরটীর উপর মহাপ্রভুর অবয়বের আপাদমস্তক চিহ্ন সকল থাকিয়া গিয়াছে। সকলে একথা বিশ্বাস না করিতে পারেন কিন্তু আমরা করি। অদ্যাপিও রথযাত্রার সময় বহু যাত্রী শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিহ্ন পদাঙ্কানুসরণ করিয়া উক্ত আলালনাথে গিয়া উক্ত পাথরখানি দর্শন করিয়া থাকেন কিন্তু যত্নের অভাবে এমন মহামূল্য পাথরখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াও অনাদৃত ভাবে পড়িয়া আছে। সম্প্রতি ভগবান দাস বাবাজী প্রমুখ কয়েকজন গৌরভক্ত উক্ত পাথর খানির উপর একটী মন্দির করিয়া দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা সংবাদ পাইলাম উক্ত বাবাজী মহাশয় ভিক্ষা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমৎরাধারমণচরণ দাস দেবের বিশেষ কৃপাপাত্র পাষণ্ড-দ্রব কীর্ত্তনীয়া শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় কিছু কিছু সাহায্যও পাওয়া যাইতেছে। প্রধান উদ্যোগী ভগবান দাসবাবাজী মহাশয় জানাইয়াছেন উক্ত প্রস্তর খণ্ডের উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রায় তিন হাজার টাকা এবং ঐ সঙ্গে আলালনাথের ভগ্ন প্রাচীরাদি সংস্কার জন্য প্রায় দুই হাজার টাকা মোট পাঁচহাজার টাকা লাগিবে।

বঙ্গদেশে এমন অনেক ধনী আছেন যিনি একটু দৃষ্টিপাত করিলে একাই এই মহৎকার্য্য করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের দৃষ্টি এদিকে নাই— যাঁহাদের পরামর্শে ঐ সকল ধনী চালিত হন তাঁহারা যদি নিজ নিজ স্বার্থ একটু কমাইয়া উহাদিগকে এই সকল কার্য্যের জন্য উৎসাহিত করেন তাহা হইলে অর্থের সদ্ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও এক পরম মঙ্গল সাধিত হয়। আমরা বৈষ্ণব সমাজের সকলের নিকটই এ বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থার আশা করি।

কাশিমবাজার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাম্মিলনী ও কলিকাতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনী প্রাচীনকীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট শুনিলাম। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে যত্ন লন তাহা হইলেও আমরা আশা করিতে পারি যে সম্মিলনী বৈষ্ণব জগতের কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যে মহাপ্রভুকে লইয়া সম্মিলনী তাঁহার কোন কীর্ত্তি সংরক্ষণ কি সম্মিলনীর কর্ত্তব্য নয়? আশা করি তাঁহারাও এ বিষয় একটু দৃষ্টি দিবেন।

যাঁহাদের অর্থ আছে, যাঁহারা অর্থের সৎব্যবহার করিয়া কীর্ত্তি রাখিতে ইচ্ছা

করেন তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া এই মহৎকার্য্যের জন্য অগ্রসর হউন। বাবাজী মহাশয় সাহায্য প্রেরণের কয়েকটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন যদি কেহ আমাদের ভক্তি কার্য্যালয়েও পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাহাও পাঠাইতে পারেন আমরা যথাসময়ে উক্ত দান ভক্তিপত্রে স্বীকার করিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিতে পারি। আর যাঁহারা তাহা না চান তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণের যাহার নিকট ইচ্ছা সাহায্য প্রেরণ করিতে পারেন।

১। অধিকারী শ্রীভগবান দাস বাবাজী—
গউর গম্ভীরা রাধাকান্ত মঠ, পুরী
২। শ্রীনন্দকিশোর দাস বাবাজী, ঝাঞ্জপিটা মঠ, পুরী
৩। শ্রীবিহারী দাস বাবাজী শ্রীরাধারমণ বাগ নবদ্বীপ, নদীয়া
৪। শ্রীভক্তিচরণ দাস বাবাজী বৈষ্ণবপাড়া নবদ্বীপ নদীয়া
৫। মহান্ত শ্রীগোপালদাস পণ্ডিত বাবাজী—
শ্রীগোপীনাথের আখড়া, হুগলি
৬। শ্রীরাধাকান্ত দাস বাবাজী—মাধুকরিয়া ঝাড় মণ্ডল বৃন্দাবন
৭। শ্রীদয়ানিধি দাস বাবাজী শ্রীগোপালগুরু মন্দির, বৃন্দাবন
৮। শ্রীবৈষ্ণবানন্দ সরস্বতীবৈষ্ণব কবি ওড়িশা গড়জাত, সম্বলপুর
৯। শ্রীপরমানন্দ দাস বড় বাবাজী গউর গম্ভীরা রাধাকান্ত মঠ, পুরী
১০। শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দির, পুরী।

এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে উক্ত ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিবেন।

কান্ত-কবি রজনী কান্ত—পুস্তকখানি আমরা সমালোচনার জন্য বহুদিন পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত। হৃষিকেশ সিরিজের চতুর্থ পুস্তক এই কান্ত-কবি রজনীকান্ত। মূল্য চারি টাকা।

একবার বহুদিন পূর্ব্বে কোনও পাশ্চাত্য মনীষীর লেখনী মুখে প্রকাশ হইয়াছিল গ্রন্থসমালোচনার পূর্ব্বে গ্রন্থকারের বিষয় অবগত হওয়া দরকার। আমাদের রজনীকান্ত প্রণেতা নলিনী বাবুর পরিচয় সাহিত্য সমাজে কে না জানেন, নলিনী বাবুর মত সাহিত্য সেবাব্রত উৎসর্গিকৃত জীবন, অক্লান্ত কর্ম্মী যথার্থই সহজে পাওয়া যায় না। তাহার পর নলিনী বাবুর লেখার ভঙ্গি অতি সুন্দর, পুরাতন বিষয়কে সরস ও কোমল করিয়া লেখনী মুখে পাঠকের সম্মুখে জাগ্রত করিয়া তুলিতে নলিনী বাবু বিশেষ দক্ষ।

রজনীকান্ত সেন, সঙ্গীতে, কবিতায়, রসরচনায় বাঙ্গালায় একটা নূতন রকমের তরঙ্গ বহাইয়াছিলেন, কবির রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার বিষয়ে জানিবার ঔৎসুক্য অনেকেরই জন্মে। যেদিন প্রথম আমাদের কর্ণে "আমি ত তোমারে চাহিনা জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।" "কেন বঞ্চিত হব চরণে"। "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে!" প্রভৃতি

গান প্রবেশ করে, সেইদিন হইতেই কবির জীবনী পাঠের আকাঙ্খা জাগে। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কবিবরের কোনরূপ জীবনচরিত আমরা দেখিতে পাই নাই। প্রথম যখন নলিনী বাবুর সহিত পরিচয় হয় তখন তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন রজনীকান্তের জীবন চরিত তিনিই প্রকাশ করিবেন। মনে করিয়াছিলাম আজ কাল যেভাবে জীবনী আলোচনা হয়, নলিনী বাবুও সেই ভাবে রজনীকান্তের জীবনী লিখিবেন। কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমাদের সে সন্দেহ দূর হইয়াছে। আমারা মুক্তকণ্ঠে বলিব নলিনী বাবুর এরূপ জীবন চরিত লেখা প্রকৃতই লেখকগণের অনুকরণীয়। পুস্তকমধ্যে বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ভাল লাগিয়াছে "রজনীকান্তের রোজনামচা"। হাসপাতালে রোগ শয্যাশায়ী রজনীকান্তের অবস্থা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ হয় না। নলিনী বাবুর লিপিচাতুর্য্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কবির জীবন চরিত যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং যেরূপ অর্থব্যয়ে জীবন চরিতখানি মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে যদিও চারি টাকা মূল্য হওয়া অসঙ্গত নয়, তথাপি আমাদের মনে হয় এমন সুন্দর জিনিষ আপামর সাধারণের পাঠের সুবিধার জন্য মূল্য কিছু কম করিলে ভাল হইত। এরূপ ভাবের জীবনচরিতের সমীচীন আলোচনা করিতে-গেলে পুনরায় আর একখানি পুস্তক হইয়া যায়। এক কথায় পুস্তকখানি অতি উত্তম হইয়াছে। আমরা সকলকেই একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা বেঙ্গল বুক কোঃ হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

হঠাৎ ফাল্গুন মাসের শেষে ছাপাখানার বাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হওয়ায় চৈত্রমাসের ভক্তি প্রকাশে বিলম্ব হয়, তারপর সম্পাদক মহাশয় ধর্ম্মসভার নিমন্ত্রণে বাহিরে যাওয়ায় এবং বৈশাখ মাসের কাগজ প্রকাশেও বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনায় চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাসের ভক্তি একত্রে প্রকাশ হইল। যথাসময়ে চৈত্র মাসের পত্রিকা না পাইয়া অনেক গ্রাহক আমাদিগকে বিলম্বের কারণ জানাইতে পত্র লিখিয়াছেন। প্রত্যেককে পৃথকভাবে পত্র দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া এই সঙ্গে বিলম্বের কারণ সকলকে জানান হইল।

এখনও বর্ত্তমান বর্ষের ভক্তির মূল্য কোন কোন গ্রাহকের নিকট বাকী আছে। বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল এ সময় গ্রাহকগণের দেয় সাহায্য পাইলে বিশেষ উপকার হয়। আগামী বর্ষ হইতে ভক্তির কলেবর কিছু বৃদ্ধি করিবারও ইচ্ছা আছে—এখন হইতে সকলে ২।১টী করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া আমাদের কার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধিত করুন। মনে রাখিবেন গ্রাহকগণের অনুকম্পা পত্রিকা প্রকাশের প্রধান সহায়। প্রত্যেক গ্রাহক যদি অন্ততঃ একজন করিয়া গ্রাহকও সংগ্রহ করিয়া দেন তবুও যথেষ্ট হয়। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইব না। আগামী বৎসর হইতে পৃথক পত্রাঙ্কে গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হইবে।

বিনীত

ভক্তি—কার্য্যাধ্যক্ষ

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল]

প্রার্থনা

দীননাথ! মন যে কিছুতেই স্থির হয় না, তোমার কৃপায় কত পাইলাম, কত ভুগিলাম, কত ঘুরিলাম, কত কি দেখিলাম তবুও মনে শান্তি আসিল না—আশা মিটিল না। মন আমার সর্ব্বদাই ব্যস্ত, সর্ব্বদাই অপূর্ণকাম। ঠিক যদিও বুঝিতে পারিতেছি না যে, কোন্ বস্তুর প্রত্যাশায় মন এত চঞ্চল, তবে এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এখন মনে হইতেছে তুমি সকলের আশ্রয়; তোমাকে পাইলে, তোমার ভাবে মাতিতে পারিলে, তোমার তত্ত্ব হৃদয়ে সুদৃঢ় ভাবে ধারণা করিতে পারিলে আমার এ নানাবিধ বাসনা-বাসিত হৃদয় শান্ত হইবে। কিন্তু কি করিয়া তাহা হয় বুঝিতে পারিতেছি না। সকল কার্য্যের নিয়ামক তুমি; কি ভাবে কোন কার্য্য করিলে তোমার ভাব প্রাণে জাগিবে দীনহীনকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া সেইভাবে কার্য্য করিবার শক্তি দাও।

প্রেমময়! তোমার প্রেমে ভরা জগত তোমাকে লইয়া কতই আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত তোমার প্রেমময়-ভাব লইয়া তোমার আদেশে তোমার লীলার সহায়তা করিতেছে কেবল আমিই কি জ্বালায় জ্বলিয়া মরিব? একবারও কি তোমার ভুবন মোহন প্রেমাধার শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া তাপিত প্রাণ জুড়াইতে পারিব না? পদে পদে অনুভব করিতেছি যে, আমার সকল সাধন, ভজন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম চিন্তাযোগে বিনষ্ট হইতেছে,

কিন্তু বুঝিয়াও ত কিছু করিতে পারিতেছি না। তুমি দয়াময়, আমার এ দারুণ, চিন্তারূপ দুর্ব্বিষম রোগ হইতে আমাকে রক্ষা কর। সঙ্গে সঙ্গে এমন শক্তি দাও যেন নিরন্তর তোমায় ভাবিতে, তোমার লীলাগুণগানে চিত্তকে সর্ব্বদা নিয়োজিত রাখিতে পারি।

"রিপু:ছয় জনে লইয়া আমারে কোথা যাবে তাহা জানি না।
দীন এই ভিক্ষা চায় যথা তথা যায় মন যেন তোমায় ভোলে না।"

দয়াময় দীনবন্ধু, দীনের বাসনা পূর্ণ করিয়া দীনবন্ধু নাম সার্থক কর, এবার আমার এইটীই প্রার্থনা।

ভিক্ষা

প্রভু, বহুদূর হ'তে এসেছি পথিক
তোমার তোরণ তলে।
জীবন যুদ্ধে বীরের মতন,
বীরের ধর্ম্ম করি সমাপন,
আসি নাই প্রভু লভিতে তোমার
প্রসাদ মাল্য গলে॥
অথবা দেবতা তোমায় লাগিয়া,
জীবনের সব তৃষা তেয়াগিয়া,
তোমার পূজার আয়োজন ক'রে—
আসি নাই কুতুহলে।
মরমে বহিয়া সরমের রাশি,
চির অপরাধী দাঁড়ায়েছি আসি,
ধরণীর ধুলি ধুয়েত আসিনি
মন্দাকিনীর জলে!
ক্ষমা মেগে নিতে চরণে তোমার
এসেছিগো বড় আশে।
তোমার দুয়ারে জনতা হেরিয়া,
অতি সংকোচে গিয়াছি সরিয়া,

সাধুর অঙ্গ কেমনে পরশি
তাই মরি হরি ত্রাসে ॥
গাহিয়া তোমার জয় জয় গান,
ছুটেছে লক্ষ ভকত পরাণ,
গগন পবন ভরে গেছে সব
তাহাদের জয়োল্লাসে।
তাদের হৃদয়ে কত প্রেম ভরা,
আমার হৃদয় পাপের পশরা,
আমার কণ্ঠে তাদের মতন
জয়ধ্বনি কই আসে।
অন্তরযামী কি সাহসে আমি
যাব গো তোমার পাশে?
তবে কি আবার ফিরে যাব আমি
সেই পুরাতন পথে!
আবার সেথায় আধারে আধারে
পথ হারা হ'য়ে ভ্রমিব পাথারে,
আলেয়ার আলো ভুলাবে আমারে
শত সহস্র মতে॥
প্রেত পিশাচেরা ধরি নানারূপ,
আবার কি মোরে জ্বালাবে সেরূপ,
জীবন আমার হবে কি অসার—
তাদেরি তোষণ ব্রতে!
না না দীননাথ তা'হতে দিওনা,
এত দূরে এনে মোরে ফিরাওনা
চরণে না নাও ফিরাওনা তুমি
তোমার দুয়ার হ'তে॥

শ্রীশিবকৃষ্ণ রায়

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও ধর্ম্ম-সমন্বয়।

চারিশত চল্লিশবৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে এক নব-প্রেরণা ও জাগরণ দিয়াছিলেন। সেই প্রেরণায় বিহ্বল হইয়া তাহারা ধর্ম্মসাধনের এক নবীন আদর্শ প্রবর্ত্তিত করেন। এই আদর্শ বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। বাঙ্গালা দেশের এই সাধনফল বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে—অসংখ্য নরনারী ধর্ম্মসাধনার এই আদর্শ ও প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট অবস্থাতেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটী ধর্ম্ম-মণ্ডলী প্রবর্ত্তিত হয়। এই মণ্ডলী তাঁহার প্রকটকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই চারিশত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অসংখ্য শাখা মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়াছে। এখন আমরা দেখিতেছি সাধনার যাহা প্রাণ তাহা চাপা পড়িয়াছে—নানারূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধে সত্যের সুনির্ম্মল আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়াছে।

আজ স্বাধীনচিত্ত, সত্যান্বেষী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যাক্তিগণকে এই বিরোধ বিতণ্ডার কুয়াশা ভেদ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত ধর্ম্মমত ও শিক্ষা কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। মহাপ্রভুর নামের দোহাই দিয়া যাহারা সচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা করিয়া লইয়াছে, তাহাদের কথা শুনিয়া বঞ্চিত হইলে চলিবেনা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কারণ যে সমুদয় গ্রন্থে তাঁহার কথা লিখিত আছে, সেই সমুদয় গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডার অনেক কথা মিশিয়া রহিয়াছে। অতএব অতিশয় সাবধানে আত্ম-বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝিয়া সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

প্রথম কথা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি একটি নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়া, একটী নূতন ধর্ম্ম-মণ্ডলী গঠন করিয়া, পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত অন্যান্য ধর্ম্মমত ও পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তিত ও পরস্পর বিবদমান অন্যান্য ধর্ম্মমণ্ডলীর সহিত বিরোধ করিতে আসিয়াছিলেন? ইহার উত্তর "না, না, না"—এ কার্য্য তিনি করিতে আসেন নাই এবং ইহা তাঁহার অভিপ্রায়ও ছিল না। অল্পবুদ্ধি লোকেরা

তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া অথবা চতুর লোকেরা মানবকে বঞ্চনা করিয়া নিজেদের সুবিধা করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছে।

যে সমুদয় গ্রন্থে সেকালের সাম্প্রদায়িক ভাবের জন্য অনেক সঙ্কীর্ণ কথা প্রবেশ করিয়াছে, সেই সমুদয় গ্রন্থের দ্বারাই ইহা সপ্রমাণ করাযায়।

ব্রহ্ম হরিদাস যবন—কেহ বলেন যবনকুলেই জন্ম, আবার কেহ বলেন হিন্দুকুলে জন্ম, তবে শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া যবন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি যবন। হরিনামে তাঁহার সুতীব্র অনুরাগ, তিনি বৈষ্ণবাচারে থাকেন—প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করেন। তাঁহার উপর অনেক অত্যাচার হইয়াছে। শেষে তাঁহার বিচার। মুলুকের অধিপতির নিকট বিচার। বিচারক বলিতেছেন—

"কেনে ভাই ! তোমার কিরূপ দেখি মতি ॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশ জাত ॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার ॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার।"

শ্রীহরিদাস ইহার উত্তরে বলিলেন—

"শুন বাপ সভারই একই ঈশ্বর ॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে-যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥
একশুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয় ॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন ॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে ॥
যে ঈশ্বর সে পুনি সভার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয় ॥
এতেকে আমারে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইছেন চিত্তে করি আমি তেন ॥
হিন্দু কুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনিই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ॥
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম ?
মহাশয় ! তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায় হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। ইহার সার কথা শ্রীহরিদাস, প্রতি নর-নারীর হৃদয়ে আত্মার অন্তর্য্যামী যে গুরুরূপী ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার নামে ধর্ম্ম-বিষয়ে

প্রত্যেকের স্বাধীনতার দাবী করিতেছেন। ইহাই সত্য-ধর্ম্ম, এবং এই ধর্ম্মের আলোকেই ভবিষ্যতে প্রকৃত ধর্ম্ম-সমন্বয় হইবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যখন মহাপ্রকাশ বা সাত প্রহরিয়া ভাব হয় তখন দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীধর যে স্তুতি করিয়াছিলেন—তাহাতে এই সমন্বয়—অবশ্য সে সময়ের উপযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি ভক্তি জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র তুমি বেদ তুমি সর্ব্ব ধ্যান ॥
তুমি ঋদ্ধি তুমি সিদ্ধি তুমি যোগ ভোগ।
তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি মোহ লোভ ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি অগ্নি জল।
তুমি সূর্য্য তুমি বায়ু তুমি ধন বল ॥
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি অজভব।
তুমি বা হইবে কেন তোমার এ সব ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগ বর্ণনায় শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের সহিত তাহা মিলাইয়া চিন্তা করিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে। বিভূতি-যোগ বর্ণনায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন —"দ্যূতংছলয়তামস্মি"—আমি বঞ্চকদিগের দ্যূত।

প্রকৃত কথা প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম পৃথক—কোন মানুষকে কোন একটা ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যায় না। প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম ও ভগবদনুভূতি তাহার ভিতরের বিকাশের (Inner development) উপর নির্ভর করিতেছে।

মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর তাহার ধর্ম্মমত যখন প্রতিষ্ঠিত হইবে, ছলে বলে কৌশলে কতকগুলি মানুষকে একটা বিশিষ্ট মতে দীক্ষিত করিয়া মণ্ডলী গড়িবার চেষ্টা যখন থাকিবে না—সেই সময়ই প্রকৃত ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যুগ আসিবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময় দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্ট নামক এক শ্রী-সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করেন শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে পরতত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণবগণের মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরতত্ত্ব; শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাদের বিলাস মূর্ত্তি। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত বেঙ্কট ভট্টের মতগত পার্থক্য (Doctrinal diffarence) ছিল। এই

মতগত পার্থক্য কি প্রকার উদারতা ও পূর্ণ মতসহিষ্ণুতার সহিত আলোচিত হইয়াছে তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়া বেঙ্কট ভট্টকে বুঝাইয়া দিলেন যে, লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য তপস্যা করেন কিন্তু রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পান নাই। কিন্তু শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া পাইয়া ছিলেন। তাহার কারণ শ্রুতিগণ ব্রজের মাধুর্য্য ভাব আশ্রয় করিয়া ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর কথায় বেঙ্কট ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ হইল। বেঙ্কট ভট্ট মনে করিতেন শ্রীসম্প্রদায়ের মতই একমাত্র বৈষ্ণব মত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন কিন্তু তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। বেঙ্কট ভট্টের নিজের যাহা মত সেই মতেই তাহার বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য মহাপ্রভু বলিলেন—

"দুঃখ না মানিহ ভট্ট কৈল পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন,—যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাই হয় একরূপ॥
গোপী দ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহ করে নানা কার রূপ॥"

ইহাই সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ, ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। এই আদর্শের আলোকে কেবলমাত্র দু'একটী বৈষ্ণব মত নহে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইবে, অথচ নিষ্ঠাসহকারে স্বধর্ম্মপরায়ণ হইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম-সমন্বয়। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক (ভাগবতরত্ন)

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম

(২)

ইহাতে রামরায় বলিলেন—"প্রভু আর এক দিক দেখুন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া যখন আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছেন, তখন শ্রীমতী

দেখিলেন এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক কৃষ্ণ। আর তাঁহার পার্শ্বেও সেইরূপ এক কৃষ্ণ রহিয়াছেন তখন তাঁহার দুর্জ্জয় মান হইল। তিনি সেই মানভরে রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন সমস্ত আনন্দ মন্দ হইয়া গেল, শারদ পূর্ণিমা-রজনী ম্লান হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতীকে অন্বেষণ করিতে গেলেন—কালশশী যমুনার কূলে বসিয়া শ্রীমতীর বিরহে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। এই যে অতুলনীয় প্রেম ইহাকে কি প্রভু আপনি অন্যাপেক্ষ বলিলেন?

প্রভু এক্ষণে আনন্দে গদগদ হইয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন রায় এই জন্যই আমি তোমার নিকট আসিয়াছিলাম, আমার জিজ্ঞাস্য সমস্তই ভালরূপে বুঝিলাম। এক্ষণে কৃপা করিয়া শ্রীরাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তুমি ব্যতীত আর কেহ আমার এ কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না।

বিনয়ের খনি প্রভু আমাদের তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠে রায়ের নিকট পুনরায় এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। রামরায় প্রভুর এই মধুর ও অমৃতবৎ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—

"তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ করাও, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥"

আমাদের কপট প্রভুকে ত পারিবার জো নাই! তিনি বলিলেন, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী—আমি ভক্তির বা ভক্তের কি জানি? সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশে আমি তোমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আসিয়াছি। লোকে সন্ন্যাসীকে নারায়ণ বলিয়া মান্য করে এবং চরণধূলি গ্রহণ করে। তুমিও আমাকে সেই মত ভক্তি করিতেছ। কিন্তু তাহা ভিন্ন কথা, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই প্রকৃত গুরু,—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে হয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণ রাধা-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥"

আরও বলিলেন,—

"তোমার ঠাঁই আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥"

এখানে প্রভু জ্ঞানমার্গাবলম্বী মায়াবাদী সন্ন্যাসী অপেক্ষা কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা শূদ্রেরও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছেন।

"মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের করিতে সর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারে কৈল ধর্ম্মের প্রকাশ॥"

ইহার পর রামরায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি অতি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, সে অতি গভীর ব্যাপার, আলোচনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। সেই গভীর ব্যাপার আলোচনা করিতে করিতে রায়ের তর্ক উঠিল, তিনি বলিলেন,—

"এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥"

ইহাতে প্রভুর সেই কপট বাক্য;—

"সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীল রামানন্দ রায় প্রেমই সাধ্য শিরোমণি বলিয়া সাধনার ক্রম সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভু তাহার পরেও প্রশ্ন তুলিয়াছেন,—

"প্রভু কহে ইহা হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাই আর॥"

রামরায় ভাবিতেছেন ইহার পর আর কি বলিবেন। অনেক ভাবিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—স্বামিন! আপনার শক্তিতেই আমি এতক্ষণ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ বিবৃত করিয়া আসিয়াছি, আর শক্তি নাই। এখন আপনি যদি আরও কিছু শক্তি দেন তবেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব। তবে আমার স্বরচিত একটী গীত আছে। উহা আপনাকে শুনাইতে পারিলে। আপনাকে সুখী করিতে পারিব কিনা বলিতে পারি না। এই কথা বলিয়া তিনি এই গীতটী গাহিতে লাগিলেন,—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মনে মনোভাব পেষল জানি ॥
এ সখি সে সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরাল জানি ॥
না খোঁজলু দোতী না খোঁজলু আন।
দুহুঁকি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেল দোতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বৰ্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভান ॥"

এই গানটী প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত সূচক এবং অতি গুহ্যতত্ব পূর্ণ। রামরায় অনুরাগী ভক্ত তিনি রসিক শিরোমণি। কাব্য ও সঙ্গীত তাঁহার ভজনের উপকরণ। তিনি গানটী গাহিতে আরম্ভ করিলে প্রভু প্রেমে চঞ্চল হইলেন। ক্রমশঃ এত অধীর হইয়া পড়িলেন যে, আর শ্রবণ করিতে না পারিয়া নিজ হস্ত দ্বারা রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। মনের ভাব এই যে, চুপ কর এ অতি গুহ্য কথা লোকে শুনিতে পাইবে।

রামরায় ভজনের যে নিগূঢ়তত্ব প্রকাশ করিলেন তাহা গৌর ভক্তগণই একমাত্র সম্ভোগের অধিকারী। চৈতন্য চন্দ্রামৃতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিতেছেন,—

"ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষনা যদ্বেদ নো শুকঃ।
যন্ন কাপি কৃপাময়েন চ নিজেপ্যুদ্ঘাটিত শৌরিনা
তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌর প্রিয়াঃ ॥"

যে মধুর ভক্তি-পথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্ব্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত ছিলেন না এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের প্রতিও প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌর ভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন।

মহাপ্রভু শ্রীরামরায়ের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পরকীয়ারসের প্রকাশ স্বরূপ শ্রীমতী রাধা-তত্ত্ব জগতে প্রকটিত করিলেন।

এখন রাম রায়ের গীতের অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! আমার শ্যামের সহিত কিরূপে প্রীতি হইল তাহা বলিতেছি। প্রথমে তাঁহার সহিত নয়নে নয়ন মিলন হইল। আমি তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। অমনি তদ্দণ্ডে প্রীতির সৃষ্টি হইল। শুধু সৃষ্টি হইল তাহা নয়, বাড়িতে বাড়িতে চলিল, আর তাহার শেষ পাইলাম না।"

এখন শ্রীমতীর কথা লইয়া একটু বিচার করিব। শ্রীকৃষ্ণ কে, তাহা শ্রীমতী জানেন না। তাঁহাতে কোন গুণ আছে কি না, তিনি স্নেহশীল কি নিষ্ঠুর, দেব কি দৈত্য, ইহাও জানেন না। তবে দেখা মাত্র প্রীতি হইল কেন? এরূপ কি কখনও হয়? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ হয়। কোন সুন্দরী স্ত্রী ও সুন্দর যুবক এইরূপ দেখাদেখি মাত্র পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে কেন? তাহার কারণ, একজন পুরুষ, আর একজন রমণী। কিন্তু রাধার মনে সে ভাবের গন্ধও ছিল না। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

"না সো রমণ না হাম রমণী।"

"অর্থাৎ, "সখি! এই যে প্রীতি হইল, ইহা আমি রমণী ও তিনি রমণ বলিয়া নহে। তিনি যে পুরুষ আর আমি যে নারী, তাহা আমি তখন কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না।"

অতএব দেখ, সামান্য সুন্দরীতে ও সুন্দরে যে প্রীতি, সে প্রীতি ও রাধার প্রীতির সহিত অনেক বিভিন্নতা। পুরুষ যে স্ত্রীলোকের সুখের ও স্ত্রী যে পুরুষের সুখের সামগ্রী, শ্রীমতী তখন তাহা কিছুই জানেন না। এই যে প্রীতি হইল, তাহার হেতু কি? ইহার কিছু হেতু পাওয়া যায় না, তাই উহাকে বলে অহেতুক প্রেম।

শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! যখন লোকে প্রীতি করে, তখন তাহার মধ্যস্থ একজন দূতী থাকে। সে মধ্যবর্তিনী থাকিয়া পরস্পরের পরিচয় করিয়া দেয়, আর পরস্পরের প্রীতি-বর্দ্ধনের সহায়তা করে।" শ্রীমতীর কথার তাৎপর্য্য এই যে, দূতী এরূপ বলে, অমুক তোমাকে দর্শনাবধি তোমার বিরহে মৃতবৎ আছেন। এইরূপ বলিয়া পরস্পরের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করিয়া দেয়।

শ্রীমতী বলিতেছেন যে, "আমরা পরস্পরের দর্শনাবধি অধীর হইলাম, আমাদের প্রীতি আপনা আপনি বাড়িতে থাকিল, দূতীর প্রয়োজন হইল না। তবে আমাদের দৌত্য কে করিল? আমাদের দূত কেবল "পাঁচ বাণ।"

"পাঁচ বাণ" কি, না পরস্পরের লোভ! এ "পাঁচ বাণ" কাম নয়, যে-হেতু শ্রীমতী জানেন না যে, তিনি স্ত্রী ও শ্যাম পুরুষ। এইরূপ প্রীতি মনুষ্যে সম্ভবে না, যেহেতু তাহারা অপূর্ণ অর্থাৎ পরিবর্দ্ধনশীল। এরূপ কেবল সম্ভব শ্রীমতী রাধার। তিনি কে? শ্রীভগবান, পুরুষ ও প্রকৃতি সম্মিলিত, রাধা তাঁহার প্রকৃতি অংশ। অতএব শ্রীভগবানকে দুই ভাগে অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি করিয়া, সাধক তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপে সম্মুখে রাখিলেন। রাখিয়া এই অকৈতব প্রীতির খেলা খেলাইতে লাগিলেন।

"কান্তভাবে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ বিহার করেন। কিন্তু পরকীয়া ভাবে গোপীগণ পরোক্ষে বিহার করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যে প্রীতির খেলা, তাই যোজকতা করিবার একজন হয়েন। তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত আপনার বিহার করেন না। রাধা-কৃষ্ণের বিহার করাইয়া আনন্দ ভোগ করেন।

"শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যে প্রীতি ইহা জীবে সম্ভবেনা, উহা এত গাঢ়, এত পবিত্র, এত সূক্ষ্ম, এত মধুর যে, জীবে উহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার শক্তি ধরে না। অতএব শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লীলারস আস্বাদ করিয়া জীবে ক্রমে প্রীতি-রূপ পঞ্চম পুরুষার্থ পাইয়া ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে।

"হে তত্ত্ব কথা! তুমি সূর্য্যের ন্যায় অতি বৃহৎ তেজস্কর বস্তু, তোমাকে আমি লাগ পাই না। আমি ক্ষুদ্র, তোমার তেজ আমি সহিতে পারি না। তুমি এখন আমাকে বিদায় দাও, আমি প্রভুর লীলারূপ সুধা সাগরে প্রবেশ করিয়া আমার তাপিত অঙ্গ শীতল করি। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তত্ত্ব কথা সমুদায় বুঝি না। যাহা একটু বুঝি, তাহাও সমুদায় এখানে দিতে পারিলাম না, যেহেতু সকল কথা ভাষায় কুলায় না। যাঁহারা এ বিষয়ে রসিক তাঁহারা শ্রীগোস্বামীগণের গ্রন্থ পড়িবেন।"—(শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত।)

সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে রামরায়ের উপদেশ হইতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহার কিছু কিছু এই স্থানে আলোচনা করিব। শ্রীল রামরায়ের আলোচনা বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন,—

"রাধা-কৃষ্ণের লীলা হয় অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহ অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়;
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যে নাহি গতি।
সখী ভাবে তারে যেই করে অনুগতি॥
রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥"

এই ব্রজ সুন্দরীগণের মধ্যেই অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম ছিল এবং সেই প্রেম লাভের একমাত্র সাধন—রাগানুগাভক্তি। শ্রীল রাম রায়ের বাক্য,—

"সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥"

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা।

[বঙ্গাব্দ ১৩৩১, চৈতন্যাব্দ ৪৩৯—৪৪০]

(পঞ্জিকার ব্যবস্থা-ভ্রান্তি নিরাশার্থে)

বৈশাখ।

একাদশী	২রা মঙ্গলবার।
শ্রীবলদেবের রাসযাত্রা।	৬ই শনিবার।
একাদশী।	১৬ই মঙ্গলবার।
অক্ষয় তৃতীয়া।	২৪এ বুধবার।
জহ্নু সপ্তমী।	২৮এ রবিবার।

জ্যৈষ্ঠ।

একাদশী।	১লা বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত। ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোলযাত্রা।	৪ঠা রবিবার।
একাদশী।	১৫ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী।	৩০এ শুক্রবার।

আষাঢ়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা।	৩রা মঙ্গলবার।
একাদশী।	১৩ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা।	২০এ শুক্রবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা।	২৮এ শনিবার।
শয়নৈকাদশী, রাত্রির প্রথম যামে শ্রীশ্রীহরির শয়ন (চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ)।	২৯এ রবিবার।

শ্রাবণ।

একাদশী।	১১ই রবিবার।
একাদশী। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারম্ভ।	২৬এ সোমবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ।	২৭এ মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। শ্রীশ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা।	২৯এ বৃহস্পতিবার।

ভাদ্র।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত।	৬ই শুক্রবার।
একাদশী।	১০ই মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত।	২১এ শনিবার।
পার্শ্বৈকাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশী।	২৪এ মঙ্গলবার।
মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবামনদেবের অর্চ্চনা তৎপরে পারণ। সায়ং দিবা দণ্ডে শ্রীশ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন।	২৫এ বুধবার।

আশ্বিন।

একাদশী।	৮ই বুধবার।
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।	২১এ মঙ্গলবার।
একাদশী।	২৩এ বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা।	২৬এ রবিবার।

কার্ত্তিক।

একাদশী।	৭ই শুক্রবার।
শ্রীগোবর্দ্ধন যাত্রা ও অন্নকূট, বেলা ১।২ মিঃ পরে।	১১ই মঙ্গলবার।
গোপাষ্টমী।	১৮ই মঙ্গলবার।
একাদশী।	২১এ শুক্রবার।
মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীহরির উত্থান চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন।	২২এ শনিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।	২৪এ সোমবার।

অগ্রহায়ণ।

একাদশী।	৮ই রবিবার।
একাদশী।	২২এ রবিবার।

পৌষ।

একাদশী।	৭ই সোমবার।
একাদশী (পক্ষবর্দ্ধিনী)	২২এ মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা।	২৫এ শুক্রবার।

মাঘ।

একাদশী।	৮ই বুধবার।
বসন্ত পঞ্চমী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন।	১৬ই বৃহস্পতিবার
মাকরী সপ্তমী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব উৎসব।	১৮ই শনিবার।
ভৈমী একাদশী।	২২এ বুধবার।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব।	২৪এ শুক্রবার।

ফাল্গুন।

একাদশী।	৭ই বৃহস্পতিবার।
শিবরাত্রি ব্রত।	১০ই রবিবার।
একাদশী। আমর্দ্দকী ব্রত, শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন।	২২এ শুক্রবার।
শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা।	২৬এ মঙ্গলবার।

৪৪০ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ।

চৈত্র।

একাদশী।	৭ই শনিবার।
শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রত।	১৯এ বৃহস্পতিবার।
একাদশী।	২২এ রবিবার।
দমনকারোপণ উৎসব।	২৩এ সোমবার।
শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা।	২৫এ বুধবার।

দ্রষ্টব্য:—শ্রীধাম বৃন্দাবনে তদ্দেশীয় প্রথানুসারে ২৫এ ভাদ্র বুধবার বিজয়াব্রত এবং ২৬শে ফাল্গুন বহ্ন্যুৎসব, ২৭শে দোলোৎসব হইয়া থাকে। বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিতা যতিধর্ম্মপরায়ণা (বিধবা) দ্বিজপত্নীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোস্বামী মধুসূদন লালাজি (শ্রীধাম বৃন্দাবন) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট) প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন ১৬১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন (শ্রীধাম নবদ্বীপ) মহাশয়গণকে পত্র লিখিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবে।

আচার্য্যগণের অভিমতানুসারে
শ্রীরাধাকিঙ্কর গোস্বামী—
সম্পাদক।
শ্রীভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত চৈতন্য কৃপাপাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যার স্মরণেই মাত্র॥" (চৈঃ ভাঃ)

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর জীবনী লিখিবার উপযুক্ত ঘটনাবলী প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে বিস্তারিত ভাবে কিছুই পাওয়া যায় না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাঁহার জীবন আখ্যায়িকা সঙ্কলন করিয়া আমরা পবিত্র হইব বলিয়া বাসনা করিয়াছি।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে পূর্ণব্রহ্ম এবং তিনি যে হরিনাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন একথা আজ বুঝাইবার জন্য আর শাস্ত্রীয় প্রমাণের অবতারণার আবশ্যক হইবে না। এই গৌরলীলা পূর্ণ করিবার জন্য যে অগণিত ভক্তের আবির্ভাব হইয়াছিল আমাদের আলোচ্য বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহাদিগেরই অন্যতম।

"সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত লৈয়া।
বৃন্দাবন চন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া॥" (ভক্তি রত্নাকর।)

এই ভক্তগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; পারিষদ ভক্ত আর সাধক ভক্ত।

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর॥ (চৈঃ চঃ)

বিশুদ্ধ সত্ত্বতনু ভগবানের নিত্যসেবকগণই পারিষদ; এবং সাধনা দ্বারা যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই সাধক। শ্রীগৌরাঙ্গ পারিষদগণ প্রভুদত্ত প্রেমসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া জগদ্বাসীকে অকাতরে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থ এই জন্য মহাপ্রভুকে ভক্তি কল্পতরু এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তগণকে শাখারূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ তরুর দুইটি প্রধান স্কন্ধ—প্রভু অদ্বৈত ও প্রভু নিত্যানন্দ, আর স্কন্ধ দ্বয়ের শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে বহু শাখা প্রশাখা জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে। প্রধান প্রধান পারিষদগণরূপ মূল শাখাগণেরও ঐরূপ শাখা প্রশাখায় চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বক্রেশ্বর পণ্ডিতও মূল শাখার একটী বৃহৎ শাখা বলিয়া খ্যাত। তিনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। প্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন—

"তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা॥" (চৈঃ চঃ)

মহাকবি কর্ণপুর শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে চৈতন্য কল্পতরু ও শাখাগণের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

মতি মুকুটমণি মুনিবর মাধবাচার্য্য যাহার মূল, অদ্বৈতাচার্য্য যাহার অঙ্কুর, অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু যাহার স্কন্ধ, শ্রীবক্রেশ্বরাদি পণ্ডিতগণ যাহার মূল শাখা-যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মধুর রসে পূর্ণ, সুবিস্তীর্ণ ভক্তিযোগ যাঁহার কুসুম, অকৈতব প্রেম যাঁহার ফল।

কলিকালকে ধন্য করিবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রভুর আমার জীবের প্রতি কি করুণা। তিনি আপন পারিষদগণ সহ যাচিয়া যাচিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ভক্তি রূপ অমৃত ফল বিলাইয়া গিয়াছেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে স্বয়ং মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"এক মালাকার আমি কাহা কাহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে এই ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে॥"

তখন—

"এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরমানন্দ পাইল তবে বৃক্ষ পরিবার॥
যেই যাহা তাহা দান করে প্রেম ফল।
প্রেম ফলাস্বাদে সুখে ব্যাপিল সকল॥"

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পণ্ডিতের নিকট প্রেমরূপ অমৃত ফলের আস্বাদ লাভ করিয়া কত শত শত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীব যে ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আর যে স্থানে তিনি কৃপা করিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন সে স্থান এক পবিত্র ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে মহাপ্রভু বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মহিমা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠ ময়॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে বড় ছোট বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদ চয়।
গুরু লঘু ভাব কার না হয় নিশ্চয়॥

অন্যত্র— "কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম।"

তবে কোন কোন বিষয়ের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া গৌর-প্রেমিক গোলকগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার রচিত অমিয় মাখান অমিয়-নিমাই-চরিত গ্রন্থের একস্থানে তাঁহাকে মহাপ্রভুর ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ও অদ্বিতীয় বলিয়া বর্ণণ করিয়াছেন,—

"গৌর অবতারে নৃত্যকারী দুইজন, সুন্দর পুরুষ চারিজন। সুন্দর পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার নীচে শ্রীগদাধর, তাঁহার নীচে শ্রীবক্রেশ্বর ও রঘুনন্দন। নৃত্যকারীর মধ্যে দুইজন প্রধান। প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ, দ্বিতয় শ্রীবক্রেশ্বর। নৃত্য ও সৌন্দর্য্যে বক্রেশ্বর অদ্বিতীয়, প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।"

বক্রেশ্বর পণ্ডিত ব্রজের পরিকরগণ মধ্যে কে ছিলেন সে সম্বন্ধে মতান্তর দেখা যায়। যথা গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা,—

ব্যূহস্তূর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বর পণ্ডিতঃ।
কৃষ্ণাবেশজ নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ॥

তুর্য্যব্যূহ অনিরুদ্ধ যিনি ছিলেন তিনিই বক্রেশ্বর পণ্ডিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণাবেশ বশে সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া মহাপ্রভুকে সুখ প্রদান করিতেন। ভক্তমালে আছে,—

ব্যূহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তি শক্তিমান।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত যেঁহো প্রেমের নিধান॥

বৈষ্ণবাচার দর্পণে,—

কৃষ্ণব্যূহ অনিরুদ্ধ আছিল পূর্ব্বকালে।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোঁসাই জানিহ একালে॥

আবার কাহারও কাহারও মতে তিনি শশিরেখা বা তুঙ্গবিদ্যা নাম্নী ব্রজেশ্বরীর সখীর প্রকাশ ছিলেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে একস্থলে অতি সুস্পষ্ট ভাবেই লিখিত হইয়াছে—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর নিজ শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাঁহার করে ভক্তি॥

গৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত এই সুন্দর কান্তি ভক্তটীর চরিত্র আলোচনা করিয়া আজ আমাদের জীবন ধন্য হইবে।

দেবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণব বন্দনায় লিখিত আছে,—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দ দিব্য শরীর!
অভ্যন্তরে কৃষ্ণাবেশ গৌরাঙ্গ বাহির॥

এই সকল আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অংশ ছিল। শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শকাব্দের শেষ ভাগের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর নিকট গুপ্তিপাড়া নামক স্থানই তাঁহার জন্মভূমি ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। এই স্থান তৎকালে একটি খ্যাত নামা ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল। বৈষ্ণবাচার দর্পণ নামক গ্রন্থে চৌষট্টি মহান্তের বর্ণনাকালে একাদশ পর্য্যায়ে মহান্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নাম লিখিত হইয়াছে,—

"অনিরুদ্ধব্যূহ হয় পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য করেন বিস্তর॥
প্রকাশ বিভেদে যাঁর নাম শশিরেখা।
গুপ্তিপাড়ায় বাস শ্রীচৈতন্যের প্রিয়সখা॥"

বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইঁহার পিতামাতার নাম বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। তবে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে তিনি কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অল্প বয়সেই বহু শাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি বেদান্তশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কুলগত উপাধি জানিবার কোন উপায় নাই তবে বেদান্তশাস্ত্রে অতিশয় বিজ্ঞতার জন্যই তিনি সাধারণতঃ পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হইয়া জনসমাজে পরিচিত।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত অবিবাহিত ছিলেন এবং যৌবনে সংসারে থাকিয়া কেবল জ্ঞানচর্চ্চাদি দ্বারা জীবনাতিবাহিত করিতেন। কিন্তু এইরূপ নীরস জ্ঞানচর্চ্চা তাঁহার প্রীতিকর না হওয়াতেই বোধহয় পরিশেষে তিনি শান্তিপুর গমন করিয়া শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর সহিত ভক্তিযোগের আলোচনায়

কালাতিপাত করিতে থাকেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কীর্ত্তনাদি দ্বারা নিজকে নবদ্বীপধামে প্রকাশিত করিলে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া তদীয় পার্ষদরূপে পরিগণিত হন। তিনি নিমাইচাঁদের কনক-কান্তি সায়রে ডুবিয়া আর উঠিতে পারেন নাই। চির জীবনই মহাপ্রভুর সকলরূপ অপেক্ষা নিমাই পণ্ডিতরূপ এবং তাঁহার সকল নাম অপেক্ষা নিমাই নামটী তিনি বড় ভালবাসিতেন। নিমাই পণ্ডিতের মোহনরূপ নবদ্বীপবাসী দুইভাবে দেখিয়াছিল এক সেই কেশব কাশ্মিরীর দর্পচূর্ণকারী অসাধারণ পণ্ডিত, উদ্ধত স্বভাব, নদীয়ার তাৎকালিক ভক্ত বৈষ্ণবগণকে উপহাসকারী—নিমাই পণ্ডিত। আর এক ভাব সেই উদ্ধতের শিরোমণি পড়ুয়া পণ্ডিতগণের মূর্ত্তিমান ত্রাস স্বরূপ নিমাই পণ্ডিত গয়াধামে ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক দীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব-রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। এই পরম বৈষ্ণব নিমাই পণ্ডিত সঙ্কীর্ত্তন-রূপ যে নূতন ভজন প্রণালী প্রচার করিলেন সেই সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে নবদ্বীপবাসী ভাসিয়া গেলেন আর নানা দেশ হইতে নানা ভক্ত আসিয়া এই সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সময়ের সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে অপরাপর ভক্তের সহিত আমরা বক্রেশ্বর পণ্ডিতকেও উপস্থিত দেখিতে পাই। যথা—চৈতন্য ভাগবতে ;—

"শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন॥
নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি মুরারি হিরণ্য হরিদাস॥
গঙ্গাদাস বনমালী বিজয় নন্দন।
জগদানন্দ বুদ্ধিমন্ত খাঁন নারায়ণ॥
কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরুড়াই—।
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥
গোপীনাথ জগদীশ্বর শ্রীমান্ শ্রীধর।
সদাশিব বক্রেশ্বর শ্রীগর্ভ শুক্লাম্বর॥
ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য নাম জানি কত॥"

ক্রমশঃ

ডাঃ শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

আলোচনা

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাইতগণের সম্বন্ধে "পল্লীবাসী" দাঙ্গা-হাঙ্গামা মারপিটের উজুহাতে ৩নং মামলা চলিতেছে বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন। এ সকল হইতে চলিল কি? নবদ্বীপের ঠাকুর বাড়ীর সম্বন্ধে একেই ত ভেট লইয়া নানাজনে নানা কথা বলেন, তার উপর আবার এ সব কি? প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের লীলা-নিকেতন নবদ্বীপধামে এ সকল বিজাতীয় আসুরিক ভাবের লীলা আরম্ভ হইবার কারণ কি? পল্লীবাসী এককথায় তাহার বেশ জবাব দিয়াছেন—"অর্থ পিপাসা।" আমরাও দেখিয়া শুনিয়া সহযোগীর সহিত এ বিষয়ে একমত না হইয়া পারিলাম না।

গত ফাল্গুন মাসে আমরা শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া যে সকল ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে মনে হয় না যে সেই করুণাসিন্ধু প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের লীলাভূমি সেই নবদ্বীপ এই। সহযোগী শেষে বলিয়াছেন—

"শ্রীধামের আচার্য্যসন্তান ও মহান্তগণ সমবেত হইয়া অচিরে এই গৃহবিবাদ শান্ত করিতে সচেষ্ট হউন। দরিদ্র যাত্রীগণের চোখের জলমাখা ভেটের অর্থগুলা শেষে যেন গোয়াড়ীর উকীল মোক্তারদের উদরস্থ করাইয়া জিদ্ বজায় রাখিবার চেষ্টা না হয়। হিতৈষীগণ তাঁহাদের বুঝাইয়া দিন,—যিনি যত বড়ই হউন, সবই শ্রীমহাপ্রভুকে লইয়া। মহাপ্রভুকে ছাড়িলে, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের মূল্য কতটুকু!! যখন স্বতন্ত্র হইলে পাত্র-বিশেষে চারিটী পয়সার যোগ্যতা নাই, তখন যাত্রীদের মনঃপীড়া না দিয়া গ্রামবাসীদের প্রীতি কুড়াইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে শিখাই দরকার। ঠাকুর ভাঙাইয়া যাহাদের খাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে দম্ভ কখনই শোভন নহে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, ছত্রিশ বর্ণ বজাইয়া দুপয়সা নাড়াচাড়া করিতে করিতে গোঁসাই-দের ক্রমেই নবাব খাঞ্জাখাঁয়ের মেজাজ হইতেছে। এদেশে অনেক পেসাদার ভিখারীকেও ভিক্ষালব্ধ চাউল বেচিয়া আবগারীর দোকানে জমা দিতে দেখা যায়। গোস্বামীদেরও অনেককে তেমনি নানা ছলে সংগৃহীত ঠাকুরের নামের পয়সার উপর বড়মানুষী ফলাইতে দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। ইহাতে কিন্তু গোস্বামীদেরই অধঃপতনের চরম হইতেছে। তাঁহারা পরের টাকায় বৃথা গর্ব্বে নিজেদের পরস্পর অপেক্ষা বড় দেখিতেছেন। ফলে এই অনর্থকর

অর্থ ও গর্ব্বের মাত্রা এতই চরমে চড়িয়াছে যে, এক সেবাইত আর এক সেবাইতকে শুধু যে মনে মনে ঘৃণা করা তাহা নহে, প্রকাশ্যভাবে অপমান করা এমন কি প্রহার করার দায়ে পর্য্যন্ত অভিযুক্ত হইয়াছেন।"

হা গৌর ভগবান্। তোমার পবিত্র লীলাভূমে এ সব হইতে চলিল কি? প্রভু! সত্য সত্যই কি তুমি ঘুমাইয়াছ? না তোমার লীলাভূমির আবিলতা ঘুচাইয়া নব নবদ্বীপ গড়িয়া তুলিবার জন্য এ তোমার একটা অপূর্ব্ব লীলা!! শ্রীধামের আচার্য্য সন্তানগণ এ বিষয় কি বলেন?

"মতবাদের কারণ"

সেদিন কোনও প্রভু সন্তানের সহিত নানাবিধ কথার আলোচনা হইতেছে এমন সময় হঠাৎ প্রশ্ন উঠিল "বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এত মতবাদ, এত বিদ্বেষভাব দেখা যায় কেন?" তখন যদিও নানা প্রকারে প্রশ্নটির আলোচনা হইল কিন্তু আমাদের মনে হয় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ ভূষণ দীনতার অভাবেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইতেছে। গৃহী বৈষ্ণবের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাঁহারা ত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহাদের মধ্যেও যেন কেমন কেমন গোলমাল দেখা যায়। বৈষ্ণব অপরাধ হয় এই ভয় মনে আসিয়া সকল সময় সকল কথা বলিবার সুবিধা না হইলেও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই এ সকল দেখিতে পাইতেছেন।

অনেকে বলেন "বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥" কথা সত্য, কিন্তু চক্ষের উপর যদি সমাজের দিনদিন অধঃপতনই পরিলক্ষিত হইতে থাকে তবে কোন কথা না বলিয়াই বা থাকা যায় কি প্রকারে।

আচার্য্যগণ একবাক্যে বলিয়াছেন শাস্ত্র ও সদাচারই বৈষ্ণবতার প্রাণ। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সদাচারের প্রতি অনুরাগীর সংখ্যা যেন খুবই কম বলিয়া বোধ হয়। এটী নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। তারপর যদিও দুই একজন পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সাধ্যমত সদাচার রক্ষা করিয়া চলিতে যান অমনি চারিদিক হইতে তাঁহাদের প্রতি নানারূপ কটাক্ষবাণ বর্ষণ হইতে থাকে। সকলে কিছু নিন্দা-স্তুতি সমান করিয়া লইতে পারে নাই; কাজেই অনেকে ঐ সব কটাক্ষবাণের জ্বালা সহিতে না পারিয়া সদাচার ত্যাগ করিয়া বসে। সমাজের হিতকামীগণ এ সব বিষয় সন্ধান রাখেন কি না জানি না। এক যদি বোঝা যায় সম্প্রদায়

প্রাণ হীন, তাহা হইলে আর কোন কিছু বলিবার থাকে না কিন্তু তাহাও ত নয়? সমাজের এই অবস্থার আশু পরিবর্ত্তন দরকার।

বিষকুম্ভ পয়োমুখের ন্যায় অন্তরে অভিমান, অহঙ্কার, কপটতা প্রভৃতি রাখিয়া কপটদৈন্যের আবরণ দিয়া হয়ত লোক ঠকাইতে পারা যায় কিন্তু যার সন্তোষে জগত সন্তোষ যার কৃপা কটাক্ষপাতের জন্য এত সাধন ভজন তিনি কি ঐ কপটভাবে সন্তুষ্ট হইবেন? কখনই নয়। যতদিন না সমাজে নিষ্কিঞ্চন নিরভিমান সদাচার পরায়ণ বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ততদিন সমাজের মঙ্গল নাই—নাই—নাই।

"আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।"

এই যে মহাবাক্য এইটী পালন করিতে হইবে। নচেৎ শুধু প্রবন্ধ লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম প্রচার হইবে না। আচারের দ্বারা যে প্রচার খুব ভাল হয় একথা প্রমাণের জন্য বেশীদূর যাইতে হইবে না। যাহাকে লইয়া বৈষ্ণব সমাজ আজ গর্ব্ব করে সেই কলিযুগ পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি করিয়াছেন? নিজে আচরণ করিয়া লোককে শিখাইয়াছেন। তাই তাঁহার প্রচারে কাজ হইয়াছে। আর আজকাল নিজে আচরণশীল না হইয়া শুধু মুখে প্রচার করায় প্রচার তত কার্য্যকরী হইতেছে না। একজন আচারবান আদর্শ সম্মুখে ধরিলে শুধু তাহার দর্শনে যে কাজ হয় শত বৎসর চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইলেও তাহা হয় কি না সন্দেহ।

বহুবার আমরা প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে বহু কথাবার্ত্তা বলিয়াছি, পুরী গোস্বামী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালাইয়া গিয়াছিলেন কে না জানেন। কিন্তু কাল মাহাত্ম্য কি জানিনা বৈষ্ণব আজ দীনতা ভুলিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এরূপ ভাবের লোক শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না। আচার্য্যগণের মধ্যে প্রচারকগণের মধ্যে এই যে নানা প্রকার মতভেদ দলাদলি আমাদের বিশ্বাস ইহার মূলেও ঐ দারুণ প্রতিষ্ঠা লুকান আছে। দেশ আদর্শ চায়। আচার্য্যগণ—ভুবন পাবন বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ চরিত্র মহিমায় দেশ বাসীর পিপাসা নিবারণ করুন আবার সম্প্রদায়ের] মধ্যে সেই প্রেমের অমীয় ধারা প্রবাহিত হইয়া আচণ্ডালের প্রাণে শান্তি স্থাপন করুক। গৌরাঙ্গসুন্দর কৃপা করুন।

ভক্তি

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

[২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩১ সাল]

প্রার্থনা-সঙ্গীত

লও হে তুলিয়া পরাণ গৌর অভয় চরণ তলে।
চির অপরাধি ঘৃণ্য তুচ্ছ ভাসিছি নয়ন জলে॥
কলুষিত প্রাণে মলিন বসনে,
তোমার নিকটে যাইব কেমনে,
লও মোরে ডাকি নিজগুণে
আপন কিঙ্কর ব'লে॥
তুলিয়া কুসুম প্রভাত হইতে,
তুলসীর দল মিশায়ে তাহাতে,
যতনে গেঁথেছি মালা নিজ হাতে
তোমারে পরাব ব'লে;—
সে বাসনা মোর হয়নি পূরণ,
সে মালা ত তুমি করনি গ্রহণ,
বাসি হ'য়ে পড়ে র'য়েছে এখন
দীনের কুটীর তলে॥
(গৌর) সুপ্ত-চিত্ত কখন কি জাগে
তুমি যদি নাহি জাগাও তাকে,
তোমার করুণা- জলদ হইতে
ভাষাও প্রেমের জলে॥

সাধু সাবধান !

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রচারিত পবিত্রধর্ম্ম যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে দেশের একশ্রেণীর 'সুবিধাবাদী' তাহা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু, যেহেতু তাঁহারা 'সুবিধাবাদী,' সেইহেতু এই ধর্ম্মেরও একটা সুবিধ লইয়া তাঁহারা আপনাদের মৎলব হাঁসিল করিবার জন্য চেষ্টায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না।

'সুবিধাবাদী' অর্থে আমরা তাঁহাদিগকেই বুঝি, যাঁহারা সুবিধা অনুসারে কখনও বা হিন্দুয়ানীর কোন কোন ব্যবস্থা মানেন, আবার কখনও বা তাহা মানেন না। ছেলের বিবাহের সময় যাঁহারা কৌলীন্য মানেন, মেয়ের বেলা মানেন না, খরচের আশঙ্কায় যাঁহারা শ্রাদ্ধ শান্তি অপব্যয় বলিয়া উড়াইয়া দেন, অথচ পাওনার বেলা "এয়ো" সংক্রান্তীর ব্রতে বাড়ীর মেয়েদের আগে পাঠাইয়া দেন, হত্যাকায় নানা প্রকারে যাঁহারা প্রসিদ্ধ হইতেছেন, তাঁহাদিগকেই সাধারণে সুবিধাবাদী' বলিয়া বুঝিয়াছে।

ইহাঁরা রাজনৈতিক সভাসমিতিতে হিন্দুমুসলমানের একতা স্বীকার করেন, খাদ্যাখাদ্যে বর্ণভেদ মানেন না, অথচ স্বজাতি কুটুম্বভোজনে ইহাঁরাই সর্ব্বাগ্রে মর্য্যাদার দাবী করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। নিজেদের বিধবাবিবাহে প্রবৃত্তি না থাকিলেও, অপরকে বিধবাবিবাহ করিতে ইহাঁরা পরামর্শ দেন। সর্ব্বোপরি নিজেরা বামুনাই ফলাইবার আঠার আনা বহর দেখাইয়াও, ইহাঁরা ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা সমাজ হইতে উন্মূলিত করিতে বদ্ধপরিকর। এতাদৃশ অদ্ভুত জীবগণই সম্প্রতি নাওয়ারিশ দেখিয়া ধর্ম্ম ব্যাপারে নিজেদের সুবিধাবাদ চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালীর ধর্ম্মপ্রাণ জনসাধারণ কতকটা সরল-বিশ্বাসী। যে কোন ব্যক্তি যে কোন ছলে দুইটা কৃষ্ণ-কথা কহিলেই উহারা গলিয়া যায়। মনে করে, যাঁহার মুখ হইতে অমন সব "জ্ঞানের কথা" বাহির হয়, নিশ্চয়ই তিনি ধার্ম্মিক ও হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ অনুরাগী। সুবিধাবাদিগণ ধর্ম্ম ভীরু জনসাধারণের এতাদৃশ মনস্তত্ব বুঝিয়া ক্রমশঃ তাই নিজেদের মনোমত করিয়া ধর্ম্ম কথা শুনাইতে সুরু করিয়া দেন। দেশে শ্রীগৌরধর্ম্মের বিস্তার দেখিয়া উহাদেরই অনেকে এখন

ছদ্মবেশে গৌড়ীয়-সমাজেও প্রবেশ করিয়াছেন। প্রবেশ করিয়া যদি প্রকৃত গৌরভক্তের মত উজ্জ্বল জীবন যাপন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ত আর কথাই থাকিত না। কিন্তু, তাহা ত নহে। নিরীহ বৈষ্ণব সমাজে ঢুকিয়া তাহাদেরই একজন। দরদী সাজিয়া ইহারা ধীরে ধীরে আত্মমত জাহির করিতেছেন বলিয়াই ত আজ প্রকৃত বৈষ্ণবগণের এত আশঙ্কা।

শ্রীরঘুনাথের মত কঠোর বৈরাগ্য, শ্রীসনাতনের মত বিনয়—দৈন্য, শ্রীহরিদাসের মত নামনিষ্ঠতা,—এ সকল যাজন করা ত আর সুবিধাবাদীদের লক্ষ্য নয়! 'যেন তেন প্রকারেণ' দলে মিশিয়া নিজেদের মনোমত ভাবে সমাজটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা ওলোট্ পালোট্ করিবার জন্য স্থানে স্থানে এমন কি সভা-সমিতিতেও এখন রটান হইতেছে যে, "শ্রীমন্ মহাপ্রভু আশ্রম ধর্ম্ম মানিতেন না, তিনি ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে এক করিয়া গিয়াছেন, এমন কি যবনকে পর্য্যন্ত তিনি এক সঙ্গে ভিড়াইয়া লইয়াছিলেন।" একথা এক হিসাবে সবই সত্য, কিন্তু বাবুরা যে হিসাবে একথাগুলির অবতারণা করিতেছেন, সে হিসাবে উহা কিন্তু আদৌ ঠিক নহে। প্রভু নামনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত সম্বন্ধে জাতিবুদ্ধি করিতে মানা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধ ওলোট্ পালোট্ করিবার জন্য নহে। শুদ্ধ ভক্ত মহিমা প্রকটিত করিবার জন্যই অদ্বৈত প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধ পাত্র ভোজন করাইয়াছিলেন। নতুবা—কি মহাপ্রভু, আর কি তাঁহার পরিকরগণ—কেহই কুত্রাপি শাস্ত্র ও সদাচারের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করেন নাই। প্রভুর পরমভক্ত পরম পণ্ডিত গ্রন্থকারগণও ত এমন কথা কুত্রাপি লিখিয়া যান নাই। কিন্তু তা না লিখিয়া যাইলে কি হইবে? 'সুবিধা-বাদীদের' যে, গরজ বড় বালাই!! ইহারা নিজেরাও যেমন শাস্ত্র সদাচার মানে না, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকেও সেইরূপ নিজেদের মতন খাড়া করিতে না পারিলে নিশ্চিন্ত হয় কৈ! উহারা তাই মহাপ্রভুকে এই ভাবে চিত্রিত করিয়া আপনাদিগকে আদর্শ ভক্তরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য নানা প্রকারেই এখন চাল চালিয়া বেড়াইতেছে। পত্রে প্রবন্ধে ব্যাখ্যায় বক্তৃতায় এই ভাবেরই আলোচনা শুনা যাইতেছে। স্থানে স্থানে উহারা এক রকম দলও কতকটা বাঁধিতে পারিয়াছে। তবে 'সুবিধাবাদীরা' নাকি সবাই স্ব স্ব প্রধান, কাজেই উহাদের দলও স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। একদলের সহিত আর একদলের অর্দ্ধাংশে মিল নাই, মাত্র একটা জায়গায় উহারা মিলনের কেন্দ্র স্থির করিয়াছে; সেটা হইতেছে—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা।

একনিষ্ঠ গৌরভক্তগণ ! এই সকল কপটীর নিকট হইতে সাবধান হউন। মনে রাখিবেন, প্রভু আমার আচারে প্রচারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়াও বেদ প্রণিহিত হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিধি নিষেধ উল্লঙ্ঘন করেন নাই। 'সুবিধাবাদীরা' এখন যে সব লাক্ষণিক ব্যাখ্যার শাস্ত্র পাল্টাইতে চায়, প্রভু তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন ;—

"স্বতঃপ্রামাণ বেদ—প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণতা হয় হানি ॥"

বেদ প্রণিহিত সনাতনধর্ম্মে যাহার ভিত্তি, সেই পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া কেহ যেন সুবিধাবাদীদের কথায় মজিয়া নাস্তিক হইও না ভাই! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিও না। (পল্লীবাসী)

শ্রীবৃন্দাদেবীর কপট তিরস্কার

(পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা লিখিত)

আসিয়া কহিল বৃন্দা।
"কি কহিব রাই, যবে যথা যাই,
তথা শুনি তব নিন্দা ॥
কি হ'ল কি হবে, আমি কি কহিব,
দুধের বালিকা তুমি।
এখনি তোমার কুনাম-ধুমায়
আঁধার বরজ ভূমি ॥
কানায়ার নামে, পাগলী হইলে,
কি গুণ দেখিলে তায় ?
রূপে অমানিশা লাজ পায় ; কাজে
গোধন চরায়ে খায় ॥
গোপালন বিনা কি কাজ সে জানে,
গোপালই সকলই জানে।

গোপালক যত, তার অনুগত,
গোলক বিনা কি মানে ॥
দেখিতে বালক, কাজে তিন লোক
সমাচার সেই রাখে।
(পারে) ব্রহ্মাকে শিখাতে, ইন্দ্রকে তাড়াতে
তুলনা না মিলে নাথে ॥
শিশুটীর মত দেখিলে কি হয়,
টনক জ্ঞানের নাড়ী।
যেখানে যা ঘটে সব তার জানা,
ফাক নাহি কোন বাড়ী ॥
নাহি কোন গুণ, তবু তিন গুণ
উপরে সতত থাকে।
একটা বালকে, গোকুল মজালে,
কেহ না আটিল তাকে ॥
পুতনা বধিল, কালীয় দমিল,
পাহাড় ধরিল করে!
সে নহে মানুষ, শুন বিনোদিনী
দেবেও তাহাকে ডরে ॥
ছাড়হ তাহার আশ।
তাহাকে ভজিয়ে, সাধ না মিটিবে,
ঘটিবে সরবনাশ ॥
শঠের ঠাকুর, কত মায়া জানে,
ভুলাইতে নর নারী।
তোমার সাহসে, কি ঘটিবে পরে
কিছুই বুঝিতে নারি ॥
কি মোহন বাণ, মরমে হানিয়া,
হইলে আপন হারা।
ভাবনা আগুনে, রসে ভরা তনু,
শুকায়ে হইল সারা ॥

সখর রাধে, সময় থাকিতে,
ভুলহ তাহার নাম।
সে নহে প্রেমের মানুষ কভুও,
মিঠা না মাটীর আম॥
এত ছল, এত কৌশল যাহার
কভু সে রসিক নয়।
ছলের কুহকে করিওনা প্রাণ,
যাচিয়া গরল ময়॥
লোহের শিকল কাটে॥
হেন বন্ধ টিয়া বাঁধিতে সূতায়
বাঁধন কভু না খাটে॥"
উত্তরে কহিল রাই।
"আমার নয়নে এ তিন ভুবনে
তাঁহার তুলনা নাই।
রূপে ফুল্ল নীল ইন্দীবর নিন্দে,
গুণে সর্ব্ব গুণময়,
রসে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্যাম,
দ্বিতীয় কে তাঁর হয়?
শঠে সে নিঠুর, সতের ঠাকুর,
আপনে আপন হয়।"
ভুলুয়াও কহে "যেখানে যেমন,
সেখানে তেমন রয়॥"

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ শান্তি

একদিন চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। তাহারা প্রত্যেকেই বলিতে লাগিল—আমি শ্রেষ্ঠ। অনেক তর্ক বিতর্কেও

কোন মীমাংসা হইল না, শেষে সকলে মিলিয়া প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে আপনি বলিয়া দিন।" প্রজাপতি সকলের প্রতি আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমদৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি।" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে শরীর ত্যাগ করিলে ঐ শরীর পাপিষ্ঠতর অর্থাৎ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় সে-ই শ্রেষ্ঠ জানিবে।

প্রজাপতির কথা শুনিয়া তখন বাগিন্দ্রিয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া গেল। বৎসরান্তে আসিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিল "আমার অভাবে তোমরা কিভাবে জীবিত থাকিলে বল।" তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ বলিল—"মূক-ব্যক্তিরা যেরূপ কথা বলিতে না পারিয়াও প্রাণেরদ্বারা শ্বাসক্রিয়া করে চক্ষু-দ্বারা দর্শন করে, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধ্যান করে আমরাও তদ্রূপ তোমার অভাবে জীবিত ছিলাম।" এই কথা শুনিয়া বাগিন্দ্রিয় বলিল তবে আর আমি শ্রেষ্ঠ নয়, কারণ আমার অভাবে ত শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হয় নাই! এই বলিয়া বাগিন্দ্রিয় পূর্ব্ববৎ শরীরে প্রবেশ করিল। এইবার দর্শনেন্দ্রিয়ের পালা পড়িল। বাগিন্দ্রিয়ের মত দর্শনেন্দ্রিয়ও দেহ ত্যাগ করিল এবং বৎসরান্তে আসিয়া অন্যান্য সকলকে জিজ্ঞাসা করিল "আমার অভাবে তোমরা কিভাবে জীবিত ছিলে বল।" তখন সকলে বলিল—"অন্ধব্যক্তি যেমন দর্শন না করিয়াও প্রাণদ্বারা শ্বাসক্রিয়া করে, বাগেন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলে, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করে ও মনের দ্বারা ধ্যান করে আমারাও সেইরূপ করিয়া জীবিত আছি এই কথা শুনিয়া দর্শনেন্দ্রিয় ও নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অক্ষম হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল।

এইবার শ্রবণেন্দ্রিয় গর্ব্বভরে দেহত্যাগ করিল। মনে করিল এবার সকলেই জব্দ হইবে। বৎসরান্তে তাড়াতাড়ি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এবার তোমরা কেমন ছিলে? আমার অভাবে তোমরা কিছুই করিতে পার নাই ত?" শ্রবণেন্দ্রিয়ের কথা শুনিয়া সকলে হাস্য করিয়া বলিল বধির ব্যক্তি যেমন শ্রবণ শক্তি হীন হইয়াও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদন করে আমরাও সেই ভাবেই একবৎসর কাল করিয়াছি তোমার অভাবে এক শ্রবণ শক্তির অভাব ভিন্ন অন্য কোন অভাবই বোধ করি নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় এসকল শুনিয়া লজ্জিতভাবে স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিল।

এইবার মন ও প্রাণ বাকী, কে আগে যায় আর কে পরে যায় এই লইয়া খুব তর্ক চলিল তারপর মীমাংসা হইল যে, মন আগে যাইবে প্রাণ সর্ব্বশেষে যাইবে। সিদ্ধান্তানুসারে মন পূর্ব্ববৎ দেহ ত্যাগ করিল। এবার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হে, তোমরা আছ?" উত্তরে সকলে বলিল আছি বৈকি? তোমার অভাবে আমাদের কোন কার্য্যেরই ব্যাঘাত হয় নাই। শিশুরা যেরূপ ধ্যানাদি শক্তি বিরহিত হইয়া শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করে আমরাও তদ্রূপ করিয়াছি। তোমার অভাবে শরীর অকর্ম্মণ্য হয় নাই। মন তখন স্ব স্থানে গমন করিল। এইবার সর্ব্বশেষে প্রাণ। প্রাণ তখন ধীরভাবে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল তোমরা সকলেই নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্ম পরীক্ষা দিয়াছ দুর্ভাগ্য বশতঃ কেহই উত্তীর্ণ হইতে পার নাই, যাহা হউক এইবার আমি আমার পরীক্ষা দিব। এই বলিয়া প্রাণ যেমন দেহত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিল অমনি তেজস্বী অশ্ব যেমন কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়া পদ-বন্ধন-কীল অর্থাৎ খোঁটা উৎপাটিত করে সেইরূপ প্রাণত্যাগের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইল—তখনও দেহ হইতে প্রাণত্যাগ হয় নাই—অমনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ভীত হইয়া প্রাণ সমীপে আগমন করিয়া বলিতে লাগিল—

"ভগবন্নোধি ত্বনঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি।" অর্থাৎ হে প্রভো! তুমি আমাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি স্বীয় স্থানে থাক। তুমি দেহ পরিত্যাগ করিলে আমরা সকলেই অকর্ম্মণ্য হইব। বাগিন্দ্রিয় বলিল আমি যে "বসিষ্ঠ" অর্থাৎ জগতের আবরণ স্বরূপ সে তোমারই জন্য। শ্রবণেন্দ্রিয় বলিল আমি যে "সম্পৎ" অর্থাৎ জগতের ধনস্বরূপ সে তোমারই জন্য। দর্শনেন্দ্রিয় বলিল আমি যে জগতে "প্রতিষ্ঠা" সে তোমরই জন্য। মন বলিল আমি যে জগতে "আয়তন" সে তোমারই জন্য।

এইভাবে সর্ব্ববাদী সম্মত প্রাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় প্রাণ সকলকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা সকলেই যদি আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলে তবে এইবার আমার অন্ন কি হইবে বল। প্রাণের কথা শুনিয়া ইন্দ্রিয়গণ বলিল জীবমাত্রই যাহা আহার করিয়া থাকে তাহাই আপনার অন্ন হইবে। প্রাণ বলিল আমার বাস বা পরিচ্ছদ কি হইবে। তাহারা বলিল জলই আপনার বাস হইবে। তখন সকলকে ধন্যবাদ দিয়া

প্রাণকে শ্রেষ্ঠ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ তাহার অধীনে অবস্থান করিতে লাগিল।

ভক্ষ্যবস্তুমাত্রেই প্রাণের অন্ন। এই শরীরের যাবৎ চেষ্টাই প্রাণের এই জন্য প্রাণকে অন্ন বলা হয়। আর জল যে প্রাণের বল তাহা সাধারণতঃ যে লোকে আহারের পূর্ব্বে ও আহারের পরে জল পান করে ইহা হইতেই সহজে বোঝা যায়। ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ মিটিল একবার প্রাণ ভরিয়া পাঠকগণ গৌর-হরি বলিয়া প্রাণের জয় দিন।

কর্ম্মযোগ

বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের সৃষ্ট এই সংসারে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তৎসমুদায়ই কর্ম্ম। শ্রীভগবান যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীগীতায় দেখিতে পাওয়া যায়—"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।" কি জড় জগৎ কি প্রাণীজগৎ সকলেই ক্রিয়াশীল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলেই কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছেই। গীতায় যে "অকর্ম্ম কথার উল্লেখ আছে উহা আমাদের অনমুষ্ঠেয় কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়।" বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া নিজের পুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিগণকে ফল পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিতেছে। নিম্নশ্রেণীর স্থলচর, খেচর বা জলচর প্রাণী হইতে হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানুষ পর্য্যন্ত কেহই কোন সময়ে একেবারে নিষ্কর্ম্মা নহে। শ্রীভগবান নিজ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

প্রকৃতি সম্ভূত গুণ সকল অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ নিশ্চয়ই সকলকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। এই ক্রিয়া সূত্র দ্বারা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আবদ্ধ। বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে আমরা তাহার সম্ভোগে পরিতৃপ্ত; আবার আমাদের প্রশ্বাস বায়ু বৃক্ষের প্রাণ সঞ্জীবনকারী।

কর্ম্মফল সূত্রকেও এই নিয়ম সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। ধনীর সুখ ভোগাস্বাদ দরিদ্রের দুঃখরাশির সম্মুখে। আবার দরিদ্র তাহার সম্মুখে ভোগীর সুখচিত্র যদি দেখিতে না পাইত তবে সে নিজেকে দীন মনে করিতে পারিত না। এখানেও উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী। এইরূপ ভগবানের সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থই প্রত্যেকের কর্ম্মদ্বারা প্রত্যেকের প্রতি আবদ্ধ। এ বন্ধন দুঃখের কারণ নয়, ইহা বিশ্বস্রষ্টার এক অপূর্ব্ব লীলা, এ বন্ধন না থাকিলে সৃষ্টি চলে না, ইহা প্রেমময়ের প্রেমের বন্ধন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বেই অনুষ্ঠেয় ও অননুষ্ঠেয় এই দুইটী কথা বলিয়াছি এক্ষণে এই বিষয়টী একটু খুলিয়া বলি। কর্ম্ম দুই প্রকার—(১) অনুষ্ঠেয় অথবা কর্ত্তব্য (২) অননুষ্ঠেয় অথবা অকর্ত্তব্য। যে কর্ম্ম সাধনে শ্রীভগবানে আমাদিগের চিত্তাভি নিবেশ হয় তাহাই কর্ম্মযোগ। সুতরাং এখন হইতে আমরা কর্ম্ম বলিলে পাঠকগণ অনুষ্ঠেয় কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্মই বুঝিবেন। যেভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভগবানের সহিত জীবের মিলন সংঘটন হয় ক্রমে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে আমরা প্রসঙ্গাধীন দু' একটী প্রশ্নের সংক্ষেপে আলোচনা করি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, "যে কর্ম্মসাধনে শ্রীভগবানে আমাদিগের চিত্তাভিনিবেশ হয় তাহা কর্ম্ম যোগ।" বেশ—এখন এখানে প্রশ্ন তোলা যাক, সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবান একা ছিলেন তারপর এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ভগবানের এমন ইচ্ছা হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র এই দেওয়া যায় যে, তিনি লীলাময়, লীলা করিতে তিনি বড়ই ভালবাসেন। কিন্তু এই লীলা ত একা হয় না! কাজেই তিনি সত্যসঙ্কল্প মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—"অহমেব বহুঃ স্যাম্, অহমেব প্রজায়েয়।" অর্থাৎ আমিই বহু হইব, আমিই প্রজা হইব, হইয়া নিজেকে নিজে উপভোগ করিব। একটা উদাহরণ দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজাধিরাজ হইয়া পরমানন্দে মনোহর সুসজ্জিত গৃহে সুবর্ণ পালঙ্কে অর্দ্ধ শায়িত ভাবে বিশ্রাম করিতেছেন। সুসজ্জিত গৃহের ভিত্তিতে ব্রজের মুরলীধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। দ্বারকাধিপতি নিজের নটবর মোহন মূরতি অবলোকন করিয়া শ্রীমতী হইয়া সেই মধুর রূপ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কেন করিলেন যদি প্রশ্ন করেন আমরা বলব তিনি রসিকশেখর লীলাময় এমনি লীলাকরাই যে তাহার স্বভাব। তিনি লীলাময়, আমরা তাঁহার লীলার সামগ্রী আর এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার লীলাক্ষেত্র।

এই লীলার ভিতর অনেক রহস্য আছে। একদিকে কর্ম্মীর কর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানীর জ্ঞান চর্চ্চা ও ভক্তের কৃষ্ণানুশীলন; অন্যদিকে সাধু চরিত্রের ধর্ম্মযুদ্ধ, নাস্তিকের ঈশ্বর বিদ্বেষিতা ও পাপীর শাস্তি। সকল রহস্যেরই উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের সহিত মিলন, কেননা লীলার প্রধান অঙ্গই যে, বিরহ ও মিলন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই লীলারহস্যের অতিগুহ্য তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেইভাবে বিভাবিত হইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে না শিখিব ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমাদের দুর্দ্দশা। একজন বহু মূল্য সুন্দর অট্টালিকায় সুসজ্জিত ত্রিতলোপরি বহু দাস দাসী পরিবেষ্টিত আর একজন জীর্ণ পর্ণ কুটীরে দরিদ্রতা লাঞ্ছিত, নিদাঘ প্রপীড়িত ক্ষেত্র হইতে আগত পরিশ্রম কাতর বুভুক্ষু কৃষক। বিচার করিয়া দেখিলে দেখিব দুই জনই অভাবের দাস। লীলা ক্ষেত্রে কি করিতে আসিয়াছি কি করিতেছি তাহা যদি বুঝিতে পারি তাহা হইলে আর এদুর্দ্দশা বেশী দিন ভোগ হয় না, আমরা তাহা করিনা তাই এত দুঃখ। আর ভক্ত সংসারক্ষেত্রে তাহার একমাত্র অভীষ্ট ভগবানকে মনে করে, তাই সে জগতের সামান্য ধন, জন, যশ, মান, প্রার্থী হয় না; সে চায় তার প্রাণের প্রাণ ভগবানকে।

কর্ম্মী হউক, জ্ঞানী হউক, অতি পাষণ্ড কেন হউক না, সকলেরই অভীষ্ট সেই রসিক শেখর শ্রীভগবান। কিন্তু সকলে এক ভাবের নয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সাধক। তবে একটা জিনিস সকলেরই ভাবিবার বিষয় যে, কোন্ বস্তু আমাদের প্রকৃত প্রাপ্য কোন্‌টী আমাদের অভীষ্ট তাহা যদি স্থির নিশ্চয় করিয়া লওয়া যায় তাহাহইলে আর প্রাপ্য বস্তু বোধে প্রারব্ধ বস্তুর সম্ভোগে রত হইতে হয় না। যথার্থ যাহা প্রাপ্য তাহা লাভ করিয়া চিরকালের জন্য পরম শান্তি লাভে ধন্য হওয়া যায়। যথার্থ যে শ্রীভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে সে সুখ চায় না, দুঃখ চায় না, ধন চায় না বন্ধু চায় না। সে চায় কেবল ভগবানকে। কি করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়, কি করিয়া তাঁহার চরণে মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারা যায় এইটীই হয় তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা।

সুদুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভার্থে অতিবাহিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার মনোবৃত্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে তিন প্রকার ঋণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন—

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥

ঋষি ঋণ পরিশোধের প্রশস্ত সময় পাঠ্যাবস্থা। আজকাল যেরূপ শিক্ষার গতি তাহাতে ইহা একটী অপ্রীতিপ্রদ ব্যাপার মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু যাঁহারা ভিক্ষা লব্ধ ধনে বা বনজাত সামান্য ফলমূল আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে বা গিরিগুহায় বাস করিয়া নিজ সাধন লব্ধ অমূল্য সম্পত্তি লেখনী মুখে আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন আমরা একবার তাহা আলোচনা করিয়া কি তাঁহাদিগের সে শ্রম সার্থক করিব না? যে অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডার হইতে আজ শত সহস্র বৎসর ধরিয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধন গৃহীত হইয়া আসিয়াও তাহা নিঃশেষিত না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে আমরা কি একবারও তাহার সন্ধান করিব না। পক্ষান্তরে ঋষি ঋণ শোধ করিতে যাইয়া আমরা নিজেরাই কৃতার্থ হইব। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের গবেষণা পূর্ণ শাস্ত্রাদি পাঠে আমাদেরই চিত্তের মলিনতা দূর হইবে, জ্ঞানের সুনির্ম্মল শুভ্র জ্যোতিঃ আমাদেরই অন্ধকার হৃদয় উদ্ভাষিত করিবে।

এই ভাবে শাস্ত্রাদি পাঠে পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম হইতে হইতে ক্রমে যৌবন কাল উপনীত হইলে আমাদের মনোবৃত্তিগুলি বিকসিত হইতে থাকিবে। এই সময় শ্রীভগবান এক নূতন ভঙ্গিতে আমাদের লইয়া লীলা আরম্ভ করেন। একদিকে বিষয়ের তীব্র প্রলোভন অন্যদিকে রসিক শেখরের সুমধুর বংশীধ্বনি। যাঁহারা বিবেক সম্পন্ন অর্থাৎ পাঠ্যাবস্থায় গুরু গৃহে থাকিয়া চিত্ত সংযমাদি অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারা বিষয়ের প্রলোভনে না পড়িয়া প্রাণবল্লভের বংশী-ধ্বনিতেই আকৃষ্ট হন; আর যাঁহারা আমার মত অবিবেকী তাঁহারাই হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া বংশীধ্বনি না শুনিয়া বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া জীবনকে বিষময় করিয়া তোলেন। তাঁহাদের জন্যই শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন—

চতুর্থ মায়ুষোভাগ মুষিত্বাদ্য গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয় মায়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥

এই সকল নিয়ম বিপর্য্যয় হয় বলিয়াই আমাদের আজ এত অবনতি, এত দুরবস্থা। মনোবৃত্তিগুলির পূর্ণতা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই সংসারে কোন কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি এবং আমাদের অভীষ্ট বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা গেল যে, যৌবন কালই সাধনার উপযুক্ত সময় আর এই সাধনই আমাদিগকে একমাত্র সেই পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর করিতে পারে। যৌবন কালে আমরা

যে যে বৃত্তির অনুসরণ করিব মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই সেই বৃত্তি আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে। সুতরাং সাধক যুবক! এই সময় প্রাণের গভীর অনুরাগ ও হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পূর্ণ ভাব লইয়া শ্রীগুরু পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ মত সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে যত্নবান হও।

ক্রমশঃ

শ্রীসদানন্দ শর্ম্মা

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম

(৩)

রামরায় স্বয়ং এই রাগমার্গে ভজনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবিষয়ে আমরা পরে দেবদাসী বৃত্তান্তে জানিতে পারিব।

এই সকল আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম ও উহার সাধন প্রণালী শ্রীল রামরায় কর্ত্তৃকই জগতে প্রকটিত হইয়াছে। মহাপ্রভু জীবের হিতের জন্য ছলে আপনি শ্রোতা হইয়া দেবতাগণেরও দুর্লভ এই সাধনতত্ত্ব রামরায়ের দ্বারা প্রকাশ করিলেন। প্রভু ও রামরায় সেই বিপ্র কুটীরে রজনীর পর রজনী বিনিদ্র ভাবে কাটাইয়া এই সাধন-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। অবশেষে রায় মহাশয় বিশেষ দৈন্যের সহিত বলিলেন, প্রভো! আমার ন্যায় অধমকে কৃপা করিয়া কৃতার্থ করিতেই যখন এখানে আগমন, তখন দিন দশ দয়া করিয়া এখানে থাকিতে হইবে এবং থাকিয়া আমার এই দুষ্ট চিত্তের শোধন করিয়া দিতে হইবে। আর প্রভু, বেশ বুঝিতেছি তুমি ভিন্ন আমাকে আর কেহ কৃষ্ণ প্রেম দিতে সমর্থ নহে।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক মহাভাগ্যবান রামরায়ের ভাগ্যের কথা আমরা আর কি আলোচনা করিয়া জানাইব। স্বয়ং শ্রীগৌরভগবান যাঁহার সঙ্গ পরম লোভনীয় বোধে বলিতেছেন,—

"দশ দিনের কা কথা, যাবত আমি জীব।
তাবত তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥"

তাহার পর মহাপ্রভু স্বীয় মনোভাব খোলসা করিয়া জানাইলেন, বলিলেন—

"নীলাচলে তুমি আমি রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥"

রামরায় জনক ঋষির মত বিষয়ী হইয়াও বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন তাঁহার চিত্ত পরম বৈরাগ্য পূর্ণ থাকিয়া শ্রীরাধা মাধবের প্রেম সাগরে নিয়ত নিমজ্জিত থাকিত। এমন প্রিয়তম ভক্তের সঙ্গ-সুখ যে মহাপ্রভুর চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

যাহাহউক, মহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের তুষ্টি বিধানার্থ আরও কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারাংশ মাত্র সংক্ষেপে একত্র করিয়া দেওয়া হইল।

"যে বিদ্যা দ্বারা কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ। যিনি কৃষ্ণ ভক্ত তিনিই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। যাঁহার শ্রীশ্রীরাধামাধবের সঙ্গে চিত্ত স্থির হইয়াছে তিনিই পরম সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। যাঁহার জীবনে কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ লাভ হয় নাই তাঁহার তুল্য দুঃখী আর কে থাকিতে পারে? যে গীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম কেলি বর্ণিত হইয়াছে তাহাই জীবের ধর্ম্ম। "কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ লাভ করাই জীবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ। জীবের স্মরণীয় শ্রীভগবানের নাম গুণ লীলাদি, ধ্যানের বস্তু তাঁহার পাদ পদ্ম, শ্রবণ-যোগ্য তাঁহার লীলা কাহিনী এবং উপাস্য যুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি-বাঞ্ছাকারী ভক্তগণের গতিই শ্রেষ্ঠ, কারণ মুক্তাত্মা স্থাবরদেহের ন্যায় কিন্তু ভক্তের আত্মার গতি দেব দেহাবস্থিত অ আর পূর্ণানন্দ ভোগে সমর্থ। এই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন,—

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥"

এই রসামৃত-সিন্ধু মন্থন করিয়া শ্রীল রামরায়ের চিত্ত ভরিয়া একটী প্রশ্ন জাগিল, তিনি বলিলেন "প্রভো এই যে কয়েক দিবস ধরিয়া আমার মুখ দিয়া তত্ত্ব কথায় প্রস্রবণ বিনির্গত হইল তাহা আপনিই কৃপা করিয়া এই অধমের চিত্ত ক্ষেত্রে স্ফুরণ করিয়া দিয়াছেন। যে সমস্ত গুহ্যাতি গুহ্য নিগূঢ় কথা

আমি জানিতাম না এবং কোনদিন চিন্তাও করি নাই তাহাই আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আপনি জগতে প্রকটিত করিলেন। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনার ঐ কমনীয় মূর্ত্তি প্রতি নিয়ত আমার চিত্তক্ষেত্রে সজাগ থাকিয়া একটী সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে। এক্ষণে কৃপা করিয়া সেই সন্দেহটী নিরসন করিয়া দিউন। আমার সন্দেহ আর কিছু নয়—

"পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌর কান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি বংশী বদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন॥
এই মত দেখি তোমা হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥"

এই সন্দেহ কিরূপে ভাগ্যবান রামরায়ের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল তাহা একটু বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি।

রামরায় ধ্যানে শ্রীরাধা কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি ধ্যানে বসিলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ তাঁহাদের ব্রজের পরিকরগণের সহিত তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আসিয়া অধিষ্ঠিত হয়েন, এইরূপ প্রত্যহ হয়। কিন্তু এবার একদিন এক অপূর্ব্ব ব্যাপার হইল রামরায় দেখিলেন— ধ্যানে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়া আবার লুক্কায়িত হইলেন তখন তিনি বড়ই কাতর হইয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন আবার তাঁহারা আবির্ভূত হইলেন কিন্তু ক্রমশঃ একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঙ্গে শনৈঃ শনৈঃ প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সেই উভয় মূর্ত্তির সমবায়ে এক অপূর্ব্ব গৌরমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর চিত্র ফুটিয়া উঠিল— আবার একি আশ্চর্য্য, এ সন্ন্যাসী যে অপর কেহ নহেন তাঁহার সেই প্রাণ আকুল করা নবাগন্তুক সন্ন্যাসীই!

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমে ভোরা রামরায়ের প্রাণে এ সমস্ত ব্যাপার ভাল লাগিল না। তিনি পুনরায় শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি সন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু সেই নবীন সন্ন্যাসীর চিত্র ক্রমে উজ্জ্বলতর রূপে তাঁহার চিত্তে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ইহাতে তিনি আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ক্রমে তিনি যেন মর্ম্মে মর্ম্মে এই গৌর মূর্ত্তির আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে অধিক ক্ষণ আর ব্যাকুল থাকিতে হইল না তিনি ক্রমশঃ বুঝিলেন, সন্ন্যাসীটী আর কেহ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাধা অঙ্গদ্যুতি দ্বারা স্বীয় শ্যামাঙ্গ আবৃত করিয়া স্বীয় নাম ও প্রেম বিতরণার্থ কলির মলিন জীবের—দ্বারে সুপস্থিত। এই তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিয়া তিনি পরম পুলকিত হইতে লাগিলেন এবং সেই বরণীয় সন্ন্যাসীর সম্মুখস্থ হইয়া বলিলেন,—

"কৃষ্ণ তত্ত্ব রাধা তত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রস তত্ত্ব লীলা তত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর-চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়—"

তিনি বলিলেন, ঠাকুর, তুমি আমাকে লুকাইতেছ কি, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এই যে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিলে ইহাতে তোমাকে ভাল করিয়া চিনিয়াছি—তুমিই সেই শ্যামসুন্দর। তবে যদি বল তোমার রংটী কাঁচা সোণার মত কেন? তাহার উত্তর আমি অতি সহজেই দিব যে, তুমি শ্রীমতির অঙ্গ কান্তি দ্বারা আপনাকে লুক্কায়িত করিয়া প্রচ্ছন্ন বেশে বিচরণ করিতেছ।

প্রভু কিন্তু এততেও ভক্তের নিকট ধরা দিলেন না, তিনি কপটতার আশ্রয় লইয়া বলিলেন,—

"—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্ট দেব—স্ফূর্ত্তি॥
রাধা কৃষ্ণে তোমার মহা প্রেমা হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধা কৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥"

প্রচ্ছন্ন বেশী সন্ন্যাসী শিরোমণি ইহাতে বলিলেন, তোমার অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম রহিয়াছে, যাহার শ্রীকৃষ্ণ প্রেম জন্মিয়াছে তাহার স্থাবর জঙ্গমে পর্য্যন্ত

শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ হয়। সুতরাং তুমি আমাতে যে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি !

কিন্তু মহাজ্ঞানী রামরায়ের চিত্তে যে পরম নিগূঢ় সত্য অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এই শঠ চূড়ামণির কপট বাক্যে বিদূরিত হইল না।

"রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে—করিতে উদ্ধার।
এতে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার॥"

রামরায় বলিলেন,—প্রভু, তুমি এই জঙ্গলময় দেশে আসিয়া এই অধম বিষয়ী ব্যক্তিকে কৃপা করিবার জন্যই তল্লাস করিয়া বাহির করিলে। আর এখন কিনা তুমি আমায় বঞ্চনা করিতেছ ? প্রভু, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার।

এখন মজার কথা হইতেছে এই যে, ভক্তের স্তুতিবাক্য অপেক্ষা ভক্তের তিরস্কার ভগবানের নিকট অধিকতর মিষ্ট লাগে। তাই ভক্তের তিরস্কারে ভগবান আপনাকে আর সামলাইতে পারিলেন না।

"তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥
দেখি রামানন্দ হইলা আনন্দে মূর্চ্ছিত।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিত॥"

এই "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—যাহা তাঁহার অদৃষ্ট পূর্ব্ব ছিল, তাহা দর্শনে আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অনন্ত কৃপাশালী প্রভু তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পদ্ম হস্ত বুলাইয়া সেই অচেতন ভক্ত দেহে চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন। রামরায় সচেতন হইয়া পুরোভাগে অধিষ্ঠিত পরম জ্যোতির্ম্ময়, সেই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ক্ষণিক পূর্ব্বে দৃষ্ট সেই অশ্রুত পূর্ব্ব ব্যাপার বোবার স্বপ্ন

দেখার জন্য চিন্তাই করিতে লাগিলেন। প্রভু ভক্তের মনোভাব বুঝিলেন, তিনি উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন,—

"আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল্য আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে॥
অতএব এইরূপ দেখাইনু তোমারে॥"

ক্রমশঃ

ডাঃ শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

বিদ্বেষিতা

বিদ্বেষ জিনিসটা কখনই ভাল নহে। অজ্ঞতা হইতে যাহার উৎপত্তি তাহার পরিণতি কখনও ভাল হইতে পারে না। যিনি উপাস্য বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াছেন, নিজ উপাস্যে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলা ভক্তি আছে মতদ্বেষিতা তাঁহার মনে স্থান পাইতেই পারে না। যেখানে যত অজ্ঞতা, মুর্খতা, অসভ্যতা সেই খানেই তত বিদ্বেষিতার ঘোর অন্ধকার। বিদ্বেষিতাকে কেহ কেহ ব্যক্তিগত কুভাব ও প্রলাপ বাক্য মাত্র বলিয়াও বলিয়া থাকেন। ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া আমরা দিন দিন অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছি। বিদ্বেষিতা সভ্যতা বিরুদ্ধ, ইতরজন নিসেবিত প্রকারান্তরে নাস্তিকতাও বলা যাইতে পারে। উহাতে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা ত বৃদ্ধি হয়ই না বরং নিষ্ঠাভাব অতল জলে নিমজ্জিত হয়।

সকলেরই বুঝা উচিত যে, সকল উপাসনা নদীই সেই একমাত্র ব্রহ্ম-সাগরে প্রবেশ করিতেছে, তবে কোনটী সরল ভাবে আর কোনটী বা একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া, এই মাত্র প্রভেদ। তবে ভক্তি জিনিষটা সকল সম্প্রদায়েরই মেরুদণ্ড। সহসা ভক্তিকে অনাদর করিয়া কোন মত বা কোন সম্প্রদায়ই সাধ্যবস্তু লাভ করিতে সমর্থ নহে। ইহা ধ্রুবসত্য। সুতরাং ইহাতে

তর্ক বিচার নাই বা এই ভক্তি কাহারও বিদ্বেষের বস্তু হইতে পারে না। সাধু মহাত্মাগণের চরিত্রালোচনায় জানা যায় যে, ভক্তিতে বিদ্বেষতার লেশ মাত্র নাই, তবে যদি কেহ বলেন এ বিদ্বেষিতা কোথা হইতে আসিল, তাহার উত্তরে আমরা বলিব এ বিদ্বেষিতার উৎপত্তি অজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞতা হইতে আসিয়াছে।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিদ্বেষ হয়ত শীঘ্রই নিবারিত হইতে পারে কিন্তু আজ কাল এক অভিনব সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহাদের বিদ্বেষ ভাব কিন্তু সহজে যাইবার নহে। ইহারা কোন ধর্ম্মেই আস্থাবান নহে। কেবল অর্থাকাঙ্ক্ষার দুর্জ্জয় অনল অবিরত ইহাদের হৃদয়ে জ্বলিতেছে কিন্তু বাহিরের আবরণ দেখিয়া সহজে ইহাদিগকে ধর্ম্মদ্বেষী-বলিয়া চেনা যায় না। বনের মধ্যে একটী বৃক্ষে দাবানল উৎপত্তি হইয়া যেমন সমস্ত বনটীকে দগ্ধ করিয়া ফেলে সেইরূপ ধর্ম্মধ্বজী অর্থলিপ্সু ব্যক্তি হইতেও সমাজ দগ্ধ হইতে পারে—হইতেওছে তাই। এখন বিচার করিয়া এই উৎপাৎ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এই শ্রেণীর লোক কায়মনোবাক্যে কোন ধর্ম্মেরই ধার ধারে না, ধর্ম্ম গ্রন্থাদি আলোচনা করে না; যদিও করে তাহা কেবল নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূলে যতটুক আবশ্যক ততটুকু। সাধু মহাত্মাগণের সদুপদেশ ইহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। এরূপ সম্প্রদায়ের উপকার করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পূর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মালোচনা যদিও অনেক বেশী হইয়াছে বটে কিন্তু কপটাচারী ধর্ম্মধ্বজীর দল বাদ দিয়া পবিত্র চেতা অকপট ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা যে বড় বেশী হয় নাই একথা নিশ্চয়। কোথাও ধনাশা-বিশুষ্ক মরুভূমি সদৃশ হৃদয়ে, বাহিরে ভাবভাব চাল চলন প্রেমিকের মত দেখাইয়া, মরুভূমি মাঝে মরিচিকা দেখাইয়া পথিকের প্রাণনাশের মত লোককে আকৃষ্ট করে। কোথাও ঘোর নাস্তিকতাময়ী ঊষরভূমি। সাধারণতঃ সরল প্রকৃতির লোক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রেমভক্তির সুশীতল পূতসলিলা প্রবাহিনী হৃদয়যুক্ত যথার্থ ভক্তকে ধরিতে পারে না। কারণ তাহাদের বাহিরে কোনরূপ জাগ জমক নাই হৈ চৈ নাই। কালেরবশে বহু প্রয়োপার্জ্জিতা বিদ্যা আজ অনেকের নিকট অবিদ্যা প্রসবিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের এমন দুর্দ্দিনে যে সকল জীবহিতৈষী মহাত্মাগণ

ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া আচার প্রচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা যথার্থ সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করুন, সাধারণেরও তাঁহাদিগের কার্য্যে সহায় হওয়া উচিত। আর এক কথা, এই সকল মহাত্মাগণের মধ্যে যাহাতে পরস্পর কোন প্রকারের বিদ্বেষ ভাব না থাকে, যাহাতে সকলে এক হইয়া সৎশিক্ষা স্রোত প্রবাহিত করিয়া সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিতে পারেন তাহার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। যাহাতে আপামর সাধারণ ধর্ম্মগারম বুঝিয়া অধর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারে, মঙ্গলময় ভগবানে ভক্তি করিতে শিক্ষা পায়, পরোপকার করে, সমাজ সংস্কারে সাধ্যমত সকলেই দৃঢ় সংকল্প হয় তাহার সুপন্থা আবিষ্কার করুন।

সমাজের গতিবিধি যখন যেরূপ হয় সুধীগণ তখন সেই ভাবে সময়োপযোগী মত প্রচার করেন। এই ভাবে ধর্ম্ম-পত্রিকা সকল প্রচার ও বর্ত্তমান সময় বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারে ধনবান কেহ অগ্রসর হন না। কুৎসিৎ ভাব, কুৎসিৎ চিত্র সমাজের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিয়া সমাজের রক্ত শোষণ করিতেছে ইহা বুঝিয়াও সমাজের মঙ্গল সাধনরত ধর্ম্ম-পত্রিকাগুলির উপর দেশের ধনী লোকের দৃষ্টি পড়ে না। শ্রীভগবান সমাজ হইতে এই সকল দুর্ভাব পূর্ণ সংস্কার দূর করিয়া সৎভাব সৎশিক্ষা প্রচারের সহায় হইলে আবার সেই দেবভাব, দেব চরিত্র প্রত্যেক হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে, সমাজ উন্নত হইবে। আসুন —সকলে অগ্রসর হউন।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী

(২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে নূতন কীর্ত্তন প্রচার করিলেন, তাহার প্রধান অঙ্গ বলিতে গেলে একরূপ বক্রেশ্বর পণ্ডিতই ছিলেন। কারণ নৃত্যে তিনি ভক্তগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। আর বক্রেশ্বরের নৃত্যে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যে বক্রেশ্বর উভয়েই তুল্যরূপে আনন্দিত হইতেন। বক্রেশ্বর নৃত্য আরম্ভ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং গান ধরিতেন। তিনি না গাহিলে বক্রেশ্বরের

ততটা নৃত্যসুখ জন্মিত না। আবার শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলে বক্রেশ্বর অমনি গান ধরিতেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বলিয়াছেন—"বক্রেশ্বরের নৃত্যে গৌরচন্দ্র কর-তালিকা প্রদান পূর্ব্বক উচ্চস্বরে গান করেন এবং বক্রেশ্বরের নৃত্যে গৌরচন্দ্রও গান করেন, এইরূপে উভয়ে সমান সুখানুভব করিতে লাগিলেন।"

নৃত্যক্রিয়া যেমনই নয়ন প্রীতিকর তেমনই চিত্ত রঞ্জন। সামান্য নৃত্যেই যখন মানব হৃদয়ে আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, তখন ভগবৎ প্রেমে আপ্লুত হইয়া সাত্ত্বিক ভাবে যে নৃত্য তাহাতে যে পরমানন্দ লাভ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বক্রেশ্বরের ঐরূপ অষ্টসাত্ত্বিকভাবের নৃত্য দর্শন দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয় ছিল।

বৃন্দাবন দাস গোস্বামী বিমোহিত চিত্তে বক্রেশ্বরের নৃত্য সম্বন্ধে এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম বিগ্রহ বিহ্বল।
যার নৃত্যে দেবাসুর মোহিত সকল॥
অশ্রু কম্প, স্বেদ হাস্য, পুলক হুঙ্কার।
বৈবর্ণ আনন্দ মূর্চ্ছা আদি যে বিকার॥
চৈতন্য কৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকলে আসিয়া বক্রেশ্বর দেহে মিলে॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥"

সুতরাং বক্রেশ্বর পণ্ডিতের এই অতুল নৃত্য মহিমা বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের কোথায়? শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে এই নয়ন রসায়ন নৃত্য সম্বন্ধে একটী বড় মধুর ঘটনা বর্ণিত আছে। শ্রীবাস অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে এমন সময়ে গঙ্গাদাস নামক জনৈক ব্যক্তি অদ্বৈত প্রভুর অনুসন্ধানে গমন করিয়া শ্রীবাস ভবনে আসিয়া দেখিলেন সকলেই নৃত্য করিয়া ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গকে আনন্দ বিধান করিতেছেন। আবার আপনারা সঙ্কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকেও নৃত্য করাইতেছেন। প্রথমেই মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়া গঙ্গাদাস কহিলেন, "আহা! যাঁহার গম্ভীরতর হুঙ্কার ধ্বনিতে নিখিল ভক্তবৃন্দ ময়ূর বৎ নৃত্য করিতেছেন এবং যাঁহার নিরন্তর বিনিঃসৃত

নয়ননীরে ত্রিভুবন যেন দুর্দ্দিনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে ও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব কান্তিকলাপে চতুর্দ্দিক যেন সৌদামিনীমালায় পরিবৃত ব'লিয়া বোধ হইতেছে, সেই বিশ্বম্ভর দেব সম্মুখ ভাগে নৃত্য করিতেছেন।"

আবার শ্রীবক্রেশ্বরের নৃত্য দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেছেন— "আহা! একি পরমানন্দের মূর্ত্তি? একি মূর্ত্তিমান প্রেমরস, না শ্রদ্ধা ও দয়া দেহ ধারণ করতঃ ভূতলে আসিয়াছেন? এ কি মাধুর্য্যেরই মূর্ত্তি? কিম্বা নববিধা ভক্তি একত্র মিলিত হইয়া একটী শরীর ধারণ পূর্ব্বক আসিতেছেন? না তাহা নয়, ইনি বক্রেশ্বর পণ্ডিত—ভগবানের সদৃশ আবেশ-সুখে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছেন।"

ধন্য বক্রেশ্বর প্রভু! তিনি নৃত্য করিতে উঠিলে, একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন আর এইরূপে চব্বিশ প্রহর পর্য্যন্ত কৃষ্ণাবেশে নৃত্য করিতে পারিতেন।

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥"

তাঁহার নৃত্যের বিরাম থাকিত না, কাজেই ঐ নৃত্যকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তনও ভঙ্গ হইতে পারিত না। এক্ষণে যে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় ক্রমে চব্বিশ প্রহর কীর্ত্তন দেখিতে পাই তাহা এই কীর্ত্তন হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আমরা আবার বলি, ধন্য বক্রেশ্বর! আর ধন্য তোমার এই অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন সৃষ্টি লীলা।

বক্রেশ্বরের নৃত্যের সহিত ঐক্যভাবে সঙ্কীর্ত্তন করিবার ক্ষমতা মহাপ্রভু ভিন্ন আর কাহারও ছিল না। তিনি নাচিতে নাচিতে শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিতেন যে, সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব আমার সহিত গান করিলে আমার নৃত্য সুখ হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গও স্বিয় প্রিয় ভক্তের প্রার্থনা পূরণ জন্য শত গন্ধর্ব্বের কণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় সঙ্গীতসুধা নিজেই বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিতেন। তিনি ভিন্ন আর বক্রেশ্বরের নৃত্যের উপযুক্ত কীর্ত্তনীয়া কে হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বক্রেশ্বরের নৃত্য বড়ই মধুময় ছিল যেহেতু সে সময়ে তাহার দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইত আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইতেন।

"বক্রেশ্বর-হৃদয় কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর॥"

সুতরাং এই নৃত্য শ্রীকৃষ্ণেরই নৃত্য বুঝিতে হইবে অর্থাৎ এই নৃত্য শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যেরই সমতুল্য ছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর কণ্টক নগরীতে কেশব ভারতীর আশ্রমে গমন করিল যে প্রধান পাঁচজনা ভক্ত তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বক্রেশ্বরও ছিলেন। যথা—

"চন্দ্রশেখর আচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর॥
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥"

কিন্তু ইহারা কেহই শ্রীগৌরাঙ্গকে ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বৃন্দাবন দর্শনের জন্য ঊর্দ্ধমুখে ছুটিলেন। ভক্তদের মধ্যে নিত্যানন্দ মুকুন্দ ও আচার্য্য রত্ন ইহারা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। আর বক্রেশ্বর গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ শোকে অচেতন হইয়া পড়িয়া ছিলেন। (গদাধর ও নরহরি পরে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।) বক্রেশ্বরের দুঃখ অত্যধিক হইয়াছিল, কারণ তিনি প্রভুকে নিমাই পণ্ডিত রূপেই ভজনা করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার সে সন্ন্যাস বেশ বক্রেশ্বর প্রমুখ ভক্তগণের প্রাণে বড়ই ব্যথা দিয়াছিল।

মহাপ্রভু যে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কৌশলে শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন তাহা আপনারা সকলেই জানেন। তথা হইতে নীলাদ্রি গমনকালে প্রভু ভক্তগণকে বলিয়া গেলেন,—

"ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমা-সঙ্গে হইবে মিলন॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥"

প্রভুর প্রবোধ বাক্যে কেহই কিন্তু শান্তনা মানিতেছেনা। তখন প্রভু

মধুর হাসিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কি সে মধুর হাসি! আর কিসে হাসির প্রভাব!! গমনের কাল উপস্থিত হইলে প্রভু পৃথক পৃথক ভাবে ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন।—

প্রভুর নীলাচলের সঙ্গী হইলেন, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর আর মুকুন্দ এই চারিজন। বক্রেশ্বর ও উদাসীন ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি এবং আরও কয়েকজন উদাসীন মর্ম্মী-ভক্ত পরে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। বক্রেশ্বরকে যে প্রভু কিছুদিনের জন্য রাখিয়া গেলেন তাহার ভিতর প্রভুর কিছু লীলা রহস্য ছিল বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। একজন কৃপাপাত্র জীবকে সাধু সঙ্গের অপার মহিমাদ্বারা কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করিয়া জগদ্বাসীর সমক্ষে আপনার ভক্তের মাহাত্ম্য প্রকটিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমরা বুঝিতেছি। প্রভুর নীলাচল গমনের পর বক্রেশ্বর পণ্ডিত কিছুদিন দেবানন্দ পণ্ডিত নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং স্বীয় সঙ্গগুণে তাঁহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন। ভক্তি-বিমুখ এই দেবানন্দ পণ্ডিত কিরূপে পরম বৈষ্ণব চূড়ামণি হইয়াছিলেন অতঃপর আমরা সেই কথাই বলিব।

ক্রমশঃ

ডাঃ শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভক্তির বর্ত্তমান বর্ষ প্রায় শেষ হইতে চলিল, যাঁহাদের নিকট সাহায্য বাকী আছে অনুগ্রহ করিয়া এই সময় পাঠাইয়া দিলে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। সকল গ্রাহকগণের নিকটই আমরা ২।১ জন নূতন গ্রাহক পাইবার আশা করি। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে উৎসাহদানে কেহই পরাঙ্মুখ হইবেন না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। সকলে প্রচারকার্য্যে সহায় হউন।

ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[২২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩১ সাল]

প্রার্থনা

"নামৈব তবগোবিন্দ কলৌত্বত্তঃ শতাধিকং
দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনাষ্টাঙ্গ যোগতঃ।
বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি পুনঃ পুনঃ
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে॥"

গোবিন্দ হে, কলিযুগে তোমার নামের মহিমা তোমাহইতে শত শত গুণ বেশী। পাপী তাপী যাহারা তোমাকে ভালবাসিতে পারে না, তোমাকে ভজনা করিতে যাহাদের মন যায় না, তোমার প্রতি যাহাদের প্রেম নাই সেই সকল অপ্রেমিক জনকে তুমি দেখা দেওনা কিন্তু কলিকালে তোমার নাম-করিতে পাপীতাপী আচণ্ডাল সকলকেই সমান অধিকারী করিয়াছ। নামবলে পাপক্ষয় হয়, হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয় আবার নামবলেই তোমাকে লাভ করিয়া তোমার প্রেম-ধনে ধনী হইয়া জীব কৃতার্থ হয়। নামকীর্ত্তনের দ্বারাই সুখদুঃখের অতীত অবস্থা, নিন্দা ও স্তুতিতে সমজ্ঞান, শত্রুমিত্রে সমভাব প্রভৃতি মহত্ব লাভহয়। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—নামভিন্ন কলিকালে জীবের আর অন্য গতিনাই—গতিনাই—গতিনাই।

পতিতপাবন! নামের মহিমা ত এই, এখন আমার অবস্থা দেখ। তোমার এই ভুবনমঙ্গল নাম আছেন আর এই নাম উচ্চারণ করিবার

শক্তিও তুমি দয়া করিয়া আমাকে দিয়াছ, কিন্তু নাথ, আমার কুকর্ম্মফলে নামে আমার রুচি হইলনা। নানাকার্য্যে সময় দিতে পারি কিন্তু যাহা হইতে প্রাণ জুড়াইবে, যাহার প্রভাবে পাপতাপ দূর হইবে, যাহার অসীম শক্তিতে মনপ্রাণ প্রফুল্ল হইবে সেই নাম কীর্ত্তনের সময় করিতে পারিনা।

আজ তোমার নিকটে আমার এই প্রার্থনা, কৃপণ যেমন তাহার সঞ্চিত ধন বার বার নাড়াচাড়া করিয়া দেখে, সর্ব্বদা ধনের চিন্তা করে, অন্য কোথাও গেলে বা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও সেই ধনচিন্তা'তেই মনকে নিযুক্ত রাখে, কৃপণের ধনের ন্যায় আমিও যেন তোমার নামে প্রেম রাখিতে পারি— যেন দিবানিশি নামচিন্তা ও নামজপ করিতে পারি। এই কৃপাকর যেন নামে রুচি—নামে শ্রদ্ধা—নামে বিশ্বাস রাখিয়া নামামৃত সিন্ধুতে চিরদিনের মত ডুবিয়া যাইতে পারি।

সম্পাদক

বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১৮)

(গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ।)

৩৩।— হের গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ রায়
কৃষ্ণভাবনায় যাপে নিশিদিন।
বিরহ বিকারে (মুখে) বাক্য নাহি স্ফুরে
কিহ'তে কি করে ভেবে তনু ক্ষীণ॥
নাই সে মোহন বেশ নদীয়ার
নাহি অঙ্গে নানা রত্ন অলঙ্কার
সে সুখসম্পদ বিনিময়ে সার
ছেঁড়াকন্থা আর কটিতে কৌপীন॥
সেদিন যে সুখ ছিল নদীয়ায়
ঘরে ঘরে হরিনাম যজ্ঞ তায়—
নিত্য মহোৎসবে সাজাইত সবে
যেরূপরতন যতনে ;—

হায় নিদারুণ কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদে
অনাথ করিল সে নদীয়া-চাঁদে
সেরূপরতন বিরাগে বিষাদে
অনশনে এবে হ'য়েছে মলিন ॥

এবে উদাসীন ভিখারী নিমাই
ধূলায় ধূসর দেহ স্মৃতি নাই
কভু সংজ্ঞা হ'লে কাঁদে কৃষ্ণবলে
চেয়ে স্বরূপের পানে ;—

(বলে) কোথা বৃন্দাবন গিরি গোবর্দ্ধন
সে চেতনশীলা চিন্ময় কানন
কোথা কেশীঘাট ধেনুবৎস ঠাট
কোথা বংশীবট যমুনা পুলিন ॥

কভু রামরায় স্বরূপ সকাশে
করে হাহাকার করুণ উচ্ছ্বাসে
শ্রীঅঙ্গে কম্প স্বেদ পুলকপ্রকাশে
আঁখি ঝরে ক্ষণে ক্ষণে ;—

(বলে) তোমরা বান্ধব রাখ মোর প্রাণ
কোথা কৃষ্ণ মোরে কৃষ্ণ দেহ দান
(আবার) কভু করযোড়ে দন্তে তৃণ ধরে
আপনারে মানে তৃণাদপি হীন ॥

ক্ষণে হৃষ্টমন ক্ষণে অসন্তোষ
গর্ব্ব অভিমান কভু দম্ভ রোষ .
কভু মানে সব নিজ কর্ম্মদোষ
প্রকাশে প্রলাপ বচনে ,—

গায় বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গ চরিত
এবে রসময় কিশোরী ভাবিত
এ ভাববিকার করি অঙ্গীকার
ভুঝিছে রাধার প্রেম মহাঋণ ॥

সম্পাদক

ভক্তি-পাঠের 'ক' 'খ'

দেশে ত নানাস্থানে হরিসভা হইতেছে, শ্রোতাও জুটিতেছে, বক্তৃতাও চলিতেছে, কিন্তু ধর্ম্মভাব কিছু জাগিতেছে কি? পাঠশালার সংখ্যা বাড়িতেছে, পড়ুয়ার সংখ্যাও বাড়িতেছে, মাষ্টারের সংখ্যা আবার ততোধিক বাড়িয়াছে, এ সব লক্ষণই ভাল, কিন্তু পাঠ কিছু আগাইতেছে কি?

সহর হইতে হাজার টাকা ভিজিটের ডাক্তারই আসুন, আর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে তাঁহার যন্ত্রপাতি হউক, operation successfnl বলিয়া কে আর বাহবা দিয়া থাকে, যতক্ষণ না রোগী যথার্থ আরাম হইয়া উঠে। তাই যেখানেই যত সাজান গোছান দেখি, কেবলই মনে হয়, এই সব আধিব্যধি-গ্রস্ত গোবেচারীদের রোগমুক্তির কিছু হইতেছে কি; না যেমন জলের ট্যাক্স, কলের ট্যাক্স, সুনের ট্যাক্স, হরেক রকম ট্যাক্স দিতে হয়, তেমনি এও একদফা ধর্ম্মের ট্যাক্স আদায় লইয়াই বেচারীদের পূর্ব্ব জন্মের ঋণ কতকটা হাল্‌কা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে?

যেখানেই যাই সর্ব্বাগ্রে এই কথাটাই মনে পড়ে। এই ভাবের কথা পাড়িতে গিয়া কিন্তু অনেক সময় অপ্রিয় হইতে হয়। পেশাদার মহল চটিয়া চুপ হইয়া যান। ফলাফল ভগবানে অর্পণ করিয়া নীরবে কর্ম্ম করিয়া যাইবার উপদেশটাও স্মরণ করাইয়া দিতে অনেকে বিস্মৃত হয়েন না। কিন্তু এই ভাবে মনকে আঁখি ঠারিয়াই কি আমরা কর্ত্তব্য শেষ করিব? যাহারা অবিচারে আমার টোলে নাম লিখাইয়াছে, না জানা পাঠ পুঁথিচাপা দিয়া কি চিরকাল তাহাদিগকে তামাক সাজাইয়া ও সিধা আদায় লইয়াই ছাড়িয়া দিব? বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে রাত্রে কি তাহা হইলে নিদ্রা হইবে? যাঁহাদের হইবে, হয় তাঁহারা ভাগ্যবান্, আর না হয়ত তাঁহাদের হৃদয়ের উপাদান স্বতন্ত্র।

এই যে শত শত নরনারী আজ আকুল দৃষ্টিতে তোমার পানে চাহিয়া আছে, তোমার কথায় এই যে আজ উহারা চিত্রপুত্তলিকার মত নিস্পন্দ হইয়া আছে, তাহাদিগকে দিবার জন্য আজ তুমি কি আনিয়াছ? রাখিয়া দাও তোমার বেদ-বেদান্তের সূক্ষ্মমীমাংসা, উহারা তো তোমার সে বৈদিক

ব্যাকরণের বিবৃতি শুনিতে আসে নাই! তুমি তোমার তোতাপাখীর মত মুখস্থকরা বচনের ফোয়ারা ছুটাইলেও এই সব মূক জনমণ্ডলী চিরদিন মূক হইয়াই বসিয়া থাকিবে। তোমার vocal gymnastic দেখিয়া বোঝে না বলিয়া হয়ত শত প্রশংসা করিবে, কিন্তু বোঝে না বলিয়াই তার একবর্ণও জীবনের সঙ্গে আদৌ খাপ খাওয়াইতে পারিবে না।

হইতেছেও তাহাই। যাত্রা থিয়েটার মেলা মহোৎসবের মত হরিসভাও যেন সামাজিক উন্মাদনায় পর্য্যবসিত হইতেছে। যেখানে ভুবনপাবন নাম-কীর্ত্তন, যেখানে কলিকলুষনাশন ভাগবত পঠন, যেখানে হৃদ্‌রোগদমন কৃষ্ণ-কথা বর্ণন—সেখানে আবার বিষয় বাসনার প্রবলতাড়নায় চিত্তজ্বালাতন কেন? জন্ম-জন্মান্তরের কোটি কোটি অপরাধে জীবের দশা আজ কতই না মলিন! চিত্ত তাহার ত্রিবিধ তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল। কিন্তু সে ত আজ সেই জ্বালা জুড়াইবার জন্যই আসিয়াছে। তুমি অমৃতসেকে তাহাকে সুশীতল কর। জগত্তারণ গৌরমহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাণ গলিয়া যখন করুণাধারার বন্যা বহিবে, তখনই না তাপিতের তাতল বক্ষ জুড়াইতে পারিবে? কিন্তু যাহা করিলে সত্য সত্যই নয়ন মন গলিয়া যায়, তাহা করিতে পারিয়াছি কি? জ্ঞান-কর্ম্ম ভক্তির বড় বড় কথা লইয়াই যে দেশটাকে ক্ষ্যাপাইয়া তোলা হইল! কিন্তু, ভক্তি ভক্তি করিয়া আজীবন চীৎকার করিলেই কি ভক্তি পাঠের পড়া শেষ হইয়া যাইবে?

কথায় বলে—"ছেলে ধরিতে পারে না, কেউটে ধরিতে চায়।" আমাদেরও হইয়াছে সেই দশা। ভক্তি পাঠের 'ক' 'খ' আরম্ভ হইল না একেবারেই "রাসলীলা" ব্যাখ্যা না হইলেই নয়। ভাইরে, উঠান চালাকী করিয়া কখনও ভক্তিরাজ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই। শ্রীগুরু-কৃপা না হইলে আর ভক্তিতত্ত্বের অনুভূতি হইবার উপায় নাই, শাস্ত্র তাই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন,—

"গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি শিক্ষণং"

এই শ্রীগুরুচরণে শরণ লইয়া যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তি পাঠের পড়া আরম্ভ করিয়াছে, তাহারই কিছু হইলেও হইতে পারে। আর তাহা না করিয়া যাহারা বাহির হইতে টপ্পাতে বিদ্যা উড়াইয়া লইতে চায়, তাহাদের যাত্রাদলের নারদ সাজিয়াই জীবন কাটিয়া যায়,—আসলে তাহাদের কাছে ভক্তিতত্ত্ব চিরদিন দুরধিগম্য হইয়া থাকে। ভক্তিধর্ম্ম বড় সোজা বলিয়া লাফাইয়া উঠিলেই ত

হইবে না, এ ধর্ম্ম যাজন করা তত সহজ নয়। আহারে বিহারে উচ্ছৃঙ্খল হইলেই যদি রাগমার্গের ভজন হইত, তাহা হইলে ত ঘরে ঘরে আজ পরম বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পাইয়া জগৎ উদ্ধার হইয়া যাইত। বড় কঠিন ধর্ম্ম ভাই। সাধকেরা তাই না বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ ॥"

তৃণাদপি শ্লোকের কথা শুনেন নাই, এমন লোক এখন কয়জন আছেন? শ্রীপ্রভু আমার শিক্ষাষ্টকে নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

তৃণের অপেক্ষাও নীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু এবং অমানীকেও মান দান করিতে পারিলে তবেই হরিকীর্ত্তন সম্ভবপর। এমনি অমানিমানদতা অভিমানশূন্যতা ও সর্ব্বসংহতা না থাকিলে আর হরিভজনে যোগ্যতাই জন্মে না,—তা সে ভক্তি তত্ত্বের বড় বড় কথা তোতার মত মুখে আওড়াইলেই বা কি হইবে? ভাইরে, যদি ভক্তি পাঠশালায় পড়ুয়া হইতে চাও, তো প্রভুর শ্রীমুখের বাণী "তৃণাদপি" শ্লোকটি জীবন দিয়া পালন করিতে চেষ্টা কর। মনে রাখিও ভাই—উহাই তোমার ভক্তি পাঠের 'ক' 'খ'। এই 'ক' 'খ' পড়া হয় নাই বলিয়াই না আজ এত সভা সমিতি হইলেও ফল হইতেছে না। আরে ভাই 'ক' 'খ' পড়াটা শেষ না করাইয়া লম্বা লম্বা জ্যামিতির প্রতিপাদ্য দিলে ছেলেরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ত তাকাইয়া থাকিবেই। আমাদের দশাও এখন কতকটা তাই দাঁড়াইয়াছে! আস্তার ও কামার দুই বদ্‌লাইতে হইবে। মাষ্টার মশাইদের এখন সর্ব্বত্র দিনকতক সব ছাড়িয়া এই 'ক' 'খ' পড়ানই সুরু করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁহাদের এত সাধের প্রেম প্রচারের পুঁথি চিরদিন ডোর বাঁধাই থাকিয়া যাইবে।

(পল্লীবাসী)

বর্ষশেষে সম্পাদকীয় বক্তব্য

সহৃদয় ভক্তির পাঠকগণ !

আপনাদের অপরিসীম যত্নে প্রতিপালিত 'ভক্তি' পত্রিকা আজ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় ২২শ বর্ষ পূর্ণ করিতে সমর্থা হইলেন। এই শুভ সময় সর্ব্বপ্রথমে পরম-করুণ শ্রীগুরুদেবের অপার করুণার জয় দিয়া আপনাদিগকে কয়েকটী নিবেদন জানাইতে উপস্থিত হইলাম।

• 'ভক্তি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মদীয় অগ্রজ নিত্যধাম গত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয় যেদিন এই ভক্তিদেবীর সেবা-ভার এই ক্ষুদ্র নরাধমের উপর দিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে পারি নাই যে, এ ব্রত এত কঠিন। তাঁহার প্রদত্ত সেবা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই যখন নিজের অযোগ্যতা তাঁহার চরণে নিবেদন করিলাম তখন তিনি অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন "সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান, তাঁহাতে বিশ্বাস রাখিয়া জগতের মঙ্গল কামনায় কার্য্য করিয়া যাও তিনিই শক্তিদানে কার্য্যের সাফল্য করিয়া দিবেন।" তখন বুঝি নাই, তখন ভাবি নাই, তখন এই মহামূল্য বেদ বাক্য যে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাসও করিতে পারিয়াছিলাম তাহাও জোড় করিয়া বলিতে পারি না। ভবে ভয়ে অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলাম মাত্র। খুব একটা ভরসা ছিল, সেবার ত্রুটী হইলে তিনিই সে ত্রুটি ক্ষালনের উপায় বলিয়া দিবেন। কিন্তু ভগবান আমার সে নিশ্চিন্ত ভাব বেশীদিন রাখিলেন না। এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই অগ্রজ মহাশয় নিত্যধামে গমন করিলেন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। অন্যান্য যাহাই হউক এই পত্রিকা পরিচালন ব্যাপার যে কি ভাবে করিব তাহা ভাবিয়াই পাইলাম না। শেষে বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিলাম। কোন কোন শুভানুধ্যায়ী সেই মুহূর্ত্তেই পত্রিকা পরিচালনে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিলেন, আবার কোন কোন বান্ধব স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, আমি নানাদিক ভাবিয়া শেষের সিদ্ধান্তই অবনত মস্তকে মানিয়া লইলাম।"

এই মানিয়া লওয়ায় নিজের অযোগ্যতার দরুণ মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। বিগত ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাস হইতে ভক্তি পত্রিকার যাহা কিছু ভার এই অধমের উপরই পড়িল। যাহাই হউক, কোন রকমে পাঁচজনের সাজান বাগানের পাঁচ রকম ফুলে সাজাইয়া আজ পর্য্যন্ত যে ভক্তি-ডালি ভক্তগণের নিকট মাসে মাসে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি তজ্জন্য আমি নিজে নিজেকে বিশেষ কৃতার্থ মনে করি।

ভক্তগণ প্রাণের আবেগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নানাভাবে লিখিয়া এ যাবৎ কাল ভক্তিকে উপহার দিয়া আসিতেছেন, ভক্তগণের ভক্তি পত্রিকায় লিখিবার উৎসাহই আমাকে অবিচারে সকল প্রবন্ধ প্রকাশে বাধ্য করিয়াছেন; বলা বাহুল্য কোনরূপ ব্যবসা বুদ্ধি এই পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে নাই। তাহা যদি থাকিত তবে বাজারের অন্যান্য পত্রিকার মত নায়ক নায়িকার কথা লইয়া দু'চারখানা 'সু' বা 'কু' চিত্র ছাপিয়া বেশ দু'পয়সা যে না হইত তাহা নয়। কিন্তু নিজের তাহা ইচ্ছা নয় এবং শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতারও তাহা উদ্দেশ্য ছিল না। তাই দু'টো ভক্তি কথা যিনি যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়া আসিতেছি।

ভক্তিকে আমি আমার গৃহ দেবতা বলিয়া মনে করি, আজ এই বর্ষশেষে দেবী যেন হাসি মুখে আমাকে বলিতেছেন, "আমার প্রচার বন্ধ করিও না, আমাকে ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর সুকোমল করস্পর্শ ও আদর লাভের জন্য নূতন নূতন ভক্তের নিকট পাঠাও আমি স্বচ্ছন্দ মনে নিত্য নূতন নূতন দেশে নূতন নূতন ভক্তের সঙ্গ পাইয়া আনন্দে বর্দ্ধিত হইতে থাকি।"

পাঠকগণ! নিজের সামর্থ্য না থাকিলেও দেবীর এই বাক্যে যেন প্রাণে নূতন বল আসিল, তাই আগামী বর্ষের জন্য প্রস্তুত হইলাম। দেবীর ইচ্ছায় নূতন নূতন বেশ ভূষার কিছু আয়োজনও আগামী বর্ষ হইতে করিয়াছি, আপনা-দিগকে সে সংবাদটা দিয়া রাখি।

আগামীবর্ষ হইতে পৃথক পত্রাঙ্কে ভক্তি-গ্রন্থ প্রচার আরম্ভ হইবেন। সর্ব্বপ্রথমে আমরা পঞ্চগীতা গ্রন্থখানিই বিস্তৃত অনুবাদ সহ প্রকাশ করিব বাসনা করিয়াছি; আপনারা সকলে আমাদিগের প্রতি উৎসাহ প্রদান করুন, যাহাতে প্রত্যেক ভক্ত পাঠক অন্ততঃ একজন করিয়াও নূতন গ্রাহক দিতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন।

কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধু ভক্তিতে সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, উপ-ন্যাসাদি প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরাও তাঁহাদের সেই

মত ভক্তির শুভানুধ্যায়ী কয়েকজনকে জানাইয়াছিলাম, তাঁহারা অধমকে দয়া করিয়া জানাইয়াছেন যে,—

"আপনার ভক্তি পত্রিকা পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, যে ভাবে ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা করিতেছেন তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন কিছু ব্যবস্থা করিবেন না, আমরা ইহাতেই উপকৃত মনে করি। মনুষ্য জীবন বৃথা হাস পরিহাস বা অযথা আলোচনার জন্য নয়। জড় জগতের সন্ধান আমরা নানাস্থান হইতে পাই। যাহাতে সৎপ্রসঙ্গে জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে আমরা যত্নপর হই— যাহাতে অনিত্য বিষয়ের প্রতি বৃথা আশক্তিরূপ নিখিল দুঃখের কারণ অবিদ্যা নাশ করিয়া স্বরূপতত্ত্ব লাভে প্রাণ পবিত্র ও নির্ম্মল করিতে পারি তাহাই করিবেন। বলা বাহুল্য, ভক্তিতে আমরা তাহাই পাইতেছি।" ইত্যাদি।

সহৃদয় পাঠকগণ! ভক্তগণের আগ্রহ এবং নিজের বিবেক অনুযায়ী স্থির করিয়া নিছক ধর্ম্ম বিষয় আলোচনাই ভক্তির কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। ভক্তিতে কাহারও নিন্দা বা স্তুতি থাকে না, জ্ঞান ও ভক্তির উদ্দীপক প্রবন্ধই যে ভক্তির জীবন তাহা বোধ হয় ভক্তির নিয়মিত পাঠক পাঠিকাগণ অস্বীকার করিবেন না। সকলে আমাদিগের কার্য্যে সহায় হউন। আমরা শ্রীগুরুদেবের "সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান" এই মহতী বাক্য মূলমন্ত্র করিয়া নবোৎসাহে আগামী বর্ষের কার্য্যের জন্য অগ্রসর হই।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী

(৩)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গভূমি ভক্তিশূন্য অবস্থায় ছিল। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট বৈষ্ণবই বৈষ্ণবধর্ম্মকে এক প্রকার সজীব রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই রাত্রিকালে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। ভক্তিশূন্য নগরবাসিগণ ইহাতে তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে—

"চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হ'তে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ ব্রাহ্মণে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥"

নবদ্বীপ পণ্ডিতের স্থান। পাণ্ডিত্য লইয়াই তাঁহাদের ব্যবসা। তাঁহারা এ হরিনামের কলরব সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, "এ বেটারা করে কি, এ আবার কোনদেশী ভজন পদ্ধতি? হরিনাম করিতে হয় ত নির্জ্জনে ঘরে বসিয়া করিলেই চলে, ইহাদের মত এমন চেঁচামেচি করিয়া হরিনাম করা ত কথনও শুনি নাই। আবার মধ্যে মধ্যে কান্নাকাটি করাও আছে, এমন বাড়াবাড়ি ত দেখি নাই। রাত্রে নিদ্রা যাইবারও উপায় নাই।" নবদ্বীপের এইরূপ ভক্তিশূন্য অবস্থায়, তথায় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে ভাগবতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের প্রতিবাসী ছিলেন। নদীয়ার এই সমস্ত ভক্তিশূন্য পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনি একজন জ্ঞানবান, চিরকুমার এবং ভাগবত শাস্ত্রের একজন বড় অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। অনেক ছাত্র তাঁহার চতুষ্পাঠিতে থাকিয়া ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি ভাগবতের ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা আদৌ করিতে পারিতেন না এবং এমন বড় পণ্ডিত হইয়াও ভাগবতের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতেন না। যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সু-শান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তি হীন॥

ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥"

অর্থাৎ ভক্তিহীন যত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করা যাউক না কেন তাহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত রসাস্বাদন করা যায় না। এইরূপে ভক্তিহীন পণ্ডিতের সহিত আমরা দর্ব্বীর (মিষ্টান্ন প্রস্তুতের কাঠের হাতা) তুলনা করিতে পারি। দর্ব্বীর দ্বারা নাড়া-চাড়া করিয়া কত প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে কিন্তু দারু দর্ব্বী কি সেই সমস্ত মিষ্টান্নের মধুর রস আস্বাদন করিতে পারে? আমাদের আলোচ্য দেবানন্দ পণ্ডিতও তদ্রূপ গ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত হইয়াও ভক্তির অভাবে প্রকৃত রস আস্বাদনে অধিকারী ছিলেন না।

একদিন পরমভক্ত শ্রীবাস ভাগবত পাঠ শ্রবণ মানসে দেবানন্দ পণ্ডিতের টোলে উপস্থিত হইলেন। পরম প্রেমিক শ্রীবাস তথায় ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া প্রেমে গদ গদ হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, ক্রমে তিনি আকুল আবেগে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। দেবানন্দের শিষ্যগণ তাহাদের অধ্যাপকের মতই ভক্তিহীন ছিল। তাহারা শ্রীবাসের এই প্রেম-ক্রন্দনের মর্ম্ম কি বুঝিবে! তাহারা দেখিল ব্রাহ্মণ বৃথা ক্রন্দন করিয়া তাহাদের পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। তখন তাহারা আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে তাঁহার ঐরূপ অচেতন অবস্থায় ধরিয়া লইয়া টোলের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিল। দেবানন্দ পণ্ডিত বসিয়া বসিয়া ছাত্রগণের এইরূপ গর্হিত কার্য্য দেখিলেন— বোধহয় তিনি তাহাদের কোন প্রকার দোষ দেখিতে পাইলেন না।

শ্রীবাস পণ্ডিত কিয়ৎক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মনোদুঃখে নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। ইহার পর বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। গয়া প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় ভক্তবৃন্দ মধ্যে ভগবদ্ভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই সময়ে একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ সহিত নগর পরিভ্রমণ কালে পথে দেবানন্দ পণ্ডিতকে দেখিতে পাইলেন; তখন অন্তর্যামী প্রভু, দেবানন্দ পণ্ডিত পূর্ব্বে শ্রীবাসকে অপমান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া মহা ক্রোধভরে ভগবদ্ভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন :—

"আরে আরে দেবানন্দ বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে॥

যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত ॥
কোন্ অপরাধে তারে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ির বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া ॥
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণরসে।
টানিয়া ফেলিতে সে তাহার যোগ্য আইসে ॥
বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত ॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥
প্রেম-ময় ভাগবত পড়াইলা তুমি।
তত সুখ না পাইলা কহিলাম আমি ॥
শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা কিছু না করে উত্তর ॥"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীগৌরাঙ্গের তখন ভগবান ভাব। দেহ মহা-তেজোময় হইয়াছে। প্রভুর দেহে তখন প্রায়ই ভগবানের আবির্ভাব হইত। দেবানন্দ প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া আর কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না। লজ্জা ও ভয়ে মুখ নত করিয়া রহিলেন। এই ঘটনা হইতে আমরা তাঁহার জীবনে সৌভাগ্য উদয়ের সূচনা দেখিতে পাইতেছি। কারণ,—

"চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ডে তারে প্রেম-ভক্তি যোগ হয় ॥"

অপর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে মহেশ্বর বিশারদের—জাঙ্গালে পরিভ্রমণ সময়ে দেবানন্দ পণ্ডিতের টোলের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে, তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে পাইয়া পরম ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার ভাগবত গ্রন্থ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যথা,—

"দৈবে প্রভু ভক্ত সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায় ॥
সর্ব্বভূত হৃদয় জানয়ে সর্ব্ব-তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তি যোগের মহত্ত্ব ॥

কোপে বলে প্রভু, বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ অবতার ॥"

*   *   *   *

"নিরবধি ভক্তি হীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে ॥
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহয় ॥"

এই ঘটনার কিছুকাল পরে মহাপ্রভু ভক্তগণকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলচন্দ্রের নিকট অবস্থান করিয়া ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেও তিনি স্বদেশ ও বিদেশ হইতে বহু ভক্তকে আকৃষ্ট করিয়া কত যে অপূর্ব্ব লীলা করিয়াছিলেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সেই প্রেম স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিয়া কত দেশ দেশান্তরের ভক্ত ধন্য হইয়া গিয়া ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেবানন্দ নবদ্বীপে থাকিয়াও ঐ সমস্ত অদ্ভুত লীলা দেখিয়া তাঁহাতে আকৃষ্ট হন নাই।

ইহাতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, তখনও তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গ লাভের সময় সমুপস্থিত হয় নাই। সাধু সঙ্গ দ্বারা যখন চিত্তের মলিনতা দূর হয় তখনই শ্রীভগবানের কৃপাবারি তাহার উপর বর্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামী "ভক্তি রসামৃত সিন্ধু "গ্রন্থে "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তি উদয়ের ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ ভগবৎ কথাদিতে শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, তৎপরে সাধু সঙ্গগুণে শ্রবণ কীর্ত্তন হয়, শ্রবণ কীর্ত্তন করণে সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি হয়, সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবারিত হইলে নিষ্ঠা হয়, সেই নিষ্ঠাই শ্রবণাদিতে রুচি উপস্থিত করে, আবার রুচি হইতে আসক্তি এবং আসক্তি হইতে চিত্তে রতির উদয় হয়, সেই রতি হইতেই ভক্তির জন্ম।

এই ভক্তির ক্রম আমরা দেবানন্দ পণ্ডিতের জীবনে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইতে দেখিতেছি। সম্ভবতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ডে তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছিল, পরে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ রূপ মহান্ ব্যাপারে তাঁহার শ্রদ্ধার উদয় হইয়া

থাকিবে আর এই শ্রদ্ধা হইতেই তাঁহার বক্রেশ্বর পণ্ডিত রূপ সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। ঘটনাটী অবশ্য আমরা ক্রমশঃ বিস্তারিত করিয়া বলিব।

ক্রমশঃ

ডাঃ—শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম

(৪)

মহাপ্রভুর অগণিত ভক্তের মধ্যে তাঁহার মর্ম্ম ভক্ত ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন জন—স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহাতি এবং শিখির ভগিনী মাধবী দাসী। ইনি স্ত্রীলোক বলিয়া বৈষ্ণব কবিগণ কর্ত্তৃক অর্দ্ধ জনা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন—আর এই সাড়ে তিন জনা গৌর-লীলা রস-গ্রাহী ভক্তের মধ্যে মাত্র শ্রীল রাম রায়ই প্রভুর এই অশ্রুত পূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

রসরাজ শ্যামসুন্দর ও মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার একত্রীভূত মিলনই —"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" কবিতার অর্থ বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। রাধাশ্যামের মিলন দর্শনই রামরায়ের ধ্যেয় ছিল। আর সেই চির দিনের অভিলাষ যে এমন অপূর্ব্বদৃষ্ট ও অশ্রুপূর্ব্বত ভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ইহাতেই রামরায় সেই অপূর্ব্ব দ্যুতির ঝলক লাগিয়া তড়িতাহত ব্যক্তির ন্যায় সহসা সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামরায় চেতনা লাভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিস্ময় ভাব সহসা দূরীভূত হইল না। তখন পরম দয়াল গৌরগুণমণি আপন লীলাতত্ত্ব এই ভাবে বুঝাইলেন,—

"গৌর দেহে নহে মোর ;—রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহে না স্পর্শে অন্য জন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্ম মন।
তবে নিজ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন॥
তোমার ঠাঁই আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সব মর্ম্ম॥"

অর্থাৎ প্রভু বলিলেন, শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিত শ্রীভগবানের অপর শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক নহেন। আমি শ্রীকৃষ্ণ অবতারে নিজ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত না হইলে যে রস আস্বাদন করিবার উপায় নাই বলিয়া আমি রাধাকে নিজাকে আবৃত করিয়া এই অভিনব মূর্ত্তিতে তোমার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছি।

স্বরূপ গোস্বামীর বাক্যে আমরা এই ভাবটী আরও বিশদ ভাবে বুঝিতে পারি—"অর্থাৎ যে প্রেমে দ্বারা শ্রীরাধা আমার অদ্ভুত মাধুরিমা আস্বাদন করেন, শ্রীরাধার সেই প্রণয় মহিমাই বা কীদৃশ, শ্রীমতীর আস্বাদ্য আমার মাধুর্য্যই বা কীদৃশ, আমার আস্বাদন করিয়া শ্রীমতীর যে সুখাতিশয় হয়, তাহাই বা কীদৃশ," এই তিন বাসনা পরি পূরণের নিমিত্ত মহাভাবে, ভাবিত হইয়া শচী-গর্ভ-সিন্ধু হইতে শ্রীগৌরচন্দ্রমা উদিত হইলেন।"

শ্রীল রামরায় শ্রীভগবানের এই রসরাজ মহাভাব একীভূত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি যে তাঁহার দ্বাপর লীলায় সাক্ষাৎ বিশাখা সখী। এমন প্রিয় নর্ম্ম সখীর নিকট কি তাঁহার কিছু গোপনীয় থাকিতে পারে? আর শ্রীভগবান যে যোগমায়া দ্বারা আবৃত হইয়া অবস্থান করেন, প্রকৃত ভক্ত ব্যতীত তাঁহাকে চিনিবার সাধ্য আর কাহার আছে। তাই প্রভু বলিলেন, "রামরায় তুমি আমার পরম ভক্ত, তাই তোমাকে এই অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করাইলাম তুমি এ কথা যেন কাহাকেও প্রকাশ করিও না; কারণ এ সংবাদ জগতে অপর কুত্রাপি প্রকাশিত হইতে পারে না। তুমি যেমন অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হইয়াছ আমিও বোধ করি তদ্রূপ রাধার প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদ করিবার জন্য উন্মাদ হইয়াই জীবের দ্বারে আসিয়াছি। প্রভু এইরূপে রামরায়কে সাবধান করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু,—

"অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি চিনে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তগণ স্থানে॥
আপনাকে লুকাইতে নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥"　　(শ্রীচরিতামৃত)

সুতরাং রামরায়ের এই অপূর্ব্ব দর্শন লাভের বার্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম্মী ভক্তগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তাই আমরা পরবর্ত্তী লীলা লেখক গণের গ্রন্থে বা পদে শ্রীল রামরায়ের এই অভিনব গৌর রূপের তত্ত্ব

প্রকটিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। আর প্রভু ও তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন,—

"তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম বলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম॥
গুপ্ত রাখিহ কথা, না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা, লোকে উপহাস॥
আমি এক বাউল, তুমি দ্বিতীয় বাউল।
অতএব আমায় তোমায় হই সমতুল॥ (শ্রীচরিতামৃত)

ইহা তাঁহার অনন্যশরণ একান্ত ভক্তগণের নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারে নাই। আর এই দিন হইতে এক অতি নিগূঢ় শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব জগদ্বাসী অবগত হইতে পারিল।

প্রভু দশ দিবস শ্রীল রামরায়ের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি দিবসে বিষয় কার্য্য করিতেন, সন্ধ্যার পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সমীপে উপস্থিত হইতেন। দশম দিবস রাত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ, রামরায়কে বলিলেন, "আমি তোমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এতদিন এ স্থানে রহিলাম। আমি সন্ন্যাসী আমার অধিক দিন একস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। কল্য প্রাতে আমি অন্যত্র যাইব স্থির করিয়াছি। তোমার বিষয়ে মন নাই জানি। অতএব যত শীঘ্র পার বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করিও, আমিও শীঘ্র কতিপয় তীর্থ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইব, তখন উভয়ে তথায় একত্র থাকিয়া মধুমাখা কৃষ্ণ কথা কহিয়া কালক্ষেপ করিব।"

প্রভু পরদিবস প্রত্যুষে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, আর তাঁহার বিরহে রামরায় এবং বিদ্যানগরবাসী অপরাপর সম্প্রদায়স্থ ভক্তবৃন্দ যাঁহারা তাঁহার অভিনব কনক কদম্ব কান্তি দর্শনাবধি তাঁহার রাতুল চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন, সকলেই এককালে চক্ষে আঁধার দেখিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-রামানন্দ মিলন লীলা বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অভিনব, মহামূল্য প্রেম সম্পদ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই লীলায় যে ফলশ্রুতি দিয়াছেন তাহা আমরা সানন্দে এবং সলোভে এই স্থানে উপভোগ করিব।

"সহজে চৈতন্য চরিত ঘন দুগ্ধপুর।
রামানন্দ চরিত তাহে খণ্ড প্রচুর॥

রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান যেবা সেই করে আস্বাদন॥
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণ দ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে॥
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেম ভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে॥"

এই রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলনে পরম পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের যৌত্য রহিয়াছে। প্রভু যখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট নীলাচলে আপন দক্ষিণ ভ্রমণ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন, তখন তিনি অতীব কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন বরঞ্চ আমার পুত্রশোক হউক তাহাও সহজে সহ্য করিব কিন্তু প্রভু তুমি কতক দিবসের জন্যও যে আমাদিগকে বিরহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া চলিয়া যাইবে, সে দুঃখ অসহ্য,—

"শুনিয়া সার্ব্বভৌম হইল অত্যন্ত কাতর।
চরণ ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর॥
বহু জন্মের পুণ্য ফলে পাইনু তোমা সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেন ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা নাহি গণি, বিচ্ছেদ সহন না যায়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন কত রহ হেরি তোমার চরণ॥" (শ্রীচরিতামৃত)

প্রভু তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তুমি যখন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ তখন তোমাকে বাধা দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত তবে আরও কতক দিবস থাকিয়া যাও। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান সার্ব্বভৌমের বাসনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না, তিনি কয়েক দিবসের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। এবং পরে আবার যখন যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন তখন তিনি তাঁহাকে আর বাধা না দিয়া তাঁহার চরণে একটী প্রার্থনা জানাইলেন,—

"তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদন॥

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিহ বিস্তানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে।
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুঁহের তিনি সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তার তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব॥" (শ্রীচরিতামৃত)

তাই আমরা বলিতেছিলাম, এই অসাধারণ মহাপুরুষ রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলনের সংযোজক শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম। আর তাই মহাপ্রভু দক্ষিণাপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সানন্দে সার্ব্বভৌমের গৌরব বর্দ্ধণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে—এই লাগি মিলিতে কহিল॥"

ক্রমশঃ

ডাঃ শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা

ভাবুকের বাক্যকণা

মানুষ মাত্রেই নিজ নিজ প্রকৃতিগত রুচির অনুসরণ করিয়া থাকে। রুচির অনুসরণেই যদি সুখ হয় তবে দুঃখ কি? মহাজনগণ বলেন—উচ্চ আশাই মানবকে দুঃখ প্রদান করে। যেখানে উচ্চ আশা সেইখানেই আশাচ্যুতি আর আশাচ্যুতিতেই দুঃখ।

মানবের আশা ক্ষেত্র বড়ই উর্ব্বরা এই জন্য দুস্পুর আশালতা অতিশীঘ্রই

বাড়িয়া উঠে। সাধু মহাত্মাগণের মত এই যে, উহাকে অধিক বৃদ্ধি হইতে দেওয়া ভাল নয়।

আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়। অলব্ধ কাম্য বস্তুর প্রাপ্তি পক্ষে অলীক বিশ্বাসাধিক্যই দুরাশা। তাহার ভঙ্গেই দুঃখ অনিবার্য্য।

মানব জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল আশা। আশা না থাকিলে মানুষের জীবিত লক্ষণই অনুভব হয় না। কেননা আশাই মানবের ক্রিয়া শক্তির সঞ্চালক।

আশা সুখের আলেয়া, আশা দুঃখের মৃগতৃষ্ণিকা, কিন্তু তথাপি ঐ আশাই মানবের জীবনগতির লক্ষ্যস্থল। মানব জীবনের উন্নতির সোপান আশার উপরেই নির্ম্মিত।

আশা একটী উৎকৃষ্ট মানস বৃত্তি। কিন্তু অনধিকারী উহার অপব্যবহার করিয়া নানাবিধ দুঃখের সৃষ্টি করে। একেবারে রাতারাতি আশার কুহকে শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিও না তাহাহইলে পতন অনিবার্য্য। যে আশা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হয় তাহাই উন্নতির জননী। যখনই দেখিবে আশা একেবারে তরতর করিয়া বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহার গতি রোধ কর।

সচরাচর দেখা যায় অলাবুলতা যখনঅতিশয় বৃদ্ধিশীল হয় তখন তাহাতে ফল হয় না আবার যেমন ফল ধরিতে আরম্ভ করে অমনি তাহার বৃদ্ধিও কমিয়া যায়। আশালতার অতিবৃদ্ধিও তদ্রূপ। ঐ বৃদ্ধি অবস্থাতে আকাশ কুসুমের উৎপত্তি হয়। সে ফুল ক্ষণিক চিত্ত মোহিত করে বটে কিন্তু উহাতে ফল প্রসব করে না। যে আশা কার্য্যে পরিণত না হয় তাহা থাকা না থাকা সমান।

শ্রীসদানন্দ শর্ম্মা।

শ্রীহরিদাস-শিক্ষা

১। সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক হরিনাম মন্ত্র সাধন করা উচিত।

২। নিষ্ঠা সহকারে তুলসীর সেবা করা সাধক মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

৩। নিষ্কপটে অপরাধ শূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিতে পারিলে ভগবানের দয়া লাভ নিশ্চয়ই হয়।

৪। কৃষ্ণ ভজনে জাতি বিচার নাই যিনি ভজন করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ, ভক্তশক্তির নিকট সকল শক্তিই পরাভূত হয়।

৫। ভগবান ভক্তকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। ভক্তকে রক্ষা করা ভগবানের একটী ব্রত।

৬। ভক্তকে বিপদে ফেলিয়া ভগবান ভক্তের মহিমাই বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

৭। নামসাধক শুধু নাম সাধন দ্বারাই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমসাধন লাভে ধন্য হইতে পারে।

৮। নাম গ্রহণের কালাকাল নাই, অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই বালক বৃদ্ধ মূর্খ পণ্ডিত স্ত্রী পুরুষ যাহার যখন ইচ্ছা তিনি তখনই নাম গ্রহণ করিতে পারেন।

৯। নামের মাধুর্য্য ও নামের শক্তি অনুভব করিবার চেষ্টা মানুষ মাত্রেরই করা কর্ত্তব্য। বৃথা আহার বিহারে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম নষ্ট করা কাহারও উচিৎ নয়। এমন জন্ম আর হইবে কি না সন্দেহ।

১০। সময় থাকিতে সতর্ক হওয়াই চতুর ব্যক্তির কর্ম্ম। সংসারের সমুদায় কার্য্যের মধ্যে নাম গ্রহণ একটী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম হওয়া উচিত।

১১। নিষ্কপট ভগবদ্বিশ্বাসীর বাক্য মর্ম্মস্পর্শী ও অমোঘ।

১২। যথার্থ ভাব প্রাণে না জন্মিলে প্রতিষ্ঠার জন্য ভাবকালি প্রদর্শন করা কখনও কর্ত্তব্য নয়।

১৩। ভগবান যেরূপ ভক্তের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম। ভক্তও সেইরূপ ভগবানের অতিপ্রিয়। কে যে কাহাকে বেশী ভাল বাসেন তাহা সব সময় স্থির করা কঠিন হয়।

১৪। ভক্ত বৎসল ভগবান ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

১৫। ভক্ত ভগবানের দ্বিতীয় দেহ, ভক্তের অঙ্গে আঘাত করিলে ভগবানের অঙ্গেই আঘাত করা হয়।

দীন কাঙ্গাল—চৈতন্য দাস

চিন্তা

কি হ'বে আমার প্রভু কি হ'বে আমার।
কত দিন এই ভবে,
আসিয়াছি কেন তবে,
কি কাজ করিতে হ'বে ভাবনা অপার।
বৃথা দিন কেটে যায়,
প্রাণ কিন্তু যাহা চায়,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহা ক্লান্ত দেহভার।
কি হ'বে আমার প্রভু কি হ'বে আমার॥
মনে হয় শান্তি চাই,
কেমনে গো তাহা পাই,
কিছু না মিটাতে পারে শান্তি পিপাসায়।
কাহাকে বলে যে শক্তি,
কেমনে বা আসে ভক্তি,
কেই বা পৌঁছায়ে দেয় সেই মুক্তি-দ্বারে।
কি হ'বে আমার প্রভু বল দয়া ক'রে॥
জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিতে,
একবার দেখে নিতে,
প্রবল বাসনা হয় মনে বার বার।
কাহাকে ধরিলে পরে,
কে অধমে দয়া করে,
তৃষিত এ দগ্ধ প্রাণে সিঞ্চে বারিধার।
কি হ'বে আমার প্রভু কি হ'বে আমার।
কে যেন টানিয়া দিছে,
বলে ও সকলই মিছে,
কেন বা বলিছে যেচে কি প্রাণ তাহার।

পথহারা বুঝি ব'লে,
দয়ার্দ্র হৃদয় গলে,
হাত ধ'রে পথে তুলে দিতেছে আমায়।
কি হ'বে আমার প্রভু কি হবে আমার॥
কেগো ও করুণাধার,
আছে মাত্র নেত্রাসার,
আনিলে আলোক চক্ষে নাশিয়া আঁধার।
অধম বলিয়া মোরে,
দাওনি ত কম ক'রে,
সকলি দিয়াছ যাহা ঠিক তা আমার।
কি হ'বে আমার প্রভু কি হবে আমার॥
আবার আকুল ভাবি,
অন্যায় করেছি দাবি,
ফিরায়ে দাওনি কিছু কমায়ে তাহার।
কিম্বা অনুগ্রহ যত,
চাহিয়াছি বিধিমত,
সকলই দিয়াছ তুমি বাকি নাহি আর।
কি হ'বে আমার প্রভু কি হ'বে আমার॥
অবোধ শিশুর প্রায়,
কেবল খেলেছি হায়'
সম্মুখে পেয়েছি যত পাত্র খেলনার।
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যেই,
কাঁদিয়া উঠেছি সেই,
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিয়েছ আবার।
কি হ'বে আমার প্রভু কি হবে আমার॥
দস্যু চোর আছে যারা,
অতর্কিতে আসি তারা
গলায় বাঁধিয়া রজ্জু টানিয়া আমার।
কাতর দেখে বা যত,
রক্ষ করে বিধিমত,

কাঁদায়ে ফেলিছে মোরে অকূল পাথারে।
কি হ'বে আমার প্রভু বল দয়া ক'রে॥
ছিল যা সম্বল কিছু,
হারায়ে ফেলিয়া পিছু,
কাঁদিতে বসেছি এবে যা ছিল আমার।
দাও গো ফিরায়ে মোরে,
দাও প্রভু দয়া করে,
তুমি যে করুণাময় করুণা অপার।
কি হ'বে আমার প্রভু কি হ'বে আমার॥
পড়ি কত গোলমালে
পথ ঘাট গেছি ভুলে,
আঁধার হেরি গো দুনিয়ার চারিধার।
যেমন পতিত আমি,
তেমন পাবন তুমি,
তুমি না দেখিলে নাথ কে দেখিবে আর।
কি হ'বে আমার প্রভু কি হ'বে আমার॥
দেহ মন প্রাণ যাহা,
লও ফিরে লও তাহা,
তোমার (ই) দেওয়া সব লও গো আবার।
আমার আমার বলি,
সকল (ই) লও গো তুলি,
মিশাইয়ে দাও তুমি তোমাতে আমার।
কি হ'বে আমার প্রভু কি হ'বে আমার॥

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষাল

শেষ রক্ষা

(শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুর লিখিত)

আমি, ডাকি ডাকি ক'রে ডাকিতে পারিনি
(আমার) জীবন বিফলে গেল।
ভাবি ভাবি ক'রে কখনও ভাবিনি
অমৃত গরল হ'ল॥
ছাড়ি ছাড়ি ক'রে ছাড়িতে পারিনি
এ পোড়া সংসার কাজ।
ধরি ধরি ক'রে ধরিতে পারিনি
যে আমার প্রেমরাজ॥
জ্বলে জ্বলে গেল জীবন আমার
শান্তি কভু নাহি এল।
ভেবে ভেবে হ'ল অস্থিচর্ম্মসার
কোন কূল না মিলিল॥
থেকে থেকে এবে জাগিতেছে প্রাণে
যা হবার তা ত হল।
ধীরে ধীরে ধীরে সুমধুর স্বরে
হরি হরি হরি বল॥
(মন হরি ব'লে পথে চল)

(২২শ বর্ষ সম্পূর্ণ)

—o—

ভক্তির-নিয়মাবলী

১। 'ভক্তি' ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। প্রতি বাংলা মাসের প্রথমে যথা-নিয়মে প্রকাশ হয়। ১৩৩০ সালের ভাদ্র মাস হইতে ভক্তির ২২শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, ১৩৩১ সালের শ্রাবণ মাসে বর্ষ শেষ হইবে। বৎসরের যে কোন সময়ই গ্রাহক হউন না কেন, গ্রাহকগণ প্রথম হইতেই পত্রিকা পাইবেন।

২। ভক্তির বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাকমাশুলসহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা, প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা। ভিঃ পিতে ১॥৶০ এক টাকা এগার আনা মাত্র। ২২শ বর্ষের গ্রাহকগণ ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ ২০শ ও ২১শ বর্ষের পত্রিকা প্রতি বর্ষ ডাকমাশুলসহ ১৵০ এক টাকা তিন আনায় পাইবেন।

৩। ভক্তিতে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ হয় না। ভক্তির উপযোগী ধর্ম্ম-ভাবমূলক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পরিদর্শক পণ্ডিতমণ্ডলীর আদেশানুসারে (প্রয়োজন হইলে পরিবর্ত্তিত হইয়া) প্রকাশ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না। ক্রমশঃ প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধের সমগ্র পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইলে তবে প্রকাশ আরম্ভ হয়।

৪। প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই, প্রবন্ধ লেখকগণ নকল রাখিয়া দিবেন।

৫। কোনও বিষয়ের উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট পাঠাইতে হয়। পুরাতন গ্রাহকগণের প্রত্যেক পত্রেই গ্রাহক নম্বর থাকা প্রয়োজন। নম্বরবিহীন পত্রে কোনও কার্য্য হয় না। নূতন গ্রাহক "নূতন" এই কথাটি লিখিবেন এবং আপনাপন নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমাদিগকে না জানাইলে পত্রিকা না পাইবার জন্য আমরা দায়ী নহে। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে তাহার পর মাস পাওয়া মাত্র জানাইলে বিনামূল্যে দেওয়া হয়, নতুবা পৃথক মূল্য (প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা) দিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

৭। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, প্রবন্ধ এবং বিনিময় ও সমালোচনার্থ পুস্তক, পত্রিকাদি সমস্তই নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

ঠিকানা—

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া।

কলিকাতা ১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট "বাসন্তী-প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।